শ্রীশ্রীযোগিরাজ—

গম্ভীরনাথ-প্রসঙ্গ

প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্॥ ভা ৩।২৫।২০

গোরক্ষপুর মহারাণা প্রতাপ ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ
শ্রীঅক্ষয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ
প্রণীত

প্রথম সংস্করণ, ১৩৩২
দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৬২

মূল্য—৩॥০

প্রকাশক :

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

অবসরপ্রাপ্ত হেডমাষ্টার, ফেণী হাই স্কুল

প্রাপ্তিস্থান

১। প্রকাশক
১৫ বঙ্কিম চাটার্জ্জি ষ্ট্রীট
এ. বি. টি. এ অফিস
কলিকাতা-১২।

২। শ্রীরবীন্দ্রনাথ দাশ
৮।৩৪ ফার্ণ রোড
কলিকাতা-১৯।

৩। শ্রীহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়
রাণাঘাট।

৪। কলিকাতার প্রসিদ্ধ
পুস্তকের দোকানসমূহ।

By the Same Writer—

JOGIRAJ GAMBHIRNATH

(In English)

Price—Rs. 3/8

মুদ্রাকর :
শ্রীকালীচরণ পাল
নবজীবন প্রেস
৬৬ গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

শ্রীশ্রীগম্ভীরনাথাষ্টকম্ ।

—:০:—

আজানুলম্বিতভুজং সিতকৃষ্ণকেশং
দীর্ঘায়তারুণমৃদুস্মিতশোভিতনেত্রম্ ।
শ্বেতাম্বরাবৃততনুং কনকাবদাতং
আরক্তকোমলপদং নৃবরং প্রপদ্যে ॥ ১

সুকেশং সুবেশং সুনেত্রং সুবক্ত্রং
সুনাসং সুহাসং সুপাণিং সুপাদম্ ।
সুকর্ণং সুবর্ণং সুবাচং সুশীলম্
প্রপন্নোঽস্মি নাথং মনোহারিরূপম্ ॥ ২

প্রসন্নদৃষ্ট্যাখিলতাপশোষণং
বরাভয়ার্থং ধৃতপাণিপল্লবম্ ।
স্বপাদপোতেন ভবাব্ধিতারণং
অনাথনাথং প্রণমামি সদ্গুরুম্ ॥ ৩

জনস্য মিথ্যাভিমতেরচক্ষুষঃ
চিরং প্রসুপ্তস্য তমস্যনাশ্রয়ে ।
প্রবোধনার্থং স্বকৃপা-বিভাসিতং
সমাশ্রয়েঽহং গুরুদেবভাস্করম্ ॥ ৪

স্বসুখনিভৃতচিত্তং তন্নিরস্তান্যভাবং
স্বমহিমপরিপূর্ণং সর্ব্বকর্ম্মপ্রমুক্তম্ ।

দলিতসকলভেদং নির্ব্বিকারং প্রশান্তং
ত্যজনভজনহীনং যোগিরাজং প্রপদ্যে ॥ ৫
সৃষ্টিস্থানপ্রলয়করণে ত্বাং ক্ষমং কেচিদাহুঃ
সাক্ষাদ্‌বিশ্বেশ্বর ইতি তথা কেচিদন্যে মহান্তঃ
মায়াতীতস্ত্রিগুণরহিতো যুক্তযোগীতি কেচিৎ
জানেঽহং ত্বামশরণগতিং কিঞ্চনান্যন্ন জানে ॥ ৬
ঐশ্বর্য্যং তে মহিমজলধেঃ সংবৃতানন্তশক্তেঃ
বিজ্ঞাতুং কঃ কথমিহ বিভো শক্যতে জীববুদ্ধ্যা।
যে তু প্রেম্না প্রণতিপরমাস্ত্বৎপদং সংশ্রয়ন্তে
তৈর্দৃষ্টস্তেঽপ্রতিমমহিমা ত্বৎকৃপালোকদীপ্ত্যা ॥ ৭
শান্তং দান্তং সমদৃশিযুতং মৌনবন্তং নিরীহং
স্বাত্মক্রীড়ং নিজসুখভুজং সৌম্যগম্ভীরমূর্ত্তিম্।
শক্ত্যাধারং পরমকরুণং জীবকল্যাণদীক্ষং
বন্দে দেবং ভবভয়হরং সদ্‌গুরূণাং বরিষ্ঠম্ ॥ ৮

ইতি শ্রীশ্রীগুরু-গম্ভীরনাথাষ্টকম্ ॥

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ
রজস্তমোবিযুক্তং তং যোগিরাজং নমাম্যহম্ ॥
সর্ব্বেচ্ছাঃ সকলাশ্চিন্তাঃ সর্ব্বেহাঃ সকলাঃ ক্রিয়াঃ
চিত্তান্নির্ব্বাসিতা যেন যোগিরাজং নমাম্যহম্ ॥
সংসারাড়ম্বরাঃ সর্ব্বে যস্যান্তর্ব্বহির্দৃষ্টিষু।
স্বপ্নবদ্ ভাসমানাস্তং যোগিরাজং নমাম্যহম্ ॥
সর্ব্বত্র বিগতস্নেহং সর্ব্বত্র সমদর্শনম্।
সর্ব্বত্র প্রেমবন্তং চ যোগিরাজং নমাম্যহম্ ॥
নিঃশেষিতজগৎকার্য্যং পরিপূর্ণমনোরথম্।
লোকহিতায় সক্রিয়ং যোগিরাজং নমাম্যহম্ ॥
অহেতুককৃপাসিন্ধুং প্রেমপূর্ণ বিলোকনম্।
সর্ব্বজীবহিতাশংসং যোগিরাজং নমাম্যহম্।
ক্রূরপ্রকৃতয়ঃ সর্ব্বে সর্পব্যাঘ্রাদয়োঽপি হি।
প্রেম্না বশীকৃতা যেন যোগিরাজং নমাম্যহম্ ॥
অন্তর্গূঢমহৈশ্বর্য্যং বিহরন্তমনীশবৎ।
সুসংবৃতমহাশক্তিং যোগিরাজং নমাম্যহম্।
বিশ্বমাত্মনি পশ্যন্তং সর্ব্বজ্ঞানসমন্বিতম্।
প্রাকৃতবচ্চরন্তং তং যোগিরাজং নমাম্যহম্ ॥
ভবব্যাধিচিকিৎসার্থং দীনানামনুকম্পয়া।
আচার্য্যত্বং স্বীকুর্ব্বাণং যোগিরাজং নমাম্যহম্ ॥
আকৃষ্য সাদরং ক্রোড়ে আতুরাণি মনাংসি বৈ।
জ্ঞানামৃতপ্রদাতারং যোগিরাজং নমাম্যহম্ ॥

সচিত্তত্বেঽপি নিশ্চিত্তং সক্রিয়ত্বেঽপি নিষ্ক্রিয়ম্।
দেহস্থত্বেঽপি ব্রহ্মস্থং যোগিরাজং নমাম্যহম্॥
লব্ধ্বাপি ব্রহ্মনির্ব্বাণং ভক্তচিত্তে প্রকাশিতম্।
সর্ব্বগং সচ্চিদানন্দং যোগিরাজং নমাম্যহম্॥
যাবতীর্ব্বাসনাস্ত্যক্ত্বা দীনকল্যাণবাসনা।
পোষিতা হৃদি গম্ভীরে গম্ভীরাত্মন্ নমঽস্তু তে॥
অনাথা বহবো নাথ নাথবন্তস্ত্বয়া বিভো।
গম্ভীরনাথমন্নাথ নাথযোগিন্ নমোঽস্তু তে॥
কায়েন মনসা বাচা নমস্কারং বিনা প্রভো।
সাধনং নৈব জানামি ভূয়ো ভূয়ো নমোঽস্তু তে॥
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে॥
ত্বন্নিবেদিতসর্ব্বস্বঃ ত্বদ্ধ্যানসুধয়াপ্লুতঃ।
কদানন্দময়ো ভূত্বা ত্বয়ি স্থাস্যাম্যহর্নিশম্॥

ইতি --শ্রীশ্রীযোগিরাজগম্ভীরনাথস্তোত্রং সমাপ্তম্।

ওঁ তৎসৎ

প্রকাশকের নিবেদন

জীবন ও জীবনী--দুইটী পরস্পারের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইলেও পরস্পর হইতে পৃথক্‌। জীবন ভিতরের, জীবনী বাহিরের। জীবন বিম্ব, জীবনী প্রতিবিম্ব। জীবন আসল, জীবনী তাহার নকল। কোন ব্যক্তিবিশেষ স্বরূপতঃ যাহা, তাঁহার অন্তরাত্মা যথার্থতঃ যেভাবে অভিব্যক্ত হয়, তাহাই তাঁহার জীবন। তিনি বিশিষ্ট দেশ, কাল ও অবস্থার মধ্যে পড়িয়া যেসব কাজ করেন এবং তাঁহার আবেষ্টনের উপর সাময়িক ভাবে যেরূপ প্রভাব বিস্তার করেন, তাহা দ্বারা তাহার জীবনী গ্রথিত হয়। জীবনী মূলতঃ জীবনেরই বহির্বিকাশ হইলেও, তাহার মধ্যে অনেক ভেজাল জিনিষ মিশান থাকে; অবস্থা বিশেষে তার চেহারা অনেক সময় এমন আকার ধারণ করে যে, তাহা দ্বারা জীবনটী ঢাকা পড়িয়া যায়; বাহিরের কার্য্যাকার্য্য ও অবস্থাপুঞ্জের মধ্য হইতে যথার্থ জীবনটিকে চিনিয়া লওয়া দুষ্কর হইয়া থাকে! খাঁটী মানুষের—সার্থকনামা মহাজনদের—আভ্যন্তরীণ জীবনটীই মানব সমাজের নিকট চিরকাল-স্থায়ী অমূল্য সম্পৎ, এবং তাহার একটি সুস্পষ্ট ও জীবন্ত চিত্র রাখিতে পারিলে দেশ, কাল ও অবস্থার পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও চিরদিনই তাহা মানব প্রাণের উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু তাঁহাদের বড় ছোট কার্য্যাবলী, তাঁহাদের বিভিন্ন

বিষয় সম্বন্ধীয় মতামত প্রভৃতি বাহিরের জিনিষগুলি সম্পূর্ণই সময়ের অধীন, বিশেষ প্রকার পারিপার্শিক অবস্থার উপরেই তাহাদের মূল্য নির্ভর করে। অথচ, আমাদের মত বহির্মুখীন লোকসমূহ মহাপুরুষগণের জীবনী জানিবার জন্য যত লালায়িত, তাঁহাদের জীবন বুঝিবার জন্য ততটা কৌতুহলী ও প্রযত্নশীল নহে।

শ্রীশ্রীবাবা গম্ভীরনাথজী যখন স্থূল দেহে বিদ্যমান ছিলেন, তখন কয়েকবার আমরা তাঁহার নিকট তাহার জীবনী লিখিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলাম, এবং তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের ও সাধন-জীবনের ঘটনাবলী ও অবস্থাপুঞ্জ শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলাম। তিনি সর্ব্বদা স্থিরাসনে অন্তর্নিবদ্ধ দৃষ্টি হইয়াই অবস্থান করিতেন, এবং তাঁহার শ্রীমুখের দু-একটি কথা পাওয়াও নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়াই বিবেচিত হইত। নেহাৎ পীড়াপীড়ি করিলে তিনি গম্ভীর ভাবে বলিতেন, "জীবনীসে ক্যা হোগা" অথবা "প্রপঞ্চসে ক্যা হোগা?" এ কথার সম্যক্ তাৎপর্য্য তখন বুঝিতে পারি নাই, এবং এখনও যে প্রাণে প্রাণে বুঝি, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি আমাদিগকে সর্ব্বদা ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন যে, জীবনী জানার চেষ্টা অপেক্ষা—জীবনের আনুসঙ্গিক কতকগুলি অবান্তর বাহ্যিক ঘটনার অনুসন্ধান ও তাহা নিয়া সময়ক্ষেপ অপেক্ষা—আভ্যন্তরীণ জীবনটীকে স্বকীয় সাধনার সাহায্যে হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিবার চেষ্টা অনেক ভাল;

এবং তাহাই কল্যাণের পথ। নকল নিয়া থাকা অপেক্ষা আসলকে ধরিবার জন্যই প্রযত্ন করা উচিত।

কিন্তু আমাদের জীবনের অধিকাংশ সময় ও শক্তি নকল নিয়াই ব্যাপৃত; শুধু নকল নয়, নকলের নকল নিয়াই প্রধানতঃ আমরা আছি। কেবলমাত্র এক বিষয়ে নকলকে ছাড়িবার চেষ্টা করিলে কি হইবে? এই নকলকে বাদ দিলেই কি আসলকে ধরা যাইবে? বিশেষতঃ যে নকলের মধ্যে আসলের ছাপ কতক কতক লাগিয়া থাকিবার কথা, যে নকলকে অবলম্বন করিয়া আসল সম্বন্ধে অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা আছে, সেই নকলকে বাদ দিলে বাস্তবিকই লোকসান। আসল ধরিতে না পারিয়া তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট নকলকেও ত্যাগ করিলে যে তাহাকে ধরিবার সম্ভাবনা আরও সুদূরপরাহত হওয়ার আশঙ্কা। আর যাঁহারা আসলকে ধরিতে পারিয়াছেন, সেই সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ নকলের মধ্যে আসলের বিবিধ বিলাসই দেখিয়া আনন্দসম্ভোগ করিতে পারেন।

এতদ্ভিন্ন, শ্রীশ্রীনাথজীর এমন অনেক শিষ্য আছেন, যাঁহারা একবারের বেশী তাঁহাকে দেখিবারও সৌভাগ্য লাভ করেন নাই, এবং কাজেই তাঁহার জীবনটীকে ধারণার মধ্যে আনিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার বিশেষ সুবিধাও প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার শিষ্য ব্যতীত আরও অনেক ভক্ত ও ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি—যাঁহারা তাঁহার নাম ও অনন্যসাধারণ

মাহাত্ম্যের কথা অনেক শুনিয়াছেন কিন্তু সঙ্গ করিবার বা তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার সুবিধা পান নাই,—তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত ও উপদেশবাণী শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। এই সব কারণে তাঁহার দেহান্তের কিছুকাল পর হইতেই তাঁহার একখানি জীবনীর আবশ্যকতা অনেকে বোধ করিতে লাগিলেন, এবং অনেকে তজ্জন্য উৎকণ্ঠার সহিত নাথজীউর যোগ্যতর শিষ্যদিগকে অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এমতাবস্থায় অনেক গুরুভ্রাতা একমত হইয়া আমাদের বর্ত্তমান গ্রন্থকারের উপর শ্রীশ্রীগুরুদেবের একখানা জীবনী লিখিবার ভার অর্পণ করেন। তিনি গ্রন্থকাররূপে আত্মপ্রকাশ করিতেই অসম্মত ;—তারপর, জ্ঞানে, প্রেমে, শক্তিতে, আত্ম-স্থিতিতে অতুলনীয় এইরূপ একজন পরিপূর্ণ মহাপুরুষের কর্ম্ম-বাহুল্যবিহীন জীবন অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ লিখিবার সাহস করা তিনি আগুন নিয়া খেলা করার মতই যেন বোধ করিয়া কুণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু ঠাকুর যাহাকে দিয়া যাহা করাইবেন তাহার তাহা না করিয়া উপায় কি ? তিনি প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও, সম্মানার্হ গুরুভাইদের সম্মান রক্ষার্থে এবং বন্ধুদের আগ্রহাতিশয্যে এই কার্য্যে হাত দিতে রাজী হইলেন। তখন এটী তাঁহার সাধনার অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল। তথাপি চলিতে চলিতে অনেকবার তিনি কুণ্ঠাবশতঃ একার্য্যে বিরত হইয়াছেন, আবার বন্ধুদের তাড়নায় আরম্ভ করিয়াছেন।

আমরা সাধারণতঃ জীবনী বলিতে যাহা বুঝি, এবং সাধারণতঃ জীবনী যেভাবে লিখিত হইয়া থাকে, তাহাতে এই 'প্রসঙ্গ'কে ঠিক ঠিক জীবনী বলা যায় কিনা সন্দেহ। গ্রন্থকার শাস্ত্র, মহাপুরুষের বাণী ও স্বীয় অনুভূতি ও বিচারের সাহায্যে মহাপুরুষের জীবনটাই ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং মাঝে মাঝেই পাঠকবর্গকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, এসব প্রসঙ্গ মহাপুরুষের লোকোত্তর জীবনটা বুঝিবার জন্য ইঙ্গিত মাত্র, তাহার সম্যক্ পরিচয় নয়। তিনি লিখিয়াছেন, "জীবন দ্বারাই জীবন চিনিতে হয়, বহির্দৃষ্টিপরায়ণ স্থূলবুদ্ধি দ্বারা নয়।" ক্রিয়া-কলাপ ও বাহ্যিক ঘটনাপরম্পরা প্রভৃতি যেসব উপকরণ দ্বারা জীবনী রচিত হয়, বাবা গম্ভীরনাথের ব্যবহারিক জীবনে স্বভাবতঃই সে সকলের অভাব। তৎসত্ত্বেও লেখক যে পরিমাণ উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার অনেকাংশ তিনি অবান্তরবোধে পরিহার করিয়াছেন, এবং মহাপুরুষের আদর্শ জীবনের একটি আলেখ্য অঙ্কিত করিবার জন্য বাহ্যিক ঘটনা ও অবস্থার সাহায্য যতটুকু আবশ্যক, ততটুকুই তিনি স্বেচ্ছায় ও সবিচারে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য জীবনী বর্ণন করা নয়, যথার্থ জীবনটাকে বিচারশীল ও হৃদয়বান্ ধর্ম্মপিপাসুদের নিকট উপস্থিত করা।

গ্রন্থখানি শেষ করিয়াও গ্রন্থকার ইহার মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করিতেছিলেন না। এবিষয়ে তাঁহার উপর যে ভার ছিল, তাহা বহন করিয়া তিনি খালাস,—

তিনি শ্রদ্ধার্হ সতীর্থদের অনুরোধ রক্ষার্থ এবং নিজের চিত্ত-শুদ্ধির নিমিত্তই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহার মুদ্রণ ও প্রকাশ বিষয়ে তাঁহার কোন হাত আছে বা সামর্থ্য আছে কিংবা দায়িত্ব আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না।

এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ায় এবং অন্য কোন স্থান হইতে কোনরূপ চেষ্টা না হওয়ায়, আমরা আমাদের নিতান্ত ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া মফঃস্বলের একটি অতি ক্ষুদ্র সহরে অবস্থিত থাকিয়াও, সাহসপূর্ব্বক এই মুদ্রণ ও প্রকাশের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম। এক্ষেত্রেও তাহাই মনে হইল যে, ঠাকুর যাহাকে দিয়া যাহা করাইবেন, তাহা না করিয়া উপায় কি? এবং তাহা সম্পাদন করিবার শক্তিও তিনিই দিবেন বৈ কি?

'আমরা' বলিতে, সর্ব্বপ্রথমে আমার শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা, ফেণী বরদা প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন দাস মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি গুরুভক্তির প্রেরণায় স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মুদ্রণ কার্য্যের সর্ব্ববিধ দায়িত্ব নিজে বহন করিতে অগ্রসর না হইলে, এই কার্য্য এখানে সম্পাদন করার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। তিনি নানা প্রকার শারীরিক ও পারিবারিক বিপদ্-আপদ্ অগ্রাহ্য করিয়া এবং আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করিয়া গুরুসেবা বুদ্ধিতে এই কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার এইসব বিপদ্-আপদ্ না হইলে, সম্ভবতঃ মুদ্রণ কার্য্যে যেসব ভুল-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে, তাহা থাকিত না। যাহা হউক, তিনি ও তাঁহার

অনুপ্রাণনায় অনুপ্রাণিত প্রেসের ম্যানেজার প্রমুখ সকল কর্ম্মচারী ভক্তিপূতচিত্তে অতিশয় প্রেমের সহিত নিজকার্য্যবোধে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মুদ্রণ ব্যাপার সমাধা করিয়াছেন। সাধারণ রীতির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাদিগকে মৌখিক ধন্যবাদ দিতে গেলে তাঁহাদের প্রতি অন্যায় করা হইবে। তাঁহাদের এই আন্তরিক পূজা ঠাকুর সাদরে গ্রহণ করুন, ইহাই প্রার্থনা করি।

শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুত সারদাকান্ত বন্দোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় বাবাজীর দেহান্তের পর সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচনা করিয়া আমাদিগকে উপকৃত করিয়াছিলেন। তিনি আমাদের গ্রন্থকারকে তাঁহার পুস্তিকা হইতে ইচ্ছামত যে কোন অংশ উদ্ধৃত করিতে অনুমতি দিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত ভুপতি চন্দ্র দত্ত বি, এ, ও শ্রীযুত মোহিনী মোহন বর্ম্মন্ বি, এল্, পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করা সম্বন্ধে গ্রন্থকারকে অতিশয় প্রেমের সহিত বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। প্রেমাস্পদ শ্রীযুত শরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ মহাশয় প্রুফ সংশোধন বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। শ্রদ্ধার্হ শ্রীযুত পবিত্র নাথ দাস এবং প্রীতিভাজন শ্রীমান্ গোপেশ চন্দ্র ও শান্তকুমার দাস নিজ ব্যয়ে কয়েকখানা ব্লক তৈয়ারী করাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের সকলকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

অবশেষে পাঠকবর্গের নিকট আমাদের করযোড়ে বিনীত নিবেদন এই যে, লেখক যে ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া গ্রন্থখানি লিখিয়াছেন, এবং আমরাও যে ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া ইহার মুদ্রণ ও প্রকাশের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি, তাঁহারা যেন গ্রন্থখানা সেই ভাবেই গ্রহণ করেন, এবং লেখক, মুদ্রক ও প্রকাশকের দোষ ক্রুটী অনুগ্রহ পূর্ব্বক উপেক্ষা করিয়া ও সদয় সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়া প্রসঙ্গের ঈপ্সিত অনুধাবন পূর্ব্বক আলোচ্য জীবনটী নিজেদের জীবন দ্বারা উপলব্ধি করিতে যত্নবান্ হন। তাহা হইলেই আমাদের সেবা গৃহীত হইল বলিয়া নিজে কৃতার্থ বোধ করিব।

শ্রীশ্রীনাথজীর উপদেশামৃতের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত আছে। তাঁহার কৃপাদৃষ্টি হইলে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

ফেনী
রাসপূর্ণিমা
১৩৬২ বঙ্গাব্দ

বিনীত
শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক

দ্বিতীয় সংস্করণে
প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীশ্রীযোগিরাজ গম্ভীরনাথ প্রসঙ্গের প্রথম সংস্করণ বহুবৎসর পূর্ব্বেই নিঃশেষ হইয়াছিল। আমাদের অযোগ্যতাবশতঃ দ্বিতীয় সংস্করণ এই দীর্ঘকাল মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই। অনেক জিজ্ঞাসু ভক্তের দাবী লেখক ও প্রকাশকের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। বিষাদগ্রস্ত চিত্তে ভক্তদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছে। বাহ্যতঃ এই বিলম্বের প্রধান কারণ অর্থাভাব। বস্তুতঃ যোগিরাজের ইচ্ছা অনুকুল না হইলে কিছুই করা সম্ভব নয়। দীর্ঘকাল পরে তিনি তাঁহার এক বিশিষ্ট ভক্তের প্রাণে প্রেরণা সঞ্চার করিলেন। ভক্তটীর নাম শ্রীযুত হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়। স্থূল ভাবে সাধারণের দৃষ্টি হইতে আত্মগোপন করিয়াও যোগীরাজ কি ভাবে করুণা বিতরণ করিতেছেন, বিদেহ হইয়াও কি ভাবে ঐকান্তিক মুমুক্ষুকে দীক্ষা দানে কৃতার্থ করিতেছেন, শ্রীযুত হারাধন তাহার একটি সমুজ্জ্বল নিদর্শন। শ্রীগুরুর প্রেরণায় তাঁহার চিত্তে শ্রীগুরুর জীবনকথা পুনর্মুদ্রণের জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়। তাঁহারই উৎসাহে এবং মুখ্যতঃ তাঁহারই অর্থব্যয়ে এই দ্বিতীয় সংস্কারণ প্রকাশের ব্যবস্থা হয়। যোগিরাজের অন্যতম শিষ্য বৃদ্ধদেহ শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন দাস এবং

তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান্ রবীন্দ্র নাথ দাশের উৎসাহ এবং সাহায্যও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যাঁহারা গুরুসেবা করিয়া জীবন ধন্য করিতেছেন, তাঁহাদের কাহাকেও ধন্যবাদ দেওয়ার অধিকার প্রকাশকের নাই।

লেখক এই সংস্করণে পুস্তকের কতকাংশ সংক্ষিপ্ত করিয়াছেন এবং কতকাংশে অনেক নূতন তথ্য সন্নিবেশিত করিয়াছেন। যোগিরাজের সাধন জীবন এবং সিদ্ধ জীবনের অনেক রহস্য তিনি নূতন ভাবে এই সংস্করণে উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। ভরসা করি, আধ্যাত্মিক কল্যাণকামিগণ পরম কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে যথেষ্ট আলোক প্রাপ্ত হইবেন।

অর্থের অল্পতা হেতু "শ্রীশ্রীযোগিরাজ গম্ভীরনাথ উপদেশামৃত" এতৎসঙ্গে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করা সম্ভব হইল না। যোগিবাজের কৃপাদৃষ্টি হইলেই হইবে।

প্রুফ্-সংশোধনে যতটা সতর্কতা আবশ্যক, নানা কারণে ততটা কার্য্যতঃ হয় নাই। ভ্রম প্রমাদ থাকিলে, তজন্য ক্ষমা ভিক্ষা করি।

কলিকাতা
রাসপূর্ণিমা
১৩৬২ বঙ্গাব্দ

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
প্রকাশক।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়—জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গ	...	১-২৪
দ্বিতীয় অধ্যায়—গোরক্ষনাথ মন্দিরে তরুণ যোগার্থী		২৫-৪৫
তৃতীয় অধ্যায়—যোগ দীক্ষা	...	৪৬-৭৫
চতুর্থ অধ্যায়—কাশী ও ঝুঁসিতে নিবিড় যোগ সাধনা		৭৬-৮৭
পঞ্চম অধ্যায়—অনিকেত যোগী	...	৮৮-৯৮
ষষ্ঠ অধ্যায়—কপিলধারায় অন্তরঙ্গ যোগসাধনা		৯৯-১১৯
সপ্তম অধ্যায়—মহাসিদ্ধি	...	১২০-১৪২
অষ্টম অধ্যায়—ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য	...	১৪৩-১৬১
নবম অধ্যায়—ব্রাহ্মী স্থিতির আদর্শ	...	১৬২-১৭৭
দশম অধ্যায়—সাধনান্তে সহজ জীবন	...	১৭৮-১৯৯
একাদশ অধ্যায়—তীর্থ পর্য্যটন	...	২০০-২১৩
দ্বাদশ অধ্যায়—গোরক্ষপুরে মঠাধ্যক্ষ	...	২১৪-২৩২
ত্রয়োদশ অধ্যায়—জীবন্মুক্তের আশ্রম পরিচালনা		২[illegible]-২৪৮
চতুর্দ্দশ অধ্যায়—শিষ্য সমাগম	...	২৪৯-২৭১
পঞ্চদশ অধ্যায়—কলিকাতায় একমাস	...	[illegible]
ষোড়শ অধ্যায়—হরিদ্বার কুম্ভে গমন	...	[illegible]
সপ্তদশ অধ্যায়—ব্যবহারিক জীবনের অবসান		[illegible]
অষ্টাদশ অধ্যায়—ভক্তবাৎসল্য ও জীবপ্রেম ...		[illegible]

LETTERS OF

SWAMI VIVEKANANDA

I*

Salutation to Bhagavân Ramakrishna!

THE BARANAGORE MATH,
19th Nov., 1888.

Respected Sir,[1]

I have received the two books sent by you and am filled with joy to read your wonderfully affectionate letter which betokens your broad, generous heart. No doubt, it is due to good merit of my previous births that you show, sir, so much kindness to a mendicant like me who lives on begging. By sending your gift of the Vedanta you have laid under lifelong obligation not only myself but the whole group of Shri Ramakrishna's Sannyasins. They all bow down to you in respect. It is not for my own sake alone that I asked of you the copy of Pânini's grammar; a good deal of study, in fact, is given to Sanskrit scriptures in this Math. The Vedas may well be said to have fallen quite out of vogue in Bengal. Many here in this Math are conversant with Sanskrit, and they have a mind to master the Samhitâ portions of the Vedas. They are of opinion that what has to be done must be done to a finish. So, believing that a full measure of proficiency in the Vedic language is impossible without first mastering Panini's grammar, which is the best available for the purpose, a copy of the latter was felt to be a necessity. The grammatical work *Mugdhabodha,*

* An asterisk after the letter number indicates that the letter is translation from Bengali.

[1] Pramadadas Mitra of Varanasi.

which we studied in our boyhood, is superior in many respects to *Laghukaumudi*. You are yourself, however, a deeply learned man and, therefore, the best judge we can have in this matter. So if you consider the *Ashtâdhyâyi* (of Panini) to be the most suitable in our case, you will lay us under a debt of lifelong gratitude by sending the same (provided you feel it convenient and feel so inclined). This Math is not wanting in men of perseverance, talent, and penetrative intellect. I may hope that by the grace of our Master, they will acquire in a short time Panini's system and then succeed in restoring the Vedas to Bengal. I beg to send you two photographs of my revered Master and two parts of some of his teachings as given in his homely style, compiled and published by a certain gentleman—hoping you will give us the pleasure of your acceptance. My health is now much improved, and I expect the blessings of meeting you within two or three months. . . .

Yours etc.,
VIVEKANANDA.

II

AUNTPUR,[1]
7th February, 1889.

Dear M——,

I thank you a hundred thousand times, Master! You have hit Ramakrishna in the right point.

Few, alas, few understand him!

Yours,
VIVEKANANDA.

[1] A village in the Hoogly District, the native place of Swami Premananda. The letter was written to Master Mahâshaya, the writer of *Kathâmrita* (Gospel of Shri Ramakrishna) in Bengali.

PS. My heart leaps with joy—and it is a wonder that I do not go mad when I find anybody thoroughly launched into the midst of the doctrine which is to shower peace on earth hereafter.

III*

Shri Durgâ be my Refuge!

BARANAGORE,
26th June, 1889.

Dear Sir,[1]

For sundry reasons I have been unable to write to you for long, for which please excuse me. I have now obtained news of Gangadhar.[2] He met one of my brother-disciples, and both are now staying in the Uttarakhanda (the sacred Himalayas). Four of us from here are in the Himalayas now, and with Gangadhar they are five. One brother-disciple named Shivananda came across Gangadhar at Srinagar on the way to holy Kedarnath, and Gangadhar has sent two letters here. During his first year in the Himalayas, he could not secure permission to enter Tibet, but he got it the next year. The Lamps love him much, and he has picked up the Tibetan language. He says the Lamps form ninety per cent of the population, but they mostly practise Tântrika forms of worship. The country is intensely cold—eatables there are scarcely any—only dried meat; and Gangadhar had to travel and live on that food. My health is passable, but the state of mind is terrible!

Yours etc.,
VIVEKANANDA.

[1] Pramadadas Mitra of Varanasi.
[2] Swami Akhandananda, a brother-disciple of Swami Vivekananda.

IV*

Victory to God!

BAGHBAZAR, CALCUTTA,
4th July, 1889.

Dear Sir,[1]

It pleased me highly to know all the news in your letter, yesterday. You have asked me to request Gangadhar to write to you, but I see no chance thereof, for though they are sending us letters, they do not stop anywhere for more than two or three days and therefore do not receive any of ours.

Some relative of my former life[2] has purchased a bungalow at Simultala (near Baidyanath in Bihar). The place being credited with a healthy climate, I stayed there for some time. But the summer heat growing excessive, I had an attack of acute diarrhoea, and I have just fled away from the place.

Words fail to describe how strong is the desire in my mind to go to Varanasi and have my soul blessed by meeting you and sojourning with you in good converse, but everything rests on His will! I wonder what linking of heart existed between us, sir, from some previous incarnation that, receiving as I do the love and affection of not a few men of wealth and position in this city of Calcutta, I am apt to feel so much bored by their society, while only through one day's interview my heart felt charmed enough to accept you as a near relative and friend in spiritual life! One reason is that you are a favoured servant of God. Another perhaps is:

[1] Pramadadas Mitra.

[2] i.e. the life he has renounced.

तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वं भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ।[1]

I am indebted to you for the advice which comes from you as the outcome of your experience and spiritual practice. It is very true, and I have also found it so very often, that one has to suffer at times for holding in one's brain novel views of all sorts.

But with me it is a different malady this time. I have not lost faith in a benign Providence—nor am I going ever to lose it—my faith in the scriptures is unshaken. But by the will of God, the last six or seven years of my life have been full of constant struggles with hindrances and obstacles of all sorts. I have been vouchsafed the ideal Shâstra (scripture); I have seen the ideal man ; and yet fail myself to get on with anything to the end—this is my profound misery.

And particularly, I see no chance of success while remaining near Calcutta. In Calcutta live my mother and two brothers. I am the eldest ; the second is preparing for the First Arts Examination, and the third is young.

They were quite well off before, but since my father's death, it is going very hard with them—they even have to go fasting at times! To crown all, some relatives, taking advantage of their helplessness, drove them away from the ancestral residence. Though a part of it is recovered through suing at the High Court, destitution is now upon them—a matter of course in litigation.

Living near Calcutta I have to witness their adversity, and the quality of Rajas prevailing, my egotism sometimes develops into the form of a desire that rises to plunge me into action ; in such moments, a fierce fighting ensues in my mind, and so I wrote that the state of my

[1] Kalidasa's *Shakuntalâ,* Act V: "It must be the memories, unwittingly recalled, of affinities firmly established in previous incarnations through depths of heart."

mind was terrible. Now their lawsuit has come to an end. So bless me that after a stay here in Calcutta for a few days more to settle matters, I may bid adieu to this place for ever.

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्।
तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥[1]

Bless me that my heart may wax strong with supreme strength divine, and that all forms of Mâyâ may drop off from me for aye · We have taken up the Cross, Thou hast laid it upon us and grant us strength that we bear it unto death. Amen!"—*Imitation of Christ.*

I am now staying in Calcutta. My address is: c/o Balaram Babu, 57 Ramkanta Bose's Street, Baghbazar, Calcutta.

Yours etc.,
VIVEKANANDA.

V*

All Glory to God!

BARANAGORE, CALCUTTA,
7th Aug., 1889.

Dear Sir,[2]

It is more than a week since I received your letter, but having had another attack of fever, I could not send

[1] Gitâ, II 70: "Not he that lusteth after objects of desire, but he alone obtaineth peace in whom desires lose themselves like river-water flowing into the ocean but leaving it unaffected and unmodified in spite of constant accession."

[2] Pramadadas Mitra.

a reply all this time, for which please excuse me. For an interval of a month and a half I kept well, but I have suffered again for the last ten days; now I am doing well.

I have certain questions to put, and you, sir, have a wide knowledge of Sanskrit; so please favour me with answers to the following:

1. Does any narrative occur about Satyakâma, son of Jabâlâ, and about Jânashruti, anywhere else in the Vedas excepting the Upanishads?[1]

2. In most cases where Shankarâchâryâ quotes Smriti in his commentary on the *Vedanta-Sutras*, he cites the authority of the Mahâbhârata. But seeing that we find clear proofs about caste being based on qualification both in the Bhishma-parva of the Mahabharata and in the stories there of the Ajagara and of Umâ and Maheshvara, has he made any mention in his writings of this fact?

3. The doctrine of caste in the *Purusha-Sukta* of the Vedas does not make it hereditary—so what are those instances in the Vedas where caste has been made a matter of hereditary transmission?

4. The Âchârya could not adduce any proof from the Vedas to the effect that the Shudra should not study the Vedas. He only quotes "यज्ञेऽनवक्लृप्तः"[2] to maintain that when he is not entitled to perform Yajnas, he has neither any right to study the Upanishads and the like. But the same Acharya contends with reference to "अथातो

[1] The real import of this question lies in the fact that Shankarâchârya in his commentary on the *Vedanta-Sutras*, I iii 34—37, interprets the aphorisms to prove that Upanishadic wisdom was imparted to Janashruti and Satyakama, only because they were *not* Shudras, as borne out by actual texts But as these texts are doubtful even after Shankaracharya's explanation, Swamiji wants to be referred to other Vedic texts where mention has been made of these persons.

[2] "The Shudra is not conceived of as a performer of Yajna or Vedic sacrifices."—Taittiriya Samhitâ, VII. i i.6.

ब्रह्मजिज्ञासा,"[1] that the word अथ (now then) here does not mean "subsequent to the study of the Vedas", because it is contrary to proof that the study of the Upanishad is not permissible without the previous study of the Vedic Mantras and *Brâhmanas* and because there is no intrinsic sequence between the Vedic Karma-kânda (section about rituals) and Vedic Jnâna-kânda (section about knowledge). It is evident, therefore, that one may attain to the knowledge of Brahman without having studied the ceremonial parts of the Vedas. So if there is no sequence between the sacrificial practices and Jnana, why does the Acharya contradict his own statement when it is a case of the Shudras, by inserting the clause "by force of the same logic"? Why should the Shudra not study the Upanishad?

I am mailing you, sir, a book named *Imitation of Christ* written by a Christian Sannyasin. It is a wonderful book. One is astonished to find that such renunciation, Vairâgya, and Dâsya-Bhakti (devotion like that of a faithful servant) have existed even among the Christians. Probably you may have read this book before; if not, it will give me the greatest pleasure if you will kindly read it.

Yours etc.,
VIVEKANANDA.

VI*

BARANAGORE,
17th Aug., 1889.

Dear Sir,[2]

You have expressed embarrassment in your last favour for being addressed reverentially. But the blame attaches

[1] *Vedânta-Sutras* of Vyasa, I. i. 1. It means, "Now then commences hence the enquiry about Brahman."

[2] Pramadadas Mitra.

not to me but to your own excellent qualities. I wrote in one letter before that from the way I feel attracted by your lofty virtues it seems we had some affinity from previous births. I make no distinction as to householder or Sannyasin in this, that for all time my head shall bend low in reverence wherever I see greatness, broadness of heart, and holiness—Shântih, Shântih, Shântih (Peace, Peace, Peace)! My prayer is that among the many people embracing Sannyâsa nowadays, greedy of honour, posing renunciation for the sake of a living, and fallen off from the ideal on both sides, may one in a lakh at least become high-souled like you! To you my Brahmin fellow-disciples who have heard of your noble virtues tender their best prostrations.

About one amongst my several questions to which you sent your replies, my wrong idea is corrected. For this I shall remain indebted to you for ever. Another of these questions was: Whether Acharya Shankara gives any conclusion regarding caste based on Gunas as mentioned in Purânas like the Mahabharata. If he does, where is it to be found? I have no doubt that according to the ancient view in this country, caste was hereditary, and it cannot also be doubted that sometimes the Shudras used to be oppressed more than the helots among the Spartans and the Negroes among the Americans! As for myself, I have no partiality for any party in this caste question, because I know it is a social law and is based on diversity of Guna (merit) and Karma (result of past action). It also means grave harm if one bent on going beyond Guna and Karma cherishes in mind any caste distinctions. In these matters, I have got some settled ideas through the grace of my Guru, but if I come to know of your views, I may just confirm some points or rectify others in them. One doesn't have honey dripping unless one pokes at the hive—so I shall put you some more

questions; and looking upon me as ignorant and as a boy, please give proper replies without taking any offence.

1. Is the Mukti, which the *Vedanta-Sutras* speak of, one and the same with the Nirvâna of the *Avadhuta-Gitâ* and other texts?

2. What is really meant by Nirvana if, according to the aphorism, "Without the function of creating etc,"[1] none can attain to the fullest Godhead?

3. Chaitanya-deva is said to have told Sârvabhauma at Puri, "I understand the Sutras (aphorisms) of Vyasa, they are dualistic; but the commentator makes them monistic, which I don't understand." Is this true? Tradition says, Chaitanya-deva had a dispute with Prakashananda Sarasvati on the point, and Chaitanya-deva won. One commentary by Chaitanya-deva was rumoured to have been existing in Prakashananda's Math.

4. In the Tantra, Acharya Shankara has been called a crypto-Buddhist; views expressed in *Prajnâpâramitâ,* the Buddhist Mahâyâna book, perfectly tally with the Vedantic views propounded by the Acharya. The author of *Panchadashi* also says, "What we call Brahman is the

[1] This aphorism is: जगद्व्यापारवर्जं प्रकरणादसंनिहितत्वाच्च। *Vedanta-Sutras,* IV iv 17—"Having regard to the context which ascribes the threefold function relating to the universe only to God, and because the fact of their conscious mental distinction comes between that function and their liberated state, we have to conclude that the state of final liberation or Mukti in the case of men is devoid of the capacity to create, preserve, and dissolve the universe." So if this capacity is reserved only for God, what is meant, Swamiji asks, by saying that in Nirvana the human merges completely into the Divine?

We must remember that many of the questions here reflect the intellectual stages through which Swamiji was reaching out in those days towards that plenitude of Vedantic wisdom which was his in future years. We also find a glimpse of those processes through which his intellect was growing towards a fuller understanding of our ancient scriptures and customs.

same truth as the Shunya of the Buddhists." What does all this mean?

5. Why has no foundation for the authority of the Vedas been adduced in the *Vedanta-Sutras*? First, it has been said that the Vedas are the authority for the existence of God, and then it has been argued that the authority for the Vedas is the text: "It is the breath of God." Now, is this statement not vitiated by what in Western logic is called an argument in a circle?

6. The Vedanta requires of us faith, for conclusiveness cannot be reached by mere argumentation. Then, why has the slightest flaw, detected in the position of the schools of Sânkhya and Nyâya, been overwhelmed with a fusillade of dialectics? In whom, moreover, are we to put our faith? Everybody seems to be mad over establishing his own view; if, according to Vyasa, even the great Muni Kapila, "the greatest among perfected souls",[1] is himself deeply involved in error, then who would say that Vyasa may not be so involved in a greater measure? Did Kapila fail to understand the Vedas?

7. According to the Nyaya, "Shabda, or Veda (the criterion of truth), is the word of those who have realised the highest" ; so the Rishis as such are omniscient. Then how are they proved, according to the *Surya-siddhânta*, to be ignorant of such simple astronomical truths? How can we accept their intelligence as the refuge to ferry us across the ocean of transmigratory existence, seeing that they speak of the earth as triangular, of the serpent Vâsuki as the support of the earth and so on?

8. If in His acts of creation God is dependent on good and evil Karmas, then what does it avail us to worship Him? There is a fine song of Nareshchandra,

[1] Kapila is so spoken of in Gitâ, X. 26. In his commentary on *Vedanta-Sutras,* II. i. 1, Shankara doubts the identity of the Vedic Kapila with the Sankhyan Kapila.

where occurs the following: "If what lies in one's destiny is to happen anyhow, O Mother, then what good all this invoking by the holy name of Durgâ?"

9. True, it is improper to hold many texts on the same subject to be contradicted by one or two. But why then are the long-continued customs of Madhuparka and the like repealed by one or two such texts as, "The horse sacrifice, the cow sacrifice, Sannyasa, meat-offerings in Shrâddha", etc.[1]? If the Vedas are eternal, then what are the meaning and justification of such specifications as "this rule of Dharma is for the age of Dvâpara," "this for the age of Kali", and so forth?

10. The same God who gives out the Vedas became Buddha again to annul them; which of these dispensations is to be obeyed? Which of these remains authoritative, the earlier or the later one?

11. The Tantra says, in the Kali-Yuga the Veda-Mantras are futile. So which behest of God, the Shiva, is to be followed?

12. Vyasa makes out in the *Vedanta-Sutras* that it is wrong to worship the tetrad of divine manifestation, Vâsudeva, Sankarshana, etc., and again that very Vyasa expatiates on the great merits of that worship in the Bhâgavata! Is this Vyasa a madman?

I have many doubts besides these, and, hoping to have them dispelled from my mind through your kindness, I shall lay them before you in future. Such questions cannot be all set forth except in a personal interview;

[1] Madhuparka was a Vedic ceremony, usually in honour of a guest, in which a respectful offering was to be made consisting, among other dainties, of beef. The text which Swamiji partially quotes forbids such food. The full text means that in the Kali-Yuga the following five customs are to be forsaken: The horse sacrifice, cow-killing ceremonies, meat-offerings in Shraddha, Sannyasa, and maintaining the line of progeny through the husband's younger brother in case of failure through the husband.

neither can as much satisfaction be obtained as one expects to. So I have a mind to lay before you all these facts when presenting myself to you, which I expect will be very soon, by the grace of the Guru.

I have heard it said that without inner progress in the practice of religion, no true conclusion can be reached concerning these matters, simply by means of reasoning; but satisfaction, at least to some extent, seems to be necessary at the outset.

Yours etc.,
VIVEKANANDA.

VII*

C/O, BABU SATISH CHANDRA MUKHERJI,
GORABAZAR, GHAZIPUR.
21st Jan., 1890.

Dear Sir,[1]

I reached Ghazipur three days ago. Here I am putting up in the house of Babu Satish Chandra Mukherji, a friend of my early age. The place is very pleasant. Close by flows the Ganga; but bathing there is troublesome, for there is no regular path, and it is hard work wading through sands. Babu Ishan Chandra Mukherji, my friend's father, that noble-hearted man of whom I spoke to you, is here. Today he is leaving for Varanasi whence he will proceed to Calcutta. I again had a great mind to go over to Kashi, but the object of my coming here, namely, an interview with the Bâbâji,[2] has not yet been realised, and hence the delay of a few days becomes necessary. Every-

[1] Pramadadas Mitra.
[2] Pavhâri Bâbâ, the great saint.

thing here appears good. The people are all gentlemen, but very much Westernised; and it is a pity I am so thoroughly against every affectation of the Western idea. Only my friend very little affects such idea. What a frippery civilisation is it indeed that the foreigners have brought over here! What a materialistic illusion have they created! May Vishvanatha[1] save these weak-hearted! After seeing Babaji, I shall send you a detailed account.

Yours etc.,
VIVEKANANDA.

PS. Alas the irony of our fate, that in this land of Bhagavân Shuka's birth, renunciation is looked down upon as madness and sin!

VIII*

GHAZIPUR,
7th Feb., 1890.

Dear Sir,[2]

I feel very happy to hear from you just now. Apparently in his features, the Babaji is a Vaishnava, the embodiment, so to speak, of Yoga, Bhakti, and humility. His dwelling has walls on all sides with a few doors in them. Inside these walls, there is one long underground burrow wherein he lays himself up in Samâdhi. He talks to others only when he comes out of the hole. Nobody knows what he eats, and so they call him Pavhâri (air-eating) Bâbâ. Once he did not come out of the hole for five years, and people thought he had given up the

[1] Lord of the Universe, i.e. Shiva, presiding deity of Varanasi
[2] Pramadadas Mitra.

body. But now again he is out. But this time he does not show himself to people, and talks from behind the door. Such sweetness in speech I have never come across! He does not give a direct reply to questions but says, "What does this servant know?" But then fire comes out as the talking goes on. On my pressing him very much he said, "Favour me highly by staying here some days." But he never speaks in this way; so from this I understood he meant to reassure me; and whenever I am importunate, he asks me to stay on. So I wait in hope. He is a learned man no doubt, but nothing in the line betrays itself. He performs scriptural ceremonials, for from the full-moon day to the last day of the month, sacrificial oblations go on. So it is sure, he is not retiring into the hole during this period. How can I ask his permission,[1] for he never gives a direct reply; he goes on multiplying such expressions as "this servant", "my fortune", and so on. If you yourself have a mind, then come sharp on receipt of this note. Or after his passing away, the keenest regret will be left in your mind. In two days you may return after an interview—I mean a talk with him from outside. My friend Satish Babu will receive you most warmly. So, do come up directly you receive this; I shall meanwhile let Babaji know of you.

Yours etc.,

VIVEKANANDA.

PS. Even though one can't have his company, no trouble taken for the sake of such a great soul can ever go unrewarded.

[1] Evidently for a proposed visit to the saint by the correspondent from Varanasi.

IX*

Salutation to Bhagavan Ramakrishna!

C/o, Satish Mukherji,
Gorabazar, Ghazipur.
14th February, 1890.

Revered Sir,[1]

I am in receipt of your letter of contrition. I am not leaving this place soon—it is impossible to avoid the Babaji's request. You have expressed remorse at not having reaped any appreciable results by serving the Sâdhus (holy men). It is true, and yet not true; it is true if you look towards ideal bliss, but if you look behind to the place from which you started you will find that before you were an animal, now you are a man, and will be a god or God Himself in future. Moreover, that sort of regret and dissatisfaction is very good; it is the prelude to improvement. Without this none can rise. He who puts on a turban and immediately sees the Lord, progresses thus far and no farther. You are blessed indeed to have that constant dissatisfaction preying upon your mind—rest assured that there is no danger for you. . . . You are a keenly intelligent man, and know full well that patience is the best means of success. In this respect I have no doubt that we light-headed boys have much to learn from you. . . . You are a considerate man, and I need not add anything. Man has two ears but one mouth. You specially are given to plain-speaking, and are chary of making large promises—things that sometimes make me cross with you, but upon reflection I find that it is you who have acted with discretion. "Slow but sure." "What is lost

[1] Balaram Bose.

in power is gained in speed." However, in this world everything depends upon one's words. To get an insight behind the words (specially, with your economical spirit masking all) is not given to all, and one must associate long with a man to be able to understand him. . . . Religion is not in sects, nor in making a fuss—why do you forget these teachings of our revered Master? Please help as far as it lies in you, but to judge what came of it, whether it was turned to good or evil account, is perhaps beyond our jurisdiction. . . . Considering the great shock which Girish Babu has received, it will give him immense peace to serve Mother at this moment. He is a very keen-witted person. And our beloved Master had perfect confidence in you, used to dine nowhere else except at your place, and, I have heard, Mother too has the fullest confidence in you. In view of these you will please bear and forbear all shortcomings of us fickle boys, treating them as if they were done by your own boy. This is all I have got to say. Please let me know by return of post when the (birthday) Anniversary (of Shri Ramakrishna) is to take place. A pain in the loins is giving me much trouble. In a few days the place will look exceedingly beautiful, with miles and miles of rose-banks all in flower. Satish says he will then send some fresh roses and cuttings for the Festival. . . . May the Lord ordain that your son becomes a man, and never a coward!

Yours affectionately,

VIVEKANANDA.

PS. If Mother has come, please convey to her my countless salutations, and ask her to bless me that I may have unflinching perseverance. Or, if that be impossible in this body, may it fall off soon!

X*

GHAZIPUR,
14th Feb., 1890.

My dear Gupta,[1]

I hope you are doing well. Do your own spiritual exercises and knowing yourself to be the humblest servant of all, serve them. Those with whom you are staying are such that even I am not worthy to call myself their humblest servant and take the dust of their feet. Knowing this, serve them and have devotion for them. Don't be angry even if they abuse or even hurt you desperately. Never mix with women. Try to be hardy little by little, and gradually accustom yourself to maintain the body out of the proceeds of begging. Whoever takes the name of Ramakrishna, know him to be your Guru. Everyone can play the role of a master, but it is very difficult to be a servant. Specially you should follow Shashi.[2] Know it for certain that without steady devotion for the Guru, and unflinching patience and perseverance, nothing is to be achieved. You must have strict morality. Deviate an inch from this and you are gone for ever.

Yours affectionately,
VIVEKANANDA.

XI*

Victory to the Lord!

GHAZIPUR,
19th Feb., 1890.

Dear Sir,[3]

I wrote a letter to brother Gangadhar asking him to

[1] Swami Sadananda, a disciple of Swami Vivekananda.

[2] Swami Ramakrishnananda, a brother-disciple of Swami Vivekananda.

[3] Pramadadas Mitra.

stop his wanderings and settle down somewhere and to send me an account of the various Sadhus he had come across in Tibet and their ways and customs. I enclose the reply that came from him. Brother Kali[1] is having repeated attacks of fever at Hrishikesh. I have sent him a wire from this place. So if from the reply I find I am wanted by him, I shall be obliged to start direct for Hrishikesh from this place, otherwise I am coming to you in a day or two. Well, you may smile, sir, to see me weaving all this web of Mâyâ—and that is no doubt the fact. But then there is the chain of iron, and there is the chain of gold. Much good comes of the latter; and it drops off by itself when all the good is reaped. The sons of my Master are indeed the great objects of my service, and here alone I feel I have some duty left for me. Perhaps I shall send brother Kali down to Allahabad or somewhere else, as convenient. At your feet are laid a hundred and one faults of mine—"I am as thy son, so guide me who have taken refuge in thee."[2]

Yours etc.,
VIVEKANANDA.

XII*

Salutation to Bhagavan Ramakrishna!

GHAZIPUR,
February, 1890.

Beloved Akhandananda,

Very glad to receive your letter. What you have written about Tibet is very promising, and I shall try

[1] Swami Abhedananda, a brother-disciple of Swami Vivekananda.
[2] An adaptation from the Gitâ, II. 7.

to go there once. In Sanskrit Tibet is called the Uttarakuruvarsha, and is not a land of Mlechchhas. Being the highest tableland in the world, it is extremely cold, but by degrees one may become accustomed to it. About the manners and customs of the Tibetans you have written nothing; why, if they are so hospitable, did they not allow you to go on? Please write everything in detail, in a long letter. I am sorry to learn that you will not be able to come, for I had a great longing to see you. It seems that I love you more than all others. However, I shall try to get rid of this Maya too.

The Tântrika rites among the Tibetans that you have spoken of arose in India itself, during the decline of Buddhism. It is my belief that the Tantras, in vogue amongst us, were the creation of the Buddhists themselves. Those Tantrika rites are even more dreadful than our doctrine of Vâmâchâra; for in them adultery got a free rein, and it was only when the Buddhists became demoralised through immorality that they were driven away by Kumarila Bhatta. As some Sannyasins speak of Shankara, or the Bâuls of Shri Chaitanya, that he was in secret an epicure, a drunkard, and one addicted to all sorts of abominable practice—so the modern Tantrika Buddhists speak of the Lord Buddha as a dire Vâmâchâri, and give an obscene interpretation to the many beautiful precepts of the *Prajnâpâramitâ*, such as the *Tattvagâthâ* and the like. The result of all this has been that the Buddhists are divided into two sects nowadays; the Burmese and the Sinhalese have generally set the Tantras at naught, have likewise banished the Hindu gods and goddesses, and at the same time have thrown overboard the Amitâbha Buddha held in regard among the Northern School of Buddhists. The long and the short of it is that the Amitabha Buddha and the other gods whom the Northern School worship are not mentioned in books like

the *Prajnaparamita,* but a lot of gods and goddesses are recommended for worship. And the Southern people have wilfully transgressed the Shâstras and eschewed the gods and goddesses. The phase of Buddhism which declares "Everything for others", and which you find spread throughout Tibet, has greatly struck modern Europe. Concerning that phase, however, I have a good deal to say—which it is impossible to do in this letter. What Buddha did was to break wide open the gates of that very religion which was confined in the Upanishads to a particular caste. What special greatness does his theory of Nirvana confer on him? His greatness lies in his unrivalled sympathy. The high orders of Samadhi etc., that lend gravity to his religion, are almost all there in the Vedas; what are absent there are his intellect and heart, which have never since been paralleled throughout the history of the world.

The Vedic doctrine of Karma is the same as in Judaism and all other religions, that is to say, the purification of the mind through sacrifices and such other external means—and Buddha was the first man who stood against it. But the inner essence of the ideas remained as of old—look at that doctrine of mental exercises which he preached, and that mandate of his to believe in the Suttas instead of the Vedas. Caste also remained as of old (caste was not wholly obsolete at the time of Buddha), but it was now determined by personal qualifications; and those that were not believers in his religion were declared as heretics, all in the old style. "Heretic" was a very ancient word with the Buddhists, but then they never had recourse to the sword (good souls!) and had great toleration. Argument blew up the Vedas. But what is the proof of your religion? Well, put faith in it! —the same procedure as in all religions. It was however an imperative necessity of the times; and that was

the reason of his having incarnated himself. His doctrine is like that of Kapila. But that of Shankara, how far more grand and rational! Buddha and Kapila are always saying the world is full of grief and nothing but that—flee from it—ay, for your life, do! Is happiness altogether absent here? It is a statement of the nature of what the Brahmos say: The world is full of happiness! There is grief, forsooth, but what can be done? Perchance some will suggest that grief itself will appear as happiness when you become used to it by constant suffering. Shankara does not take this line of argument. He says: This world *is* and *is not*; *manifold*, yet *one*, I shall unravel its mystery—I shall know whether grief be there, or anything else; I do not flee from it as from a bugbear. I will know all about it—as to the infinite pain that attends its search, well, I am embracing it in its fullest measure. Am I a beast that you frighten me with happiness and misery, decay and death, which are but the outcome of the senses? I will know about it—will give up my life for it. There is nothing to know about in this world—therefore, if there be anything beyond this relative existence—what the Lord Buddha has designated as Prajnâpâra—the transcendental—if such there be, I want that alone. Whether happiness attends it or grief, I do not care. What a lofty idea! How grand! The religion of Buddha has reared itself on the Upanishads, and upon that also the philosophy of Shankara. Only, Shankara had not the slightest bit of Buddha's wonderful heart, dry intellect merely! For fear of the Tantras, for fear of the mob, in his attempt to cure a boil he amputated the very arm itself![1] One has to write a big volume if one has to write about them at all—but I have neither the learning nor the leisure for it.

[1] In his anxiety to defend the purity of the Vedic religion against the excesses of Tantrikism, which was capturing the rank and file

Lord Buddha is my Ishta—my God. He preached no theory about Godhead—he was himself God, I fully believe it. But no one has the power to put a limit to God's infinite glory. No, not even God Himself has the power to make Himself limited. The translation of the *Gandâra-Sutta* that you have made from the *Suttanipâta*, is excellent. In that book there is another *Sutta*—the *Dhaniya-Sutta*—which has got a similar idea. There are many passages in the *Dhammapada* too, with similar ideas. But that is at the last stage, when one has got perfectly satisfied with knowledge and realisation, is the same under all circumstances and has gained mastery over his senses—ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । He who has not the least regard for his body as something to be taken care of—it is he who may roam about at pleasure like the mad elephant caring for naught. Whereas a puny creature like myself should practise devotion, sitting at one spot, till he attains realisation; and then only should he behave like that; but it is a far-off question—very far indeed.

चिन्ताशून्यमदैन्यभैक्ष्यमशनं पानं सरिद्वारिषु
स्वातन्त्र्येण निरंकुशा स्थितिरभीर्निद्रा श्मशाने वने
वस्त्रं क्षालनशोषणादिरहितं दिग्वास्तु शय्या मही
सञ्चारो निगमान्तवीथिषु विदां क्रीडा परे ब्रह्मणि ॥

of his countrymen, Shankara neglected the problem of the latter, stigmatised as Shudras by the Vedicists This is perhaps the meaning of Swamiji. It seems he could never forgive Shankara for applying in his commentary on the *Brahma-Sutras* the old logic of forbidding Vedic rituals to the Shudras to the more modern question of their right to higher modes of worship (Upâsanâ) and knowledge (Jnâna) of the Jnâna-kânda.

विमानमालम्ब्य शरीरमेतत्
भुनत्त्यशेषान् विषयानुपस्थितान् ।
परेच्छया बालवदात्मवेत्ता
योऽव्यक्तलिङ्गोऽननुषक्तबाह्यः ॥
दिगम्बरो वापि च सोम्बरो वा
त्वगम्बरो वापि चिदम्बरस्थः ।
उन्मत्तवद्वापि च बालवद्वा
पिशाचवद्वापि चरत्यवन्याम् ॥

(*Vivekachudâmani*, 538-40)

—To a knower of Brahman food comes of itself, without effort—he drinks water wherever he gets it. He roams at pleasure everywhere—he is fearless, sleeps sometimes in the forest, sometimes in a crematorium, and treads the Path which the Vedas have taken but whose end they have not seen. His body is like the sky; and he is guided, like a child, by others' wishes; he is sometimes naked, sometimes in gorgeous clothes, and at times has only Jnana as his clothing; he behaves sometimes like a child, sometimes like a madman, and at other times again like a ghoul, indifferent to cleanliness.

I pray to the holy feet of our Guru that you may have that state, and you may wander like the rhinoceros.

Yours etc.,
VIVEKANANDA.

XIII*

Victory to the Lord!

GHAZIPUR,
3rd March, 1890.

Dear Sir,[1]

Your kind letter comes to hand just now. You know

[1] Pramadadas Mitra.

not, sir, I am a very soft-natured man in spite of the stern Vedantic views I hold. And this proves to be my undoing. At the slightest touch I give myself away; for howsoever I may try to think only of my own good, I slip off in spite of myself to think of other peoples' interests. This time it was with a very stern resolve that I set out to pursue my own good, but I had to run off at the news of the illness of a brother[1] at Allahabad! And now comes this news from Hrishikesh, and my mind has run off with me there. I have wired to Sharat,[2] but no reply yet—a nice place indeed to delay even telegrams so much! The lumbago obstinately refuses to leave me, and the pain is very great. For the last few days I haven't been able to go to see Pavhariji, but out of his kindness he sends every day for my report. But now I see the whole matter is inverted in its bearings! While I myself have come, a beggar, at his door, he turns round and wants to learn of me! This saint perhaps is not yet perfected—too much of practices, vows, observances, and too much of self-concealment. The ocean in its fullness cannot be contained within its shores, I am sure. So it is not good, I have decided, to disturb this Sadhu for nothing, and very soon I shall ask leave of him to go. No help, you see; Providence has dealt me my death to make me so tender! Babaji does not let me off, and Gagan Babu (whom probably you know—an upright, pious, and kind-hearted man) does not let me off. If the wire in reply requires my leaving this place, I go; if not, I am coming to you at Varanasi in a few days. I am not going to let you off—I must take you to Hrishikesh—no excuse or objections will do. What are you saying about difficulties there of keeping clean? Lack of water in the hills or lack of room!! Tirthas (places of pilgrimage) and Sannyasins

[1] Swami Yogananda, suffering from chicken pox

[2] Swami Saradananda, a brother-disciple

of the Kali-Yuga—you know what they are. Spend money and the owners of temples will fling away the installed god to make room for you; so no anxiety about a resting-place! No trouble to face there, I say; the summer heat has set in there now, I believe, though not that degree of it as you find at Varanasi—so much the better. Always the nights are quite cool there, from which good sleep is almost a certainty.

Why do you get frightened so much? I stand guarantee that you shall return home safe and that you shall have no trouble anywhere. It is my experience that in this British realm no fakir or householder gets into any trouble.

Is it a mere idle fancy of mine that between us there is some connection from previous birth? Just see how one letter from you sweeps away all my resolution, and I bend my steps towards Varanasi leaving all matters behind!

I have written again to brother Gangadhar and have asked him this time to return to the Math. If he comes, he will meet you. How is the climate at Varanasi now? By my stay here I have been cured of all other symptoms of malaria, only the pain in the loins makes me frantic; day and night it is aching and chafes me very much. I know not how I shall climb up the hills. I find wonderful endurance in (Pavhari) Babaji, and that's why I am begging something of him; but no inkling of the mood to give, only receiving and receiving! So I also fly off.

Yours etc.,
VIVEKANANDA.

PS. To no big person am I going any longer—"Remain, O mind, within yourself, go not to anybody else's door; whatever you seek, you shall obtain sitting at your ease, only seek for it in the privacy of your heart.

There is the supreme Treasure, the philosopher's stone, and He can give whatever you ask for; for countless gems, O mind, lie strewn about the portals of His abode. He is the wishing-stone that confers boons at the mere thought." Thus says the poet Kamalâkânta.

So now the great conclusion is that Ramakrishna has no peer; nowhere else in this world exists that unprecedented perfection, that wonderful kindness for all that does not stop to justify itself, that intense sympathy for man in bondage. Either he must be the Avatâra as he himself used to say, or else the ever-perfected divine man, whom the Vedanta speaks of as the free one, who assumes a body for the good of humanity. This is my conviction sure and certain; and the worship of such a divine man has been referred to by Patanjali in the aphorism: "Or the goal may be attained by meditating on a saint".[1]

Never during his life did he refuse a single prayer of mine; millions of offences has he forgiven me; such great love even my parents never had for me. There is no poetry, no exaggeration in all this. It is the bare truth and every disciple of his knows it. In times of great danger, great temptation, I have wept in extreme agony with the prayer, "O God, do save me", and no response has come from anybody; but this wonderful saint, or Avatara, or anything else he may be, has come to know of all my affliction through his powers of insight into human hearts and has lifted it off—in spite of my desire to the contrary—after getting me brought to his presence. If the soul be deathless, and so, if he still lives, I pray to him again and again, "O Bhagavan Ramakrishna,

[1] Patanjali's aphorism has "Ishvara" in place of "saint". Nârada has an aphorism which runs thus: Bhakti (Supreme Love) is attainable chiefly through the grace of a saint, or by a bit of Divine Grace.

thou infinite ocean of mercy and my only refuge, do graciously fulfil the desires of my esteemed friend, who is every inch a great man". May he impart to you all good, he whom alone I have found in this world to be like an ocean of unconditioned mercy! Shântih, Shantih, Shantih.

Please send a prompt reply.

Yours etc.,
VIVEKANANDA.

XIV*

57 RAMKANTA BOSE'S STREET,
BAGHBAZAR, CALCUTTA,
26th May, 1890.

Dear Sir,[1]

I write this to you while caught in a vortex of many untoward circumstances and great agitation of mind; with a prayer to Vishvanatha, please think of the propriety and possibility, or otherwise, of all that I set forth below and then oblige me greatly by a reply.

1. I have already told you at the outset that I am Ramakrishna's slave, having laid my body at his feet "with Til and Tulasi leaves", I cannot disregard his behest. If it is in failure that that great sage laid down his life after having attained to superhuman heights of Jnana, Bhakti, Love, and powers, and after having practised for forty years stern renunciation, non-attachment, holiness, and great austerities, then where is there anything for us to count on? So I am obliged to trust his words as the words of one identified with truth.

2. Now his behest to me was that I should devote

[1] Pramadadas Mitra.

myself to the service of the order of all-renouncing devotees founded by him, and in this I have to persevere, come what may, being ready to take heaven, hell, salvation, or anything that may happen to me.

3. His command was that his all-renouncing devotees should group themselves together and I am entrusted with seeing to this. Of course, it matters not if any one of us goes out on visits to this place or that, but these shall be but visits, while his own opinion was that absolute homeless wandering suited him alone who was perfected to the highest point. Before that state, it is proper to settle somewhere to dive down into practice. When all the ideas of body and the like are dissolved of themselves, a person may then pursue whatever state comes to him. Otherwise, it is baneful for a practising aspirant to be always wandering.

4. So in pursuance of this his commandment, his group of Sannyasins are now assembled in a dilapidated house at Baranagore, and two of his lay disciples, Babu Suresh Chandra Mitra and Babu Balaram Bose, so long provided for their food and house-rent.

5. For various reasons, the body of Bhagavan Ramakrishna had to be consigned to fire. There is no doubt that this act was very blamable. The remains of his ashes are now preserved, and if they be now properly enshrined somewhere on the banks of the Ganga, I presume we shall be able in some measure to expiate the sin lying on our head. These sacred remains, his seat, and his picture are every day worshipped in our Math in proper form; and it is known to you that a brother-disciple of mine[1] of Brahmin parentage, is occupied day and night with the task. The expenses of the worship used also to be borne by the two great souls mentioned above.

6. What greater regret can there be than this that

[1] Shashi or Swami Ramakrishnananda.

no memorial could yet be raised in this land of Bengal in the very neighbourhood of the place where he lived his life of Sâdhanâ (spiritual struggle)—he by whose birth the race of Bengalis has been sanctified, the land of Bengal has become hallowed, he who came on earth to save the Indians from the spell of the worldly glamour of Western culture and who therefore chose most of his all-renouncing disciples from university men?

7. The two gentlemen mentioned above had a strong desire to have some land purchased on the banks of the Ganga and see the sacred remains enshrined on it, with the disciples living there together; and Suresh Babu had offered a sum of Rs. 1,000 for the purpose, promising to give more, but for some inscrutable purpose of God he left this world yesternight! And the news of Balaram Babu's death is already known to you.

8. Now there is no knowing as to where his disciples will stand with his sacred remains and his seat (and you know well, people here in Bengal are profuse in their professions, but do not stir out an inch in practice). The disciples are Sannyasins and are ready forthwith to depart anywhere their way may lie. But I, their servant, am in an agony of sufferings, and my heart is breaking to think that a small piece of land could not be had in which to install the remains of Bhagavan Ramakrishna.

9. It is impossible with a sum of Rs. 1,000 to secure land and raise a temple near Calcutta. Some such land would at least cost about five to seven thousands.

10. You remain now the only friend and patron of Shri Ramakrishna's disciples. In the North-Western Province (i.e. Uttar Pradesh) great indeed is your fame, your position, and your circle of acquaintance. I request you to consider, if you feel like it, the propriety of your getting the affair through by raising subscriptions from well-to-do pious men known to you in your province. If

you deem it proper to have some shelter erected on the banks of the Ganga in Bengal for Bhagavan Ramakrishna's sacred remains and for his disciples, I shall with your leave report myself to you, and I have not the slightest qualm to beg from door to door for this noble cause, for the sake of my Lord and his children. Please give this proposal your best thoughts with prayers to Vishvanatha. To my mind, if all these sincere, educated, youthful Sannyasins of good birth fail to live up to the ideals of Shri Ramakrishna owing to want of an abode and help, then alas for our country!

11. If you ask, "You are a Sannyasin, so why do you trouble over these desires?"—I would then reply, I am Ramakrishna's servant, and I am willing even to steal and rob, if by doing so I can perpetuate his name in the land of his birth and Sadhana and help even a little his disciples to practise his great ideals. I know you to be my closest in kinship, and I lay my mind bare to you. I have returned to Calcutta for this reason. I had told you this before I left, and now I leave it to you to do what you think best.

12. If you argue that it is better to have the plan carried out in some place like Kashi, my point is, as I have told you, it would be the greatest pity if the memorial shrine could not be raised in the land of his birth and Sadhana! The condition of Bengal is pitiable. The people here cannot even dream what renunciation truly means—luxury and sensuality have been so much eating into the vitals of the race! May God send renunciation and unworldliness into this land! They have here nothing to speak of, while the people of the North-Western Province, specially the rich there, as I believe, have great zeal in noble causes like this. Please send me such reply as you think best. Gangadhar has not yet arrived today

and may do so tomorrow. I am so eager to see him again.

Please write to the address given above.

Yours etc.,
VIVEKANANDA.

XV

BOMBAY,
20th September, 1892.

DEAR PANDITJI MAHARAJ,[1]

Your letter has reached me duly. I do not know why I should be undeservingly praised. "None is good, save One, that is, God", as the Lord Jesus hath said. The rest are only tools in His hands. "Gloria in Excelsis". "Glory unto God in the highest", and unto men that deserve, but not to such an undeserving one like me. Here, "The servant is *not* worthy of the hire"; and a Fakir, especially, has no right to any praise whatsoever, for would you praise your servant for simply doing his duty?

. . . My unbounded gratitude to Pandit Sundarlalji, and to my Professor[2] for this kind remembrance of me.

Now I would tell you something else. The Hindu mind was ever deductive and never synthetic or inductive. In all our philosophies, we always find hair-splitting arguments, taking for granted some general proposition, but the proposition itself may be as childish as possible. Nobody ever asked or searched the truth of these general propositions. Therefore, independent thought we have almost none to speak of, and hence the dearth of those sciences which are the results of observation and generalisation. And why was it thus? From two causes: The tremen-

[1] Pandit Shankarlal of Khetri.

[2] With whom he read the Mahâ-Bhâshya on Pânini.

dous heat of the climate forcing us to love rest and contemplation better than activity, and the Brâhmins as priests never undertaking journeys or voyages to distant lands. There were voyagers and people who travelled far; but they were almost always traders, i.e. people from whom priestcraft and their own sole love for gain had taken away all capacity for intellectual development. So their observations, instead of adding to the store of human knowledge, rather degenerated it. For, their observations were bad, and their accounts exaggerated and tortured into fantastical shapes, until they passed all recognition.

So you see, we must travel, we must go to foreign parts. We must see how the engine of society works in other countries, and keep free and open communication with what is going on in the minds of other nations, if we really want to be a nation again. And over and above all, we must cease to tyrannise. To what a ludicrous state are we brought! If a Bhângi comes to anybody as a Bhangi, he would be shunned as the plague; but no sooner does he get a cupful of water poured upon his head with some mutterings of prayers by a Pâdri, and get a coat on his back, no matter how threadbare, and come into the room of the most orthodox Hindu—I don't see the man who then dare refuse him a chair and a hearty shake of the hands! Irony can go no further. And come and see what they, the Pâdris, are doing here in the Dakshin (South). They are converting the lower classes by lakhs; and in Travancore, the most priest-ridden country in India—where every bit of land is owned by the Brahmins, and the females, even of the *royal family*, hold it as high honour to live in concubinage with the Brahmins—nearly one-fourth has become Christian! And I cannot blame them; what part have they in David

and what in Jesse? When, when, O Lord, shall man be brother to man?

Yours,
VIVEKANANDA.

XVI

KHETRI,
May, 1893.

DEAR DIWANJI SAHEB,[1]

Surely my letter had not reached you before you wrote to me. The perusal of your letter gave me both pleasure and pain simultaneously: pleasure, to see that I have the good fortune to be loved by a man of your heart, power, and position; and pain, to see that my motive has been misinterpreted throughout. Believe me, that I love you and respect you like a father and that my gratitude towards you and your family is surely unbounded. The fact is this. You may remember that I had from before a desire to go to Chicago. When at Madras, the people there of their own accord in conjunction with H. H. of Mysore and Ramnad made every arrangement to send me up. And you may also remember that between H. H. of Khetri and myself there are the closest ties of love. Well, I, as a matter of course, wrote to him that I was going to America. Now the Raja of Khetri thought in his love that I was bound to see him once before I departed, especially as the Lord has given him an heir to the throne and great rejoicings were going on here; and to make sure of my coming he sent his Private Secretary all the way to Madras to fetch me, and of course I was bound to come. In the meanwhile I telegraphed to your brother at Nadiad to know whether you were there, and, unfortunately, the answer I could

[1] Haridas Viharidas Desai, Diwan of Junagad.

not get; therefore, the Secretary who, poor fellow, had suffered terribly for his master in going to and fro Madras and with his eye wholly on the fact that his master would be unhappy if we could not reach Khetri within the Jalsa (festival), bought tickets at once for Jaipur. On our way we met Mr. Ratilal who informed me that my wire was received and duly answered and that Mr. Viharidas was expecting me. Now it is for you to judge, whose duty it has been so long to deal even justice. What would or could I do in this connection? If I would have got down, I could not have reached in time for the Khetri rejoicings; on the other hand, my motives might be misinterpreted. But I know you and your brother's love for me, and I knew also that I would have to go back to Bombay in a few days on my way to Chicago. I thought that the best solution was to postpone my visit till my return. As for my feeling affronted at not being attended by your brothers, it is a new discovery of yours which I never even dreamt of; or, God knows, perhaps, you have become a thought-reader. Jokes apart, my dear Diwanji Saheb, I am the same frolicsome, mischievous but, I assure you, innocent boy you found me at Junagad, and my love for your noble self is the same or increased a hundredfold because I have had a mental comparison between yourself and the Diwans of nearly all the states in Dakshin, and the Lord be my witness how my tongue was fluent in your praise (although I know that my powers are quite inadequate to estimate your noble qualities) in every Southern court. If this be not a sufficient explanation, I implore you to pardon me as a father pardons a son, and let me not be haunted with the impression that I was ever ungrateful to one who was so good to me.

Yours,
VIVEKANANDA.

PS. I depend on you to remove any misconception in the mind of your brother about my not getting down and that, even had I been the very devil, I could not forget their kindness and good offices for me.

As to the other two Swamis,[1] they were my Gurubhais (brother-disciples), who went to you last at Junagad; of them one is our leader. I met them after three years and we came together as far as Abu and then I left them. If you wish, I can take them back to Nadiad on my way to Bombay. May the Lord shower his blessings on you and yours.

Yours,
V.

XVII

BOMBAY,
22nd May, 1893.

DEAR DIWANJI SAHEB,[2]

Reached Bombay a few days ago and would start off in a few days. Your friend, the Banya gentleman to whom you wrote for the house accommodation, writes to say that his house is already full of guests and some of them are ill and that he is very sorry he cannot accommodate me. After all we have got a nice, airy place.

. The Private Secretary of H. H. of Khetri and I are now residing together. I cannot express my gratitude to him for his love and kindness to me. He is what they call a Tazimi Sardar in Rajputana, i.e. one of those whom the Rajas receive by rising from their seats. Still he is so simple, and sometimes his service for me makes me almost ashamed.

[1] Swamis Brahmananda (Rakhal) and Turiyananda (Hari).
[2] Haridas Viharidas Desai.

. . . Often and often, we see that the very best of men even are troubled and visited with tribulations in this world; it may be inexplicable; but it is also the experience of my life that the heart and core of everything here is good, that whatever may be the surface waves, deep down and underlying everything, there is an infinite basis of goodness and love; and so long as we do not reach that basis, we are troubled; but having once reached that zone of calmness, let winds howl and tempests rage. The house which is built on a rock of ages cannot shake. I thoroughly believe that a good, unselfish and holy man like you, whose whole life has been devoted to doing good to others, has already reached this basis of firmness which the Lord Himself has styled as "rest upon Brahman" in the Gita (II. 72).

May the blows you have received draw you closer to that Being Who is the only one to be loved here and hereafter, so that you may realise Him in everything past, present and future, and find everything present or lost in Him and Him alone. Amen!

Yours affectionately,
VIVEKANANDA.

XVIII

BOMBAY,
23rd May, 1893.

DEAR BALAJI,[1]

"Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither; the Lord gave and the Lord hath taken away; blessed be the name of the Lord." Thus said the old Jewish saint when suffering the greatest

[1] D. R Balaji Rao who had a domestic affliction.

calamities that could befall man, and he erred not. Herein lies the whole secret of Existence. Waves may roll over the surface and tempest rage, but deep down there is the stratum of infinite calmness, infinite peace, and infinite bliss. "Blessed are they that mourn, for they shall be comforted." And why? Because it is during these moments of visitations when the heart is wrung by hands which never stop for the father's cries or the mother's wail, when under the load of sorrow, dejection, and despair, the world seems to be cut off from under our feet, and when the whole horizon seems to be nothing but an impenetrable sheet of misery and utter despair—that the internal eyes open, light flashes all on a sudden, the dream vanishes, and intuitively we come face to face with the grandest mystery in nature—Existence. Yes, then it is—when the load would be sufficient to sink a lot of frail vessels—that the man of genius, of strength, the hero, sees that infinite absolute, ever-blissful Existence *per se*, that infinite Being who is called and worshipped under different names, in different climes. Then it is, the shackles that bind the soul down to this hole of misery break, as it were, for a time, and unfettered it rises and rises until it reaches the throne of the Lord, "Where the wicked cease from troubling and the weary are at rest." Cease not, brother, to send up petitions day and night, cease not to say day and night—THY WILL BE DONE.

> "Ours not to question why,
> Ours but to do and die."

Blessed be Thy name, O Lord! And, Thy will be done. Lord, we know that we are to submit; Lord, we know that it is the Mother's hand that is striking, and "The spirit is willing but the flesh is weak." There is,

Father of Love, an agony at the heart which is fighting against that calm resignation which Thou teachest. Give us strength, O Thou who sawest Thy whole family destroyed before Thine eyes, with Thine hands crossed on Thy breast. Come, Lord, Thou Great Teacher, who hast taught us that the soldier is only to obey and speak not. Come, Lord, come Arjuna's Charioteer, and teach me as Thou once taughtest him, that resignation in *Thyself* is the highest end and aim of this life, so that with those great ones of old, I may also firmly and resignedly cry, Om Shri Krishnârpanamastu (let it all be dedicated to Shri Krishna).

May the Lord send you peace is the prayer day and night of

VIVEKANANDA.

XIX

YOKOHAMA,
10th July, 1893.

DEAR ALASINGA[1], BALAJI[2], G. G.[3], BANKING CORPORATION, AND ALL MY MADRAS FRIENDS,

Excuse my not keeping you constantly informed of my movements. One is so busy every day, and especially myself who am quite new to the life of possessing things and taking care of them. That consumes so much of my energy. It is really an awful botheration.

From Bombay we reached Colombo. Our steamer remained in port for nearly the whole day, and we took the opportunity of getting off to have a look at the town. We drove through the streets and the only thing I remem-

[1] Alasinga Perumel, a disciple of Swami Vivekananda.
[2] D. R Balaji Rao, a disciple of Swamiji.
[3] G. G Narasimhachariar, a disciple of Swamiji.

ber was a temple in which was a very gigantic Murti (image) of the Lord Buddha in a reclining posture, entering Nirvâna. . . .

The next station was Penang, which is only a strip of land along the sea in the body of the Malaya Peninsula. The Malayas are all Mohammedans, and in old days were noted pirates and quite a dread to merchantmen. But now the leviathan guns of modern turreted battleships have forced the Malayas to look about for more peaceful pursuits. On our way from Penang to Singapore, we had glimpses of Sumatra with its high mountains, and the Captain pointed out to me several places as the favourite haunts of pirates in days gone by. Singapore is the capital of the Straits Settlements. It has a fine botanical garden with the most splendid collection of palms. The beautiful fan-like palm called the traveller's palm, grows here in abundance, and the bread-fruit tree everywhere. The celebrated mangosteen is as plentiful here as mangoes in Madras, but mango is nonpareil. The people here are not half so dark as the people of Madras, although so near the line. Singapore possesses a fine museum too.

Hong Kong next. You feel that you have reached China, the Chinese element predominates so much. All labour, all trade seems to be in their hands. And Hong Kong is real China. As soon as the steamer casts anchor, you are besieged with hundreds of Chinese boats to carry you to the land. These boats with two helms are rather peculiar. The boatman lives in the boat with his family. Almost always, the wife is at the helms, managing one with her hands and the other with one of her feet. And in ninety per cent of cases, you find a baby tied to her back, with the hands and feet of the little Chin left free. It is a quaint sight to see the little John Chinaman dangling very quietly from his mother's back, whilst she is now setting with might and main, now pushing heavy

loads, or jumping with wonderful agility from boat to boat. And there is such a rush of boats and steam-launches coming in and going out. Baby John is every moment put into the risk of having his little head pulverised, pigtail and all; but he does not care a fig. This busy life seems to have no charm for him, and he is quite content to learn the anatomy of a bit of rice-cake given to him from time to time by the madly busy mother. The Chinese child is quite a philosopher and calmly goes to work at an age when your Indian boy can hardly crawl on all fours. He has learned the philosophy of necessity too well. Their extreme poverty is one of the causes why the Chinese and the Indians have remained in a state of mummified civilisation. To an ordinary Hindu or Chinese, everyday necessity is too hideous to allow him to think of anything else.

Hong Kong is a very beautiful town. It is built on the slopes of hills and on the tops too, which are much cooler than the city. There is an almost perpendicular tramway going to the top of the hill, dragged by wire-rope and steam-power

We remained three days at Hong Kong and went to see Canton, which is eighty miles up a river. The river is broad enough to allow the biggest steamers to pass through. A number of Chinese steamers ply between Hong Kong and Canton. We took passage on one of these in the evening and reached Canton early in the morning. What a scene of bustle and life! What an immense number of boats almost covering the waters! And not only those that are carrying on the trade, but hundreds of others which serve as houses to live in. And quite a lot of them so nice and big. In fact, they are big houses two or three storeys high, with verandahs running round and streets between, and all floating!

We landed on a strip of ground given by the Chinese

Government to foreigners to live in. Around us on both sides of the river for miles and miles is the big city—a wilderness of human beings, pushing, struggling, surging, roaring. But with all its population, all its activity, it is the dirtiest town I saw, not in the sense in which a town is called dirty in India, for as to that not a speck of filth is allowed by the Chinese to go waste; but because of the Chinaman, who has, it seems, taken a vow never to bathe! Every house is a shop, people living only on the top-floor. The streets are very very narrow, so that you almost touch the shops on both sides as you pass. At every ten paces you find meat-stalls, and there are shops which sell cat's and dog's meat. Of course, only the poorest classes of Chinamen eat dog or cat.

The Chinese ladies can never be seen. They have got as strict a zenana as the Hindus of Northern India; only the women of the labouring classes can be seen. Even amongst these, one sees now and then a woman with feet smaller than those of your youngest child, and of course they cannot be said to walk, but hobble.

I went to see several Chinese temples. The biggest in Canton is dedicated to the memory of the first Buddhistic Emperor and the five hundred first disciples of Buddhism. The central figure is of course Buddha, and next beneath Him is seated the Emperor, and ranging on both sides are the statues of the disciples, all beautifully carved out of wood.

From Canton I returned back to Hong Kong, and from thence to Japan. The first port we touched was Nagasaki. We landed for a few hours and drove through the town. What a contrast! The Japanese are one of the cleanliest peoples on earth. Everything is neat and tidy. Their streets are nearly all broad, straight, and regularly paved. Their little houses are cage-like, and their pine-covered evergreen little hills form the background of

almost every town and village. The short-statured, fair-skinned, quaintly-dressed Japs, their movements, attitudes, gestures, everything is picturesque. Japan is the land of the picturesque! Almost every house has a garden at the back, very nicely laid out according to Japanese fashion with small shrubs, grass-plots, small artificial waters, and small stone bridges

From Nagasaki to Kobe. Here I gave up the steamer and took the land-route to Yokohama, with a view to seeing the interior of Japan.

I have seen three big cities in the interior—Osaka, a great manufacturing town, Kyoto, the former capital, and Tokyo, the present capital. Tokyo is nearly twice the size of Calcutta with nearly double the population.

No foreigner is allowed to travel in the interior without a passport.

The Japanese seem now to have fully awakened themselves to the necessity of the present times. They have now a thoroughly organised army equipped with guns, which one of their own officers has invented, and which is said to be second to none. Then, they are continually increasing their navy. I have seen a tunnel nearly a mile long, bored by a Japanese engineer.

The match factories are simply a sight to see, and they are bent upon making everything they want in their own country. There is a Japanese line of steamers plying between China and Japan, which shortly intends running between Bombay and Yokohama.

I saw quite a lot of temples. In every temple there are some Sanskrit Mantras written in Old Bengali characters. Only a few of the priests know Sanskrit. But they are an intelligent sect. The modern rage for progress has penetrated even the priesthood. I cannot write what I have in my mind about the Japs in one short letter. Only I want that numbers of our young men

should pay a visit to Japan and China every year. Especially to the Japanese, India is still the dreamland of everything high and good. And you, what are you? ... talking twaddle all your lives, vain talkers, what are you? Come, see these people, and then go and hide your faces in shame. A race of dotards, you lose your caste if you come out! Sitting down these hundreds of years with an ever-increasing load of crystallised superstition on your heads, for hundreds of years spending all your energy upon discussing the touchableness or untouchableness of this food or that, with all humanity crushed out of you by the continuous social tyranny of ages—what are you? And what are you doing now? ... promenading the sea-shores with books in your hands—repeating undigested stray bits of European brainwork, and the whole soul bent upon getting a thirty-rupee clerkship, or at best becoming a lawyer—the height of young India's ambition—and every student with a whole brood of hungry children cackling at his heels and asking for bread! Is there not water enough in the sea to drown you, books, gowns, university diplomas, and all?

Come, be men! Kick out the priests who are always against progress, because they would never mend, their hearts would never become big. They are the offspring of centuries of superstition and tyranny. Root out priestcraft first. Come, be men! Come out of your narrow holes and have a look abroad. See how nations are on the march! Do you love man? Do you love your country? Then come, let us struggle for higher and better things; look not back, no, not even if you see the dearest and nearest cry. Look not back, but forward!

India wants the sacrifice of at least a thousand of her young men—men, mind, and not brutes. The English Government has been the instrument, brought over here by the Lord, to break your crystallised civilisation, and

Madras supplied the first men who helped in giving the English a footing. How many men, unselfish, thorough-going men, is Madras ready now to supply, to struggle unto life and death to bring about a new state of things—sympathy for the poor—and bread to their hungry mouths—enlightenment to the people at large—and struggle unto death to make men of them who have been brought to the level of beasts, by the tyranny of your forefathers?

Yours etc.,
VIVEKANANDA.

PS. Calm and silent and steady work, and no newspaper humbug, no name-making, you must always remember.

V.

XX

BREEZY MEADOWS,
METCALF, MASS.,
20th August, 1893.

DEAR ALASINGA,

Received your letter yesterday. Perhaps you have by this time got my letter from Japan. From Japan I reached Vancouver. The way was by the Northern Pacific. It was very cold and I suffered much for want of warm clothing. However, I reached Vancouver anyhow, and thence went through Canada to Chicago. I remained about twelve days in Chicago. And almost every day I used to go to the Fair. It is a tremendous affair. One must take at least ten days to go through it. The lady to whom Varada Rao introduced me, and her

husband, belong to the highest Chicago society, and they were so very kind to me. I took my departure from Chicago and came to Boston. Mr. Lâlubhâi was with me up to Boston. He was very kind to me. . . .

The expense I am bound to run into here is awful. You remember, you gave me £178 in notes and £9 in cash. It has come down to £130 in all!! On an average it costs me £1 every day, a cigar costs eight annas of our money. The Americans are so rich that they spend money like water, and by forced legislation keep up the price of everything so high that no other nation on earth can approach it. Every common coolie earns nine or ten rupees a day, and spends it. All those rosy ideas we had before starting have melted, and I have now to fight against impossibilities. A hundred times I had a mind to go out of the country and go back to India. But I am determined, and I have a call from Above. I see no way, but His eyes see. And I must stick to my guns, life or death.

Just now I am living as the guest of an old lady in a village near Boston. I accidentally made her acquaintance in the railway train, and she invited me to come over and live with her. I have an advantage in living with her, in saving for some time my expenditure of £1 per day, and she has the advantage of inviting her friends over here, and showing them a curio from India! And all this must be borne. Starvation, cold, hooting in the streets on account of my quaint dress, these are what I have to fight against. But, my dear boy, no great things were ever done without great labour.

. Know, then, that this is the land of Christians, and any other influence than that is almost zero. Nor do I care a bit for the enmity of any——ists in the world. I am here amongst the children of the Son of Mary, and the Lord Jesus will help me. They like much the broad

views of Hinduism and my love for the Prophet of Nazareth. I tell them that I preach nothing against the Great One of Galilee. I only ask the Christians to take in the Great Ones of Ind along with the Lord Jesus, and they appreciate it.

Winter is approaching and I shall have to get all sorts of warm clothing, and we require more warm clothing than the natives. Look sharp, my boy, take courage. We are destined by the Lord to do great things in India. Have faith. We will do. We, the poor and the despised, who really feel, and not those. . . .

In Chicago, the other day, a funny thing happened. The Raja of Kapurthala was here, and he was being lionised by some portion of Chicago society. I once met the Raja in the Fair grounds, but he was too big to speak with a poor fakir. There was an eccentric Mahratta Brâhmin selling nail-made pictures in the Fair, dressed in a dhoti. This fellow told the reporters all sorts of things against the Raja——, that he was a man of low caste, that those Rajas were nothing but slaves, and that they generally led immoral lives, etc., etc. And these truthful (?) editors for which America is famous, wanted to give to the boy's stories some weight, and so the next day they wrote huge columns in their papers about the description of a man of wisdom from India, meaning me —extolling me to the skies, and putting all sorts of words in my mouth, which I never even dreamt of, and ascribing to me all those remarks made by the Mahratta Brahmin about the Raja of Kapurthala. And it was such a good brushing that Chicago society gave up the Raja in hot haste. . . . These newspaper editors made capital out of me to give my countryman a brushing. That shows, however, that in this country intellect carries more weight than all the pomp of money and title.

Yesterday Mrs. Johnson, the lady superintendent of

the women's prison, was here. They don't call it prison but reformatory here. It is the grandest thing I have seen in America. How the inmates are benevolently treated, how they are reformed and sent back as useful members of society; how grand, how beautiful, you must see to believe! And, oh, how my heart ached to think of what we think of the poor, the low, in India. They have no chance, no escape, no way to climb up. The poor, the low, the sinner in India have no friends, no help—they cannot rise, try however they may. They sink lower and lower every day, they feel the blows showered upon them by a cruel society, and they do not know whence the blow comes. They have forgotten that they too are men. And the result is slavery. Thoughtful people within the last few years have seen it, but unfortunately laid it at the door of the Hindu religion, and to them, the only way of bettering is by crushing this grandest religion of the world. Hear me, my friend, I have discovered the secret through the grace of the Lord. Religion is not in fault. On the other hand, your religion teaches you that every being is only your own self multiplied. But it was the want of practical application, the want of sympathy—the want of heart. The Lord once more came to you as Buddha and taught you how to feel, how to sympathise with the poor, the miserable, the sinner, but you heard Him not. Your priests invented the horrible story that the Lord was here for deluding demons with false doctrines! True indeed, but we are the demons, not those that believed. And just as the Jews denied the Lord Jesus and are since that day wandering over the world as homeless beggars, tyrannised over by everybody, so you are bond-slaves to any nation that thinks it worth while to rule over you. Ah, tyrants! you do not know that the obverse is tyranny, and the reverse slavery. The slave and the tyrant are synonymous.

Balâji and G. G. may remember one evening at Pondicherry—we were discussing the matter of sea-voyage with a Pandit, and I shall always remember his brutal gestures and his Kadâpi Na (never)! They do not know that India is a very small part of the world, and the whole world looks down with contempt upon the three hundred millions of earthworms crawling upon the fair soil of India and trying to oppress each other. This state of things must be removed, not by destroying religion but by following the great teachings of the Hindu faith, and joining with it the wonderful sympathy of that logical development of Hinduism—Buddhism.

A hundred thousand men and women, fired with the zeal of holiness, fortified with eternal faith in the Lord, and nerved to lion's courage by their sympathy for the poor and the fallen and the downtrodden, will go over the length and breadth of the land, preaching the gospel of salvation, the gospel of help, the gospel of social raising-up—the gospel of equality.

No religion on earth preaches the dignity of humanity in such a lofty strain as Hinduism, and no religion on earth treads upon the necks of the poor and the low in such a fashion as Hinduism. The Lord has shown me that religion is not in fault, but it is the Pharisees and Sadducees in Hinduism, hypocrites, who invent all sorts of engines of tyranny in the shape of doctrines of Pâramârthika and Vyâvahârika.

Despair not; remember the Lord says in the Gita, "To work you have the right, but not to the result." Gird up your loins, my boy. I am called by the Lord for this. I have been dragged through a whole life full of crosses and tortures, I have seen the nearest and dearest die, almost of starvation; I have been ridiculed, distrusted, and have suffered for my sympathy for the very men who scoff and scorn. Well, my boy, this is the

school of misery, which is also the school for great souls and prophets for the cultivation of sympathy, of patience, and, above all, of an indomitable iron will which quakes not even if the universe be pulverised at our feet. I pity them. It is not their fault. They are children, yea, veritable children, though they be great and high in society. Their eyes see nothing beyond their little horizon of a few yards—the routine-work, eating, drinking, earning, and begetting, following each other in mathematical precision. They know nothing beyond, happy little souls! Their sleep is never disturbed. Their nice little brown studies of lives never rudely shocked by the wail of woe, of misery, of degradation, and poverty, that has filled the Indian atmosphere—the result of centuries of oppression. They little dream of the ages of tyranny, mental, moral, and physical, that has reduced the image of God to a mere beast of burden; the emblem of the Divine Mother, to a slave to bear children; and life itself, a curse. But there are others who see, feel, and shed tears of blood in their hearts, who think that there is a remedy for it, and who are ready to apply this remedy at any cost, even to the giving up of life. And "Of such is the kingdom of Heaven." Is it not then natural, my friends, that they have no time to look down from their heights to the vagaries of these contemptible little insects, ready every moment to spit their little venoms?

Trust not to the so-called rich, they are more dead than alive. The hope lies in you—in the meek, the lowly, but the faithful. Have faith in the Lord; no policy, it is nothing. Feel for the miserable and look up for help—it *shall come.* I have travelled twelve years with this load in my heart and this idea in my head. I have gone from door to door of the so-called rich and great. With a bleeding heart I have crossed half the

world to this strange land, seeking for help. The Lord is great. I know He will help me. I may perish of cold or hunger in this land, but I bequeath to you, young men, this sympathy, this struggle for the poor, the ignorant, the oppressed. Go now this minute to the temple of Pârthasârathi,[1] and before Him who was friend to the poor and lowly cowherds of Gokula, who never shrank to embrace the Pariah Guhaka, who accepted the invitation of a prostitute in preference to that of the nobles and saved her in His incarnation as Buddha —yea, down on your faces before Him, and make a great sacrifice, the sacrifice of a whole life for them, for whom He comes from time to time, whom He loves above all, the poor, the lowly, the oppressed. Vow, then, to devote your whole lives to the cause of the redemption of these three hundred millions, going down and down every day.

It is not the work of a day, and the path is full of the most deadly thorns. But Parthasarathi is ready to be our Sârathi, we know that, and in His name and with eternal faith in Him, set fire to the mountain of misery that has been heaped upon India for ages—and it shall be burned down. Come then, look it in the face, brethren, it is a grand task, and we are so low. But we are the sons of Light and children of God. Glory unto the Lord, we will succeed. Hundreds will fall in the struggle, hundreds will be ready to take it up. I may die here unsuccessful, another will take up the task. You know the disease, you know the remedy, only have faith. Do not look up to the so-called rich and great; do not care for the heartless intellectual writers, and their cold-blooded newspaper articles. Faith, sympathy—fiery faith and fiery sympathy! Life is nothing, death is nothing, hunger

[1] Shri Krishna as Sârathi or charioteer, of Pârtha or Arjuna.

nothing, cold nothing. Glory unto the Lord—march on, the Lord is our General. Do not look back to see who falls—forward—onward! Thus and thus we shall go on, brethren. One falls, and another takes up the work.

From this village I am going to Boston tomorrow. I am going to speak at a big Ladies' Club here, which is helping Ramâbâi. I must first go and buy some clothing in Boston. If I am to live longer here, my quaint dress will not do. People gather by hundreds in the streets to see me. So what I want is to dress myself in a long black coat, and keep a red robe and turban to wear when I lecture. This is what the ladies advise me to do, and they are the rulers here, and I must have their sympathy. Before you get this letter my money would come down to somewhat about £70 or £60. So try your best to send some money. It is necessary to remain here for some time to have any influence here. I could not see the phonograph for Mr. Bhattacharya as I got his letter here. If I go to Chicago again I will look for them. I do not know whether I shall go back to Chicago or not. My friends there write me to represent India. And the gentleman, to whom Varada Rao introduced me, is one of the directors of the Fair; but then I refused as I would have to spend all my little stock of money in remaining more than a month in Chicago.

In America, there are no classes in the railway except in Canada. So I have to travel first-class, as that is the only class; but I do not venture in the Pullmans. They are very comfortable—you sleep, eat, drink, even bathe in them, just as if you were in a hotel—but they are too expensive.

It is very hard work getting into society and making yourself heard. Now nobody is in the towns, they are all away in summer places. They will all come back in

winter. Therefore I must wait. After such a struggle I am not going to give up easily. Only try your best to help me as much as you can; and even if you cannot, I must try to the end. And even if I die of cold or disease or hunger here, you take up the task. Holiness, sincerity, and faith. I have left instructions with Cooks to forward any letter or money to me wherever I am. Rome was not built in a day. If you can keep me here for six months at least, I hope everything will come right. In the meantime I am trying my best to find any plank I can float upon. And if I find out any means to support myself, I shall wire to you immediately.

First I will try in America; and if I fail, try in England; if I fail, go back to India and wait for further commands from High. Ramdas's father has gone to England. He is in a hurry to go home. He is a very good man at heart, only the Baniya roughness on the surface. It would take more than twenty days for the letter to reach. Even now it is so cold in New England that every day we have fires night and morning. Canada is still colder. I never saw snow on such low hills as there.

Gradually I can make my way; but that means a longer residence in this horribly expensive country. Just now the raising of the Rupee in India has created a panic in this country, and lots of mills have been stopped. So I cannot hope for anything just now, but I must wait.

Just now I have been to the tailor and ordered some winter clothings, and that would cost at least Rs. 300 and up. And still it would not be good clothes, only decent. Ladies here are very particular about a man's dress, and they are the power in this country. They . . . never fail the missionaries. They are helping our Ramabai every year. If you fail in keeping me here, send some money to get me out of the country. In the meantime if

anything turns out in my favour, I will write or wire. A word costs Rs. 4 in cable ! !

Yours,
VIVEKANANDA.

XXI

Saturday, SALEM
Sept. 4, 1893.

Dear Adhyapakji[1] (honourable professor),

I hasten to tender my heartfelt gratitude to you for your letters of introduction. I have received a letter from Mr. Theles of Chicago giving me the names of some of the delegates and other things about the Congress.

Your professor of Sanskrit in his note to Miss Sanborn mistakes me for Purushottama Joshi and states that there is a Sanskrit library in Boston the like of which can scarcely be met with in India. I would be so happy to see it.

Mr. Sanborn has written to me to come over to Saratoga on Monday and I am going accordingly. I would stop then at a boarding house called Sanatorium. If any news come from Chicago in the meanwhile I hope you will kindly send it over to the Sanatorium, Saratoga.

You and your noble wife and sweet children have made an impression in my brain which is simply indelible, and I thought myself so much near to heaven when living with you. May He, the giver of all gifts, shower on your head His choicest blessings.

Here are a few lines written as an attempt at poetry. Hoping your love will pardon this infliction,

Ever your friend,
VIVEKANANDA,

[1] Prof. J. H. Wright of Boston who introduced Swami Vivekananda to the Parliament of Religions.

O'r Hill and dale and mountain range,
In temple, church, and mosque,
In Vedas, Bible, Al Koran
I had searched for Thee in vain.
Like a child in the wildest forest lost
I have cried and cried alone,
"Where art Thou gone, my God, my love?"
The echo answered, "gone".

And days and nights and years then passed
A fire was in the brain;
I knew not when day changed in night
The heart seemed rent in twain.
I laid me down on Gangâ's shore,
Exposed to sun and rain;
With burning tears I laid the dust
And wailed with waters' roar.

I called on all the holy names
Of every clime and creed,
"Show me the way, in mercy, ye
Great ones who have reached the goal."

Years then passed in bitter cry,
Each moment seemed an age,
Till one day midst my cries and groans
Some one seemed calling me.

A gentle soft and soothing voice
That said "my son", "my son",
That seemed to thrill in unison
With all the chords of my soul.

I stood on my feet and tried to find
The place the voice came from;
I searched and searched and turned to see
Round me, before, behind.

Again, again it seemed to speak
The voice divine to me.
In rapture all my soul was hushed,
Entranced, enthralled in bliss.

A flash illumined all my soul;
The heart of my heart opened wide.
O joy, O bliss, what do I find!
My love my love you are here
And you are here, my love, my all!

And I was searching thee
From all eternity you were there
Enthroned in majesty!

From that day forth, where ere I roam,
I feel Him standing by
O'er hill and dale, high mount and vale,
Far far away and high.

The moon's soft light, the stars so bright,
The glorious orb of day,
He shines in them; His beauty—might—
Reflected lights are they.
The majestic morn, the melting eve,
The boundless billowy sea,
In nature's beauty, songs of birds,
I see through them—it is He.

When dire calamity seizes me,
The heart seems weak and faint,
All nature seems to crush me down,
With laws that never bend.

Meseems I hear Thee whispering sweet
My love, "I am near" "I am near."
My heart gets strong. With thee, my love,
A thousand deaths no fear.
Thou speakest in the mother's lay
That shuts the babies eye;
When innocent children laugh and play
I see Thee standing by.

When holy friendship shakes the hand,
He stands between them too;
He pours the nectar in mother's kiss
And the babies sweet "mama".
Thou wert my God with prophets old;
All creeds do come from Thee;
The Vedas, Bible, and Koran bold
Sing Thee in harmony.

"Thou art", "Thou art" the Soul of souls
In the rushing stream of life.
"Om tat Sat om."[1] Thou art my God.
My love, I am thine, I am thine.

XXII

CHICAGO,
2nd October, '93.

Dear Adhyapakji,

I do not know what you are thinking of my long silence. In the first place I dropped in on the Congress in the eleventh hour, and quite unprepared; and that kept me very very busy for some time. Secondly, I was speaking almost every day in the Congress and had no

[1] Tat Sat means that only real existence. [Swamiji's note].

time to write; and last and greatest of all—my kind friend, I owe so much to you that it would have been an insult to your *ahetuka* (unselfish) friendship to have written you business-like letters in a hurry. The Congress is now over.

Dear brother, I was so so afraid to stand before that great assembly of fine speakers and thinkers from all over the world and speak; but the Lord gave me strength, and I almost every day heroically (?) faced the platform and the audience. If I have done well, He gave me the strength for it; if I have miserably failed—I knew that beforehand—for I am hopelessly ignorant.

Your friend prof. Bradley was very kind to me and he always cheered me on. And oh! everybody is so kind here to me who am nothing—that it is beyond my power of expression. Glory unto Him in the highest in whose sight the poor ignorant monk from India is the same as the learned divines of this mighty land. And how the Lord is helping me every day of my life brother—I sometimes wish for a life of million million ages to serve Him through the work, dressed in rags and fed by charity.

Oh, how I wished that you were here to see some of our sweet ones from India—the tender-hearted Buddhist Dhammapala, the orator Mazoomdar—and realize that in that far-off and poor India there are hearts that beat in sympathy to yours, born and brought up in this mighty and great country.

My eternal respects to your holy wife; and to your sweet children my eternal love and blessings.

Col. Higginson, a very broad man, told me that your daughter had written to his daughter about me; and he was very sympathetic to me. I am going to Evanston tomorrow and hope to see prof. Bradley there.

May He make us all more and more pure and holy so

that we may live a perfect spiritual life even before throwing off this earthly body.

VIVEKANANDA.

[The letter continues on a separate sheet of paper :]

I am now going to be reconciled to my life here. All my life I have been taking every circumstance as coming from Him and calmly adapt myself to it. At first in America I was almost out of my water. I was afraid I would have to give up the accustomed way of being guided by the Lord and *cater* for myself——and what a horrid piece of mischief and ingratitude was that. I now clearly see that He who was guiding me on the snow tops of the Himalayas and the burning plains of India is here to help me and guide me. *Glory unto Him* in the highest. So I have calmly fallen in my old ways. Somebody or other gives me a shelter and food, somebody or other comes to ask me to speak about Him, and I know He sends them and mine is to obey. And then He is supplying my necessities, and His *will be done*!

"He who rests [in] Me and gives up all other self-assertion and struggles I carry to him whatever he needs" (Gitâ).

So it is in Asia. So in Europe. So in America. So in the deserts of India. So in the rush of business in America. For is He not here also? And if He does not, I only would take for granted that He wants that I should lay aside this three minutes' body of clay—and hope to lay it down gladly—

We may or may not meet brother. He knows. You are great, learned, and holy. I dare not preach to you or your wife; but to your children I quote these passages from the Vedas—

"The four Vedas, sciences, languages, philosophy, and

all other learnings are only ornamental. The real learning, the true knowledge, is that which enables us to reach Him who is unchangeable in His love."

"How real, how tangible, how visible is He through whom the skin touches, the eyes see, and the world gets its reality!"

"Hearing Him nothing remains to be heard,
Seeing Him nothing remains to be seen,
Attaining Him nothing remains to be attained."
"He is the eye of our eyes the ear of our ears the
Soul of our souls."

He is nearer to you, my dears, than even your father and mother. You are innocent and pure as flowers. Remain so, and He will reveal Himself unto you. Dear Austin, when you are playing, there is another playmate playing with you who loves you more than anybody else; and Oh, He is so full of fun. He is always playing—sometimes with great big balls which we call the sun and earth, sometimes with little children like you and laughing and playing with you.

How funny it would be to see Him and play with Him! My dear, think of it.

Dear Adhyapakji, I am moving about just now. Only when I come to Chicago, I always go to see Mr. and Mrs. Lyon, one of the noblest couples I have seen here. If you would be kind enough to write to me, kindly address it to the care of Mr. John B. Lyon, 262 Michigan Ave., Chicago.

"He who gets hold of the One in this world of many—the one constant existence in a world of flitting shadows—the one life in a world of death—he alone crosses this sea of misery and struggle. None else none else" (Vedas).

"He who is the Brahman of the Vedântins, Ishvara of the Naiyâyikas, Purusha of the Sânkhyas, *cause* of the Mimâmsakas, *law* of the Buddhists, *absolute zero* of the

Atheists, and love infinite unto those that love, may [He] take us all under His merciful protection" Udayanâchârya —a great philosopher of the Nyâya or Dualistic school. And this is the Benediction pronounced at the very beginning of his wonderful book *Kusumânjali* (A handful of flowers) in which He attempts to establish the existence of a personal creator and moral ruler of infinite love independently of revelation.

Yours ever grateful friend,
VIVEKANANDA

XXIII

c/o. J. Lyon,
262 MICHIGAN AVENUE, CHICAGO,
26 October, '93.

Dear Adhyapakji,

You would be glad to know that I am doing well here and that almost everybody has been very kind to me, except of course the very orthodox. Many of the men brought together here from far-off lands have got projects and ideas and missions to carry out, and America is the only place where there is a chance of success for everything. But I thought better and have given up speaking about my project entirely—because I am sure now—the heathen draws more than his project. So I want to go to work earnestly for my own project only keeping the project in the background and working like any other lecturer.

He who has brought me hither and has not left me yet will not leave me ever I am here. You will be glad to know that I am doing well and expect to do very well in the way of getting money. Of course I am too green

in the business but would soon learn my tradė. I am very popular in Chicago. So I want to stay here a little more and get *money*.

Tomorrow I am going to lecture on Buddhism at the ladies' fortnightly club—which is the most influential in this city. How to thank you my kind friend or Him who brought you to me—for now I think the success of my project probable, and it is you who have made it so.

May blessings and happiness attend every step of your progress in this world.

My love and blessings to your children.

Yours affly ever,
VIVEKANANDA

XXIV

CHICAGO,
2nd November, 1893.

DEAR ALASINGA,

I am so sorry that a moment's weakness on my part should cause you so much trouble; I was out of pocket at that time. Since then the Lord sent me friends. At a village near Boston I made the acquaintance of Dr. Wright, Professor of Greek in the Harvard University. He sympathised with me very much and urged upon me the necessity of going to the Parliament of Religions, which he thought would give me an introduction to the nation. As I was not acquainted with anybody, the Professor undertook to arrange everything for me, and eventually I came back to Chicago. Here I, together with the oriental and occidental delegates to the Parliament of Religions, were all lodged in the house of a gentleman.

On the morning of the opening of the Parliament, we

all assembled in a building called the Art Palace, where one huge, and other smaller temporary halls were erected for the sittings of the Parliament. Men from all nations were there. From India were Mazoomdar of the Brâhmo Samâj, and Nagarkar of Bombay, Mr. Gandhi representing the Jains, and Mr. Chakravarti representing Theosophy with Mrs. Annie Besant. Of these, Mazoomdar and I were, of course, old friends, and Chakravarti knew me by name. There was a grand procession, and we were all marshalled on to the platform. Imagine a hall below and a huge gallery above, packed with six or seven thousand men and women representing the best culture of the country, and on the platform learned men of all the nations of the earth. And I, who never spoke in public in my life, to address this august assemblage!! It was opened in great form with music and ceremony and speeches; then the delegates were introduced one by one, and they stepped up and spoke. Of course my heart was fluttering and my tongue nearly dried up; I was so nervous, and could not venture to speak in the morning. Mazoomdar made a nice speech, Chakravarti a nicer one, and they were much applauded. They were all prepared and came with ready-made speeches. I was a fool and had none, but bowed down to Devi Sarasvati and stepped up, and Dr. Barrows introduced me. I made a short speech. I addressed the assembly as "Sisters and Brothers of America", a deafening applause of two minutes followed, and then I proceeded; and when it was finished I sat down, almost exhausted with emotion. The next day all the papers announced that my speech was the hit of the day, and I became known to the whole of America. Truly has it been said by the great commentator Shridhara—मूकं करोति वाचालं—"Who maketh the dumb a fluent speaker" His name be praised! From that day I became a celebrity, and the day I read my

paper on Hinduism, the hall was packed as it had never been before. I quote to you from one of the papers: "Ladies, ladies, ladies packing every place—filling every corner, they patiently waited and waited while the papers that separated them from Vivekananda were read," etc. You would be astonished if I sent over to you the newspaper cuttings, but you already know that I am a hater of celebrity. Suffice it to say, that whenever I went on the platform a deafening applause would be raised for me. Nearly all the papers paid high tributes to me, and even the most bigoted had to admit that "This man with his handsome face and magnetic presence and wonderful oratory is the most prominent figure in the Parliament," etc., etc. Sufficient for you to know that never before did an Oriental make such an impression on American society.

And how to speak of their kindness? I have no more wants now, I am well off, and all the money that I require to visit Europe I shall get from here. . . . A boy called Narasimhâchârya has cropped up in our midst. He has been loafing about the city for the last three years. Loafing or no loafing, I like him; but please write to me all about him, if you know anything. He knows you. He came in the year of the Paris Exhibition to Europe. . . .

I am now out of want. Many of the handsomest houses in this city are open to me. All the time I am living as a guest of somebody or other. There is a curiosity in this nation, such as you meet with nowhere else. They want to know everything, and their women—they are the most advanced in the world. The average American woman is far more cultivated than the average American man. The men slave all their life for money, and the women snatch every opportunity to improve themselves. And they are a very kind-hearted, frank

প্রথম অধ্যায়

জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গ

অতি প্রাচীনকাল হইতে পরমার্থনিষ্ঠ আর্য্যসমাজে মুমুক্ষু-গণের মোক্ষলাভের জন্য দ্বিবিধ অন্তরঙ্গ সাধনমার্গ প্রচলিত আছে। একটির নাম জ্ঞানমার্গ, অপরটির নাম যোগমার্গ। বৈদিকযুগ হইতেই যাঁহারা বৈদিক সকাম কর্ম্মকাণ্ডে অতৃপ্তি বোধ কবিতেন, তাঁহারা সংসারবিরাগী হইয়া জ্ঞান ও যোগের অনুশীলন করিতেন। কেহ কেহ জ্ঞানমার্গকে শ্রেষ্ঠ বলিতেন। কেহ কেহ যোগের প্রাধান্য খ্যাপন করিতেন। স্ব-স্ব মতের শ্রেষ্ঠতা-প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে তর্ক-বিতর্কও হইত। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিতেছেন—

সাংখ্যাঃ সাংখ্যং প্রশংসন্তি যোগা যোগং দ্বিজাতয়ঃ।
বদন্তি কারণং শ্রেষ্ঠং স্বপক্ষোদ্ভাবনায় বৈ॥

সাংখ্যমতাবলম্বী দ্বিজাতিগণ সাংখ্যমার্গের (জ্ঞানমার্গের) এবং যোগমতাবলম্বিগণ যোগমার্গের প্রশংসা করেন। নিজ-নিজ পক্ষের উৎকর্ষ-খ্যাপনের জন্য তাঁহারা শ্রেষ্ঠ যুক্তিসকল প্রদর্শন করিয়া থাকেন। জ্ঞানমার্গে তত্ত্ববিচারই মোক্ষের প্রকৃষ্ট সাধন। শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে যাবতীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম, ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়ের অনিত্যত্ব, অশুচিত্ব, দুঃখকরত্ব,

মোহজনকত্ব প্রভৃতি দোষ এবং আত্মার নিত্যত্ব, অসঙ্গত্ব, নিষ্ক্রিয়ত্ব, সুখদুঃখাদিবিহীনত্ব, কার্য্যকারণাতীতত্ব, সত্যজ্ঞানানন্ত-স্বরূপত্ব প্রভৃতি গুণ পর্য্যালোচনা করিয়া বিষয়সম্পর্ক বর্জ্জন-পূর্ব্বক চিত্তকে আত্মস্বরূপে বা ব্রহ্মস্বরূপে সমাহিত করিবার ঐকান্তিক চেষ্টাই জ্ঞানমার্গাবলম্বীদের মোক্ষলাভের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। যোগিগণ বলিয়া থাকেন যে, কেবলমাত্র বিচার দ্বারা বৈরাগ্যেরও প্রতিষ্ঠা হয় না, পরমতত্ত্বে স্থিতিলাভও হয় না। যতদিন পর্য্যন্ত অনিয়মিতভাবে প্রাণের স্পন্দন চলিতে থাকে, দেহ ও ইন্দ্রিয়সকল অস্থির থাকে এবং অন্তঃকরণের বৃত্তিসকল তরঙ্গ তুলিতে থাকে—যতদিন ইচ্ছাশক্তিপ্রভাবে প্রাণকে আয়ত্ত, দেহ ও ইন্দ্রিয়সকলকে স্থৈর্য্যসম্পন্ন ও চিত্তবৃত্তিসকলকে নিরুদ্ধ করিতে না পারা যায়, ততদিন বাসনা নির্ম্মূল হয় না, চাঞ্চল্য দূর হয় না, অন্তঃকরণ আত্মস্বরূপে সমাহিত হয় না; সুতরাং মোক্ষলাভও হয় না। এইহেতু যম ও নিয়মরূপ মহাব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা দেহেন্দ্রিয়মনের পবিত্রতা সম্পাদনপূর্ব্বক আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অভ্যাস করা প্রয়োজন। এই সাধনা দ্বারা দেহেন্দ্রিয় স্থির, প্রাণস্পন্দন নিয়মিত ও চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে সেই নির্ম্মল নিস্তরঙ্গ বিষয়-সঙ্গ-রহিত আত্মসমাহিত অন্তঃকরণে স্বয়ংপ্রকাশ আত্মার স্বরূপ প্রকাশিত হয়। সুতরাং ইহাই মোক্ষের প্রকৃষ্টতম উপায়। জ্ঞানী বলেন যে, বিষয়ের অনিত্যত্বাদি দোষ দর্শন করিলে এবং দৃশ্যজগতের সহিত আত্মার বাস্তবিক কোনও সম্বন্ধ নাই, বিচার

দ্বারা ইহা দৃঢ়রূপে নিশ্চিত হইলে চিত্ত স্বভাবতঃই বিষয়বিমুখ হইয়া প্রশান্ত হয়, কর্ম্ম-প্রবৃত্তি নষ্ট হয়, ইন্দ্রিয়সকল স্থির হয়। দেহেন্দ্রিয়মনের চাঞ্চল্যের মূলে বাসনা, বাসনার মূলে অজ্ঞান। আত্মাতে বিষয়ের অধ্যাস ও দেহাদি বিষয়ে আত্মার অধ্যাসরূপ অজ্ঞানই সকল অনর্থের মূল। অজ্ঞান তত্ত্ববিচারজনিত জ্ঞান-দ্বারা নিবারিত হয়। অজ্ঞানের নিবৃত্তিতে সর্ব্বপ্রকার চাঞ্চল্যেরই নিবৃত্তি হয়। তজ্জন্য যৌগিক প্রক্রিয়ার কোন বিশেষ প্রয়োজন নাই। আত্মবিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারাই আত্মস্বরূপের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার হয়।

জ্ঞানী প্রকৃতি বা মায়া এবং তদুৎপন্ন সকল পদার্থে বৈরাগ্য করিয়া তদতীত আত্মস্বরূপ বা ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হইতে চাহেন; যোগী প্রকৃতি বা মায়া ও তদুৎপন্ন দেহেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ প্রভৃতির উপর আধিপত্যলাভ করিয়া ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হইতে চাহেন। উভয়েরই মতে আত্মা স্বরূপতঃ শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্তস্বভাব। প্রকৃতি বা মায়ার দোষগুণ আত্মায় আরোপিত হইয়া আত্মাকে বদ্ধের ন্যায় করিয়া রাখে। আত্মার যথার্থস্বরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারিলেই মুক্তি। এই মুক্তি উভয়েরই লক্ষ্য; কিন্তু সাধনপ্রণালীতে তাঁহাদের পার্থক্য।

কপিল-প্রবর্ত্তিত সাংখ্য এবং বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদ জ্ঞান-প্রধান। কোন কোন অবান্তর বিষয়ে এই দুইয়ের পার্থক্য থাকিলেও উভয়ের সাধনতত্ত্ব মূলতঃ এক—তত্ত্ববিচার ও বৈরাগ্য। উপনিষৎ, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রে অনেকস্থলে

জ্ঞানবাদমাত্রেই সাংখ্য নামে অভিহিত হইয়াছে। সম্যক্ খ্যায়তে অনেন ইতি সাংখ্যম্, অর্থাৎ সম্যক্ জ্ঞান যাহা দ্বারা হয়, তাহাই সাংখ্য। ঐ সব শাস্ত্রে যে-সব স্থানে সাংখ্য ও যোগের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহাতে জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গের কথাই বলা হইয়াছে।

জ্ঞানমার্গ ও যোগমার্গের প্রণালীতে পার্থক্য থাকিলেও ফল-সম্বন্ধে কোন পার্থক্য নাই। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

সাংখ্য-মার্গাবলম্বিগণ যে স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যোগ-মার্গাবলম্বীও সেই স্থানই প্রাপ্ত হন। অতএব সাংখ্য ও যোগকে ফলতঃ এক বলিয়া যে দর্শন করে, সে-ই যথার্থ দর্শন করে। মহাভারতে ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন—

উভে চৈতে মতে জ্ঞানে নৃপতে শিষ্টসম্মতে।
অনুষ্ঠিতে যথাশাস্ত্রং নয়েতাং পরমাং গতিম্॥

হে নৃপতে! এই উভয় (যোগমার্গের ও সাংখ্যমার্গের) সাধন-জ্ঞানই শিষ্টসম্মত বলিয়া শ্রদ্ধার্হ; যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইলে উভয়েই পরমগতি প্রদান করে। ভীষ্মদেব আরও বলিতেছেন যে—

তুল্যং শৌচং তপোযুক্তং দয়া ভূতেষু চানঘ।
ব্রতানাং ধারণং তুল্যং দর্শনং ন সমং তয়োঃ॥

এই দুই মার্গের গন্তব্যই যে শুধু সমান, তাহা নহে, শৌচ,

তপশ্চরণ, ভূতদয়া, ব্রতধারণ প্রভৃতিও সমান। কেবলমাত্র তাহাদের দর্শন, অর্থাৎ দৃষ্টিভঙ্গী বা যুক্তি-প্রণালী সমান নয়। বশিষ্ঠদেবও জনককে এই কথাই বলিয়াছেন,—

যদেব যোগাঃ পশ্যন্তি সাংখ্যৈস্তদনুগম্যতে।
একং সাংখ্যং চ যোগং চ যঃ পশ্যতি স বুদ্ধিমান্॥

যাজ্ঞবল্ক্যও জনককে সাংখ্য ও যোগের এইরূপ সাম্যই উপদেশ করিয়াছেন। অনেক মহাপুরুষ তত্ত্ববিচার ও যোগ—উভয়েরই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া সাংখ্য ও যোগের সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং শিষ্যদিগকে উভয় পন্থাই উপদেশ করিয়াছেন।

যদিও সাংখ্য ও যোগ ফল-সম্বন্ধে সমান এবং সাধনাঙ্গ-সম্বন্ধেও অনেকটা সমান, সুতরাং কোন পথকে শ্রেষ্ঠ এবং কোন পথকে নিকৃষ্ট মনে করা নিতান্তই সাধ্য-সাধন-বিষয়ক অজ্ঞতার পরিচায়ক ; তথাপি মুমুক্ষুদিগের প্রকৃতিগত, রুচিগত, শক্তিগত, ও অবস্থাগত বৈষম্য-নিবন্ধন একজনের পক্ষে হয়ত যোগমার্গ অধিকতর উপযোগী, অপরের পক্ষে হয়ত সাংখ্যমার্গ বা জ্ঞানযোগ অধিকতর উপযোগী। যোগবাশিষ্ঠে বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে উপদেশ দিতেছেন—

দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানং চ রাঘব।
যোগো বৃত্তিনিরোধো হি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্॥
অসাধ্যঃ কস্যচিদ্ যোগঃ কস্যচিৎ তত্ত্বনিশ্চয়।
প্রকারৌ দ্বৌ ততো দেবো জগাদ পরমঃ শিবঃ॥

হে রাঘব! চিত্তনাশের দুইটি পথ—যোগ ও জ্ঞান। বৃত্তিনিরোধের নাম যোগ এবং সম্যক্ তত্ত্বানুসন্ধানের নাম জ্ঞান। কাহারও পক্ষে যোগের পথ অসাধ্য, কাহারও পক্ষে তত্ত্বনিশ্চয়ের পথ অসাধ্য। সেইহেতু পরমগুরু শিব দুই প্রকার সাধনমার্গ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ 'যোগ' শব্দটি সর্ব্বাপেক্ষা উদার-অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। যে-কোন উপায়ে চিত্ত বিশুদ্ধ ও আত্মনিষ্ঠ হয়, যে-কোন উপায়ে চিত্তবৃত্তির বহির্ম্মুখতা ও বহুমুখতা নিবারিত হইয়া অন্তর্ম্মুখতা ও একমুখতা সম্পাদিত হয়, যে-কোন উপায়ে সাধকের সকল কর্ম্ম, সকল জ্ঞান, ও সকল ভাব এক-কেন্দ্রানুগ হয়, যে-কোন উপায়ে মানব-জীবনে সকল প্রকার অসামঞ্জস্য ও তজ্জনিত ক্লেশ বিনষ্ট হইয়া সাম্য ও শান্তি সংস্থাপিত হয়, যে-কোন উপায়ে সাধক আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়, তাহাই যোগশব্দ বাচ্য। দেহেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ নানা বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া নানা সময়, নানা অবস্থায় নানাদিকে ধাবিত হয়, তাহাদের কেন্দ্র সর্ব্বাবস্থায় ঠিক এক থাকে না. ইহাই নিজের সঙ্গে নিজের বিয়োগ। সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় আত্মাকে কেন্দ্র করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া যদি কায়িক, ঐন্দ্রিয়িক ও মানসিক সর্ব্বপ্রকার স্থূল ও সূক্ষ্ম ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তবেই যোগ হইল, তবেই জীবন পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইল। জীবনের বহুত্ব বা অসাম্য দূরীভূত হইয়া যত একত্ব বা সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, ততই দেহেন্দ্রিয়মন মলিনতা-

শূন্য হয় এবং আত্মার সচ্চিদানন্দস্বরূপের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হয়। সুতরাং গীতা সাংখ্যকেও যোগ বলিয়াছেন, ভক্তিকেও যোগ বলিয়াছেন, কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে অনাসক্তভাবে সম্পাদিত সামাজিক ও লৌকিক কর্ম্মকেও যোগ বলিয়াছেন, আসন-প্রাণায়াম-ধারণা-ধ্যানাদি-সমন্বিত অভ্যাসযোগকেও যোগ বলিয়াছেন। সাধকের যেরূপ প্রকৃতি, যেরূপ রুচি, যেরূপ শক্তি, যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থা, তদনুসারে সে তাহার অনুকূল একটি বিশেষ যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া যোগযুক্ত বুদ্ধিতে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত সাধন করিতে থাকিলেই কৃতকৃতার্থ হইবে।

মহাভারতের যুগে অথবা তাহার অব্যবহিত পরে মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত যোগসূত্র গুরুশিষ্য-পরম্পরাগত যোগসাধনাকে একটি চিরস্থায়ী সুন্দর সুগঠিত সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক রূপ প্রদান করিয়াছে। ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রও তেমনি উপনিষদানুগত অদ্বৈতনিষ্ঠ সাংখ্যমত বা ব্রহ্মবাদ এবং জ্ঞান-সাধনাকে অপূর্ব্ব বিচার-নৈপুণ্যের সহিত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কপিল-প্রবর্ত্তিত সাংখ্যসম্প্রদায়ও সাংখ্যসূত্র রচনা করিয়া আপনাদের বিশিষ্ট দার্শনিক মত ও সাধনাকে একটি যুক্তি-দৃঢ় স্থায়ী আকার দান করিয়াছে। তৎপরে প্রত্যেক মতেরই সাম্প্রদায়িক মহাজনগণ অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ও নিজ-নিজ সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন। এইরূপে গুরুশিষ্য-পরম্পরায় সকল সম্প্রদায়ই প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া

আসিতেছে এবং নানাশ্রেণীর মনুষ্যের আধ্যাত্মিক ক্ষুধার আহার প্রদান করিতেছে। বৌদ্ধসম্প্রদায়ও সাংখ্য ও যোগ উভয়ই অংশতঃ গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহাদিগকে একটি বিশিষ্ট নূতন রূপ প্রদানপূর্ব্বক নিজস্ব করিয়া লইয়াছিল। ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনা এইরূপেই ক্রমশঃ পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে।

মধ্যযুগে জ্ঞান-সাধনা ও যোগ-সাধনার বৈজয়ন্তী লইয়া দুইজন অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ভারতের আধ্যাত্মিক সাধনক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—একজন বেদান্তাচার্য্য শঙ্কর, আর একজন যোগাচার্য্য গোরক্ষনাথ। শঙ্কর হইতে বৈদান্তিক জ্ঞানসাধনা এবং জ্ঞানি-সম্প্রদায় যেমন নবজীবন লাভ করিয়াছে, গোরক্ষনাথ হইতেও যোগসাধনা ও যোগি-সম্প্রদায় তেমনই নবজীবন লাভ করিয়াছে। জ্ঞানিগুরু শঙ্কর বেদান্ত-শাস্ত্রের প্রচার ও জ্ঞানসাধনার প্রচলনের উদ্দেশ্যে সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়কে পুনর্গঠিত করিলেন, তাহাদিগকে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করিলেন, প্রধান প্রধান স্থানে মঠ স্থাপন করিয়া সেইসব স্থান জ্ঞানশিক্ষার কেন্দ্র করিলেন এবং এইরূপে তিনি স্বকায় সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ দ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষে বেদান্তের তত্ত্ব ও সাধনা শিক্ষা-প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যোগিগুরু গোরক্ষনাথও যোগসাধনার প্রচলনের উদ্দেশ্যে যোগিসম্প্রদায়ের পুনর্গঠন করিলেন, তাহাদিগকে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত করিলেন, বিভিন্ন স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া যোগশিক্ষার

কেন্দ্র স্থাপন করিলেন এবং স্বকীয় অলৌকিক প্রভাব বিস্তার করিয়া ও শিষ্য-প্রশিষ্যগণের ভিতর দিয়া সমগ্র ভারতে যোগধর্ম্ম-প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন। মোক্ষাভিলাষী সংসার-বিরাগী সাধুদিগের জন্য শঙ্কর যেমন অন্তরঙ্গ জ্ঞানসাধনার বিধান করিয়াছিলেন, গোরক্ষনাথও তেমনই অন্তরঙ্গ যোগসাধনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই বেদ ও উপনিষদে আস্থাবান্ ছিলেন; উভয়েই ব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বরকে পরম তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার ও প্রচার করিয়াছেন; উভয়েই ভারতীয় সমাজকে সনাতন ধর্ম্মে আস্তিক্যসম্পন্ন করিতে স্ব-স্ব জ্ঞানশক্তি ও যোগশক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই সাধারণ ধর্ম্মার্থীদের জন্য সাকার দেবোপাসনা ও মূর্ত্তি-পূজার সমর্থক ছিলেন। অদূরদর্শী ধর্ম্মসংস্কারক ও সমাজ-সংস্কারকদের ন্যায় তাঁহারা অধিকার-নিরপেক্ষ হইয়া সকলের জন্য একই রকম ধরাবাঁধা সাধন-প্রণালীর ব্যবস্থা করেন নাই। এই উদ্দেশ্যে সাধারণ গৃহীদের কল্যাণের জন্য এবং নিম্নাধিকারী সাধুদের পক্ষে সাধনার উচ্চ সোপানে আরোহণের সৌকর্য্য-সম্পাদনের জন্য তাঁহারা অনেক মঠে বা আশ্রমে দেবমূর্ত্তিরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ভক্তি ও আচারনিষ্ঠার সহিত দেবতার উপাসনা করিতে করিতেই দেহেন্দ্রিয়মন বিশুদ্ধ হয়, হৃদয় সরস ও ধর্ম্মানুরাগী হয়, ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্যসকল জানিবার জন্য আগ্রহ জন্মে এবং অন্তরঙ্গ যোগসাধনা ও জ্ঞানসাধনার অধিকার লাভ করা যায়।

সালম্বন উপাসনা নিরালম্ব উপাসনার সোপান। লোকোত্তর মহাপুরুষগণও লোকশিক্ষার জন্য এবং আপনাদের জীবনের দৃষ্টান্তের দ্বারা লোকের মন তাহাদের অধিকারানুযায়ী ধর্ম্ম-সাধনে আকৃষ্ট করিয়া তাহাদিগকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিবার জন্য সাধারণ ধর্ম্মপরায়ণ লোকের মত দেবতার সাকার মূর্ত্তির নিকট পূজার্চ্চনাদি করিয়া থাকেন। শঙ্কর ও গোরক্ষনাথ উভয়েই এই আদর্শ দেখাইয়াছেন।

"যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥"

শ্রেষ্ঠব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, সাধারণ লোকও সেইরূপই আচরণ করিয়া থাকে, শ্রেষ্ঠব্যক্তি (নিজের আচরণ দ্বারা ও উপদেশ দ্বারা) যে শাস্ত্রের প্রামাণ্য প্রতিপাদন করেন, লোকও সেই শাস্ত্রেরই অনুবর্ত্তন করে।

উদারচরিত্র জ্ঞানিগণ ও যোগিগণ কোন দেবতার উপাসনাই অবজ্ঞা করেন নাই। সকল দেবতাকেই তাঁহারা প্রকৃতি-পুরুষেশ্বর মায়াধীশ অশেষ-কল্যাণ-গুণাকর ভগবানের বিভূতি বা বিশেষ প্রকাশ বলিয়া জানেন ও মানেন এবং সকল দেবতার উপাসনা দ্বারাই ভগবানের উপাসনা হয় বলিয়া তাঁহারা উপলব্ধি করেন। তবে মোক্ষপিপাসু জ্ঞানী ও যোগী সাধক-গণকে প্রধানতঃ শিবের উপাসক হইতে দেখা যায়। যেহেতু শিব মহাত্যাগী, মহাযোগী, মহাজ্ঞানী, মহেশ্বর। তিনি চিরকাল সকল ত্যাগীর আদর্শ, যোগীর আদর্শ এবং জ্ঞানীরও আদর্শ। শাস্ত্রেও

শিবকেই যতিদিগের উপাস্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে—'যতীনাং চ মহেশ্বরঃ।' পাতঞ্জল যোগসূত্রে সূত্রিত হইয়াছে যে—'ক্লেশ-কর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ'—অর্থাৎ ক্লেশ, কর্ম্ম, কর্ম্মফল ও বাসনা দ্বারা অসংস্পৃষ্ট যে পুরুষবিশেষ, তিনিই ঈশ্বর। এই আদর্শেই যোগিগণ ও জ্ঞানিগণ শিবমূর্ত্তি ও শিবচরিত্র বর্ণনা করেন ও ভাবনা করেন। শিব সর্বৈবশ্বর্য্যশালিনী বিশ্বপ্রকৃতিময়ী ভগবতী মহামায়ার স্বামী—তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি, যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে, সবই তাঁহার ; অথচ তিনি নির্লিপ্ত, উদাসীন, জ্ঞান-তপোরত এবং আত্মসমাহিত। মায়ার বিকাররূপ সংসারকে সংযম দ্বারা সংহৃত ও জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া তদবশেষরূপ ভস্ম নিজ অঙ্গে মাখিয়া—আপনার ভিতরে সমস্ত বিশ্ব প্রলীন করিয়া তিনি আত্মানন্দে ভরপূর। মায়া তাঁহারই শক্তি, তাঁহারই অঙ্কলীনা, তাঁহা হইতে স্বরূপতঃ অভিন্না। এই মায়া হইতে সৃষ্টিবৈচিত্র্যের উৎপত্তি হইলেও তিনি নির্ব্বিকার, প্রশান্ত, অচল ও অটল। তাঁহার যে রূপ কল্পিত হইয়াছে, তাহাতে সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে কদর্য্য, ঘৃণ্য, ভীষণ ও নিষ্কিঞ্চনভাব একাধারে সামঞ্জস্যের সহিত মিলিত হইয়াছে। সবই তাঁহার অঙ্গীভূত হইয়া সুশোভিত ও আনন্দপ্রদ হইয়া আছে। শিবগীতায় শিব নিজকে এইরূপ বর্ণন করিতেছেন—

অচিন্ত্যরূপমব্যক্তমনন্তমমৃতং শিবম্।
আদিমধ্যান্তরহিতং প্রশান্তং ব্রহ্মকারণম্॥

একং বিভুং চিদানন্দমরূপমজমদ্ভুতম্।
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশমুমাদেহার্দ্ধধারিণম্॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধরং নীলকণ্ঠং ত্রিলোচনম্।
জটাধরং চন্দ্রমৌলিং নাগযজ্ঞোপবীতিনম্॥
ব্যাঘ্রচর্ম্মোত্তরীয়ং চ বরেণ্যমভয়প্রদম্।
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনয়নং স্মেরবক্ত্রসরোরুহম্।
ভূতিভূষিতসর্ব্বাঙ্গং সর্ব্বাভরণভূষিতম্॥
এবমাত্মারণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিম্।
জ্ঞাননির্ম্মথনাভ্যাসাৎ সাক্ষাৎ পশ্যন্তি মাং জনঃ॥

"অচিন্ত্য (মনের অগোচর), অব্যক্ত (ইন্দ্রিয়ের অগোচর), অনন্ত (দেশকালের অতীত), অমৃত (মোক্ষস্বরূপ), শিব (মঙ্গল-স্বরূপ), আদি, মধ্য ও অন্তরহিত (অখণ্ড, নিরাবয়ব), প্রশান্ত (নির্ব্বিকার), এক (অদ্বিতীয়), বিভু (সর্ব্বব্যাপী), চিদানন্দ, অরূপ (নিরাকার), অজ (জন্মরহিত), অদ্ভুত (উপমাশূন্য), সর্ব্বকারণ-কারণ, ব্রহ্ম।" ইহাই শিবের পারমার্থিক স্বরূপ। যাহাদের চিন্তাশক্তি দেশ, কাল, নাম, রূপ প্রভৃতি স্থূলের মধ্যে আবদ্ধ, তাহাদের নিকট এই স্বরূপের একটি আভাস রূপের মধ্যে ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই একটি রূপকল্পনা আবশ্যক হয়। সেইহেতু স্বরূপ-বর্ণনার পরে তাঁহার রূপ-বর্ণনা হইয়াছে। তিনি স্বরূপতঃ বর্ণহীন বলিয়াই তাঁহার রূপ শুদ্ধ স্ফটিকের ন্যায় শুভ্রবর্ণবিশিষ্ট। উমা অর্থাৎ মায়া বা প্রকৃতি তাঁহারই স্বরূপভূতা মহাশক্তি এবং তাঁহার আশ্রয়েই বিশ্বরচনা

কার্য্য করিতেছে বলিয়া তিনি উমাদেহার্দ্ধধারী। জগতে যাহা কিছু আপাততঃ ভীষণ বলিয়া প্রতীয়মান, তাহা সেই মঙ্গলময়ের অঙ্গাভরণ। সেইহেতু ব্যাঘ্রচর্ম্ম তাঁহার পরিধেয় ও উত্তরীয়, সর্প তাঁহার যজ্ঞোপবীত। আশুতোষ ভোলানাথ সংসারসমুদ্রমন্থনোদ্ভূত, জীবগণের স্বকর্ম্মপ্রসূত সকল বিষ অহৈতুকী করুণায় স্বয়ং পান করিয়া সকলকে অমৃত-সম্ভোগের সুযোগ দিতেছেন। তাহারই আভাস তাঁহার নীলকণ্ঠে প্রকাশিত। তাঁহার জ্ঞাননেত্র সদা উন্মীলিত, অশেষবৈচিত্র্যময় বিশ্বপ্রপঞ্চ তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হইলেও স্বরূপজ্ঞানের আবরণ নাই, তাই তিনি ত্রিলোচন। এই জ্ঞাননেত্রের তেজেই কাম ভস্মীভূত ও বৈরাগ্য নিত্য-প্রতিষ্ঠিত। প্রসাধনবিহীন জটাজূটধারী মস্তক তাঁহার পরবৈরাগ্যের একটি নিদর্শন। আবার মনোনয়নাহ্লাদকরী চন্দ্রকলা তাঁহার ললাটে জটাজূটের সম্মুখেই শোভা পাইতেছে। এই চন্দ্রকলা হইতে অবিরাম প্রেমামৃত বর্ষিত হইয়া জীবজগতের আনন্দবিধান করিতেছে, সর্ব্বদা সুপ্রসন্ন বলিয়া তাঁহার মুখপদ্ম ঈষদ্ হাস্যবিকসিত। তিনি বিশ্বরূপ, তাঁহার তিনটি চক্ষুই যেন চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। আবার তিনি বিশ্বাতীত বলিয়া বিভূতি-ভূষিত। সংসারে যত কিছু বিরোধী ভাব, সবই তাঁহার অঙ্গে সৌসামঞ্জস্যে বিরাজিত, সকলই তাঁহার আভরণ।

যে সাধক স্বীয় আত্মাকে অরণি করিয়া এবং প্রণবকে উত্তরারণি করিয়া জ্ঞানমন্থন অভ্যাস করে, সে এই শিবের

সাক্ষাৎ পারমার্থিক স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া মোক্ষলাভ করে।

আরাধ্য দেবতাকে যেরূপ স্বভাবান্বিত বলিয়া চিন্তা করা যায়, তাঁহার উপাসনা করিতে করিতে উপাসক তদ্ভাবভাবিত হইয়া অনেক পরিমাণে সেইরূপ স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এইহেতু শিবের উপাসকদিগের পক্ষে বৈরাগ্যপ্রবণ, সংসারবিমুখ, কঠোর-তপঃপরায়ণ, অধ্যাত্মবিচারশীল, উদাসীন সন্ন্যাসী হওয়া বেশী স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে বিষ্ণুপাসকগণের পক্ষে ভক্তিমান, প্রেমিক-ভাবপ্রবণ, সেবাধর্ম্মরত, সমাজমুখী, লীলাস্বাদনশীল সাধু হওয়া বেশী স্বাভাবিক। সেইহেতু সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ভক্তি-পন্থিগণ অধিকাংশস্থলে বৈষ্ণব হন এবং যোগপন্থী ও জ্ঞানপন্থী সন্ন্যাসিগণ অধিকাংশস্থলে শৈব হইয়া থাকেন। এই কারণে শঙ্কর ও গোরক্ষনাথের সম্প্রদায় দুইটিতে শিবোপাসনার প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয়। ত্যাগ, যোগ ও জ্ঞান—শৈবধর্ম্মের এই তিনটিই অঙ্গাঙ্গিভাবে নিত্যযুক্ত।

একদিকে শিব যেমন বৈরাগী, জ্ঞানী ও যোগীর আরাধ্য, অন্যদিকে তিনি আবার সর্ব্বসাধারণের উপাস্য। শিবের পূজায় পৌরোহিত্যের প্রাধান্য নাই। স্ত্রীলোক, বৈশ্য এবং শূদ্রেরাও নিজে-নিজেই শিবের পূজা করিতে পারে। শিবমন্দিরে প্রবেশ করিতে এবং স্বহস্তে শিবপূজা করিতে কাহারও বাধা নাই। যাহারা অন্য কোন দেবতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়, তাহারাও শিবের পূজা করিয়া থাকে। শিবলিঙ্গ সঙ্গে করিয়া গাড়ী, ষ্টীমার

প্রভৃতিতে অনেকে নানাস্থানে যাতায়াত করিয়া থাকেন। স্পর্শদোষ শিবকে স্পর্শ করে না। এদেশে কুমারীগণ প্রথমেই অতি অল্পবয়সে শিবপূজায় দীক্ষিত হয়। মধ্যযুগে কৃষকগণ কৃষিকার্য্যে প্রধানতঃ শিবের সাহায্য প্রার্থনা করিত। শিবের গান পুরাতন বাংলা-সাহিত্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। এই গান এত বহুলভাবে প্রচারিত হইয়াছিল যে, 'ধান ভানতে শিবের গীত' একটি প্রবাদ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের পতন ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানের সময় অনেক বৌদ্ধ শিবোপাসনা গ্রহণপূর্ব্বক হিন্দুসমাজভুক্ত হইয়াছিল। সাধারণ বৌদ্ধদিগকে হিন্দুভাবাপন্ন করিতে এবং শৈবধর্ম্মের এইরূপ বহুল প্রচার করিতে যোগিগুরু গোরক্ষনাথের অনন্য-সাধারণ প্রভাব ছিল।

জ্ঞানপন্থী ও যোগপন্থি-সম্প্রদায়ের কতক বিষয়ে বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হইলেও জ্ঞানপন্থী সাধকগণ ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণকে বশীভূত করিবার জন্য যোগসাধনার সাহায্য গ্রহণ করেন এবং যোগপন্থী সাধুগণ তত্ত্বনির্দ্ধারণের উদ্দেশ্যে সাংখ্য বা বেদান্ত-শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও তদনুযায়ী বিচার করেন। গোরক্ষনাথ ও শঙ্করের বহু পূর্ব্ব হইতেই সাধনক্ষেত্রে জ্ঞান ও যোগের এইরূপ অঙ্গাঙ্গিভাব চলিয়া আসিতেছিল। সাম্প্রদায়িক মতবাদের ক্ষেত্রেই পৃথক্ ভাব ও তর্কবিতর্ক। শিব-সংহিতা প্রভৃতি যোগগ্রন্থে বৈদান্তিক ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনা করিয়া সেই ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায়রূপেই যোগপ্রক্রিয়ার উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। শঙ্কর ও

গোরক্ষনাথের পরে এই মাখামাখি আরও বেশী মাত্রায় চলিয়া আসিতেছে বলিয়া বোধ হয়। গোরক্ষনাথের সম্প্রদায়বর্ত্তী মহাপুরুষগণ তত্ত্ববিচারের জন্য প্রায়শঃ বেদান্তশাস্ত্রই অবলম্বন করেন। শঙ্করের সম্প্রদায়বর্ত্তী অনেক মহাপুরুষও যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। জ্ঞান ও যোগের পোষক ও অঙ্গী-ভূতরূপে ভক্তিসাধনা চিরকালই সাধক-সমাজে প্রচলিত। ঈশ্বরোপাসনা, গুরুসেবা, দেবপূজা, ভগবদ্ভক্তির সহিত জীবপ্রেম জ্ঞানসাধক ও যোগসাধক সকলের পক্ষেই অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে। ভক্তিহীন জ্ঞান ও যোগ শুষ্ক ও নির্জ্জীব হয়। জ্ঞানী ও যোগী—সকল সাধককেই 'ভক্ত' আখ্যা প্রদান করা যায়। ভক্তিমার্গে ভক্তিসাধনা জ্ঞান ও যোগের অঙ্গরূপে স্বীকার্য্য নয়। ভক্তিই অঙ্গী, যোগ ও জ্ঞান প্রয়োজনানুরূপ অঙ্গরূপে গ্রাহ্য। মধ্যযুগ হইতে ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে ভক্তিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

শঙ্করের সম্প্রদায়ে যেমন উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্র সর্ব্বোপরি প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইলেও স্বয়ং শঙ্করের এবং তৎপরবর্ত্তী অনেক মহাজনের প্রণীত অনেক গ্রন্থও প্রামাণিক বলিয়া স্বীকৃত হয়, গোরক্ষনাথসংগঠিত যোগিসম্প্রদায়েও তেমনি যোগসাধনা-বিষয়ে পাতঞ্জলসূত্র প্রভৃতির প্রামাণ্য সর্ব্বোপরি গ্রাহ্য হইলেও গোরক্ষনাথ এবং তৎপরবর্ত্তী সিদ্ধমহাপুরুষদের রচিত যোগ-গ্রন্থের প্রামাণ্যও সকল যোগীই স্বীকার করিয়া থাকেন। নাথ-যোগি-সম্প্রদায়ে বিশেষভাবে প্রচলিত প্রামাণিক যোগগ্রন্থ-

সমূহের মধ্যে গুরু দত্তাত্রেয়ের উপদিষ্ট 'দত্তাত্রেয়সংহিতা', গোরক্ষোপদিষ্ট 'গোরক্ষসংহিতা' ও সহজানন্দ চিন্তামণিস্বাত্মারাম যোগীন্দ্রের রচিত 'হঠ-প্রদীপিকা' প্রভৃতি গ্রন্থ সমধিক প্রসিদ্ধ।

দত্তাত্রেয়সংহিতায় পাতঞ্জলোক্ত অষ্টাঙ্গযোগই বিশদরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। হঠ-প্রদীপিকাতেও তাহাই করা হইয়াছে। দত্তাত্রেয়সংহিতায় আছে যে—

> যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ ততঃ পরম্।
> প্রাণায়ামশ্চতুর্থঃ স্যাৎ প্রত্যাহারশ্চ পঞ্চমঃ॥
> ষষ্ঠী তু ধারণা প্রোক্তা ধ্যানং সপ্তমমুচ্যতে।
> সমাধিরষ্টমঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বপুণ্যফলপ্রদঃ॥

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই অষ্টাঙ্গযোগ সকল পুণ্যের ফল প্রদান করে। যম ও নিয়ম যোগসাধনার বিশেষ অঙ্গ নহে। ইহা মানবমাত্রেরই অনুষ্ঠেয়। যম ও নিয়ম সকল সাধনার ভিত্তিস্বরূপ। যম ও নিয়ম স্বেচ্ছায় উল্লঙ্ঘন করিলে জ্ঞান, যোগ, ভক্তি বা কর্ম্ম কোন সাধনারই সম্যক্ অনুষ্ঠান সম্ভবপর হয় না। নিজের কল্যাণের জন্য, সমাজের কল্যাণের জন্য, জাতির কল্যাণের জন্য যম ও নিয়ম সকল মনুষ্যেরই সকল অবস্থায় অবশ্য কর্ত্তব্য। এই-হেতু মহাভারত ও পাতঞ্জলে যম ও নিয়ম 'সার্ব্বভৌম মহাব্রত' বলিয়া শ্রদ্ধার সহিত উপদিষ্ট হইয়াছে। সম্ভবতঃ এই কারণেই গুরু গোরক্ষনাথ 'গোরক্ষসংহিতায়' যম ও নিয়মকে বিশেষভাবে

যোগের অঙ্গরূপে গ্রহণ করেন নাই এবং যোগকে অষ্টাঙ্গ না বলিয়া ষড়ঙ্গ বলিয়াছেন—

আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বদন্তি ষট্ ॥

যাহা মানবমাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম, তাহা বিশেষভাবে যোগের অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করা নিষ্প্রয়োজন। হঠ-প্রদীপিকায় দশটি যম ও দশটি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে—

অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং কৃপার্জ্জবম্।
ক্ষমাধৃতির্ম্মিতাহারঃ শৌচং চেতি যমা দশ ॥
তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনম্।
সিদ্ধান্তশ্রবণঞ্চৈব হ্রীর্মতিশ্চ জপো হুতম্।
দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা যোগশাস্ত্রবিশারদৈঃ

অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য্য), ব্রহ্মচর্য্য, কৃপা, অকপটতা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, মিতাহার ও শৌচাচার—এই দশটি যম। তপস্যা, সন্তোষ, আস্তিক্য (শাস্ত্র, গুরু ও ঈশ্বরে বিশ্বাস), দান, দেবপূজা, সিদ্ধান্তশ্রবণ (শাস্ত্র ও মহাপুরুষদের যাহা সত্য বলিয়া সিদ্ধান্ত, তাহা গুরুদেবের নিকট শ্রবণ করিয়া এবং শাস্ত্রগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া অবগত হওয়া), পাপকার্য্যে লজ্জাবোধ, মতি (মনন—সদসদ্‌বিচার), জপ (প্রণব বা গুরুদত্ত মন্ত্রের মনে-মনে আবৃত্তি), হোম (দেবতার উদ্দেশে নিজের ভোগ্যবস্তু নিবেদন করিয়া দেওয়া ও দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করা)—এই দশটিকে যোগশাস্ত্র-

বিশারদগণ নিয়ম বলেন। যোগশাস্ত্রে অহিংসা প্রভৃতির ফল এইরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে যে, অহিংসা পূর্ণরূপে স্বভাবে পরিণত হইলে সাধকের সমীপে সকল প্রাণীই হিংস্রভাব-বর্জ্জিত ও ভয়-শূন্য হয়; সত্য সম্পূর্ণরূপে স্বভাবে পরিণত হইলে বাক্য অব্যর্থ হয়; অস্তেয় প্রতিষ্ঠিত হইলে (কোন অবস্থায় কাহারও কোন বিষয়ের উপর লোভ জন্মিবার সম্ভাবনা দূরীভূত হইলে) নানাদিক্ হইতে ধনরত্ন ও উত্তম ভোগ্যবস্তুসকল আপনা-আপনি আসিয়া নিকটে উপস্থিত হয়; ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠিত হইলে অপ্রতিহত-বীর্য্যলাভ হয়। বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক শৌচাচারের ফলে একদিকে স্বদেহের প্রতি আসক্তি ও পরদেহের প্রতি আসঙ্গলিপ্সা বিনষ্ট হয়, অন্যদিকে অন্তঃকরণ নির্ম্মল সুপ্রসন্ন ও একাগ্র হইয়া অতীন্দ্রিয়-দর্শন-যোগ্যতা লাভ করে; সন্তোষের ফলে অপ্রমেয়-সুখসম্ভোগ হয়, তপস্যা-প্রভাবে অশুদ্ধিক্ষয় ও কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধি হয় ইত্যাদি। যোগিগণ এসব কথা কেবল কল্পনার, অনুমানের বা শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া বলেন না—প্রত্যক্ষ পরীক্ষার ফলে বলিয়া থাকেন। মহাভারতে ভীষ্মদেব বলিয়াছেন যে—'প্রত্যক্ষহেতবো যোগাঃ সাংখ্যাঃ শাস্ত্র-বিনিশ্চয়াঃ।'—যোগিগণের যুক্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং জ্ঞানীদিগের যুক্তি শাস্ত্রবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

যম ও নিয়ম ব্যতীত যোগের অন্য ছয় অঙ্গের মধ্যে আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার বহিরঙ্গ এবং ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অন্তরঙ্গ। আসনজয়ী যোগী শীত, আতপ, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা প্রভৃতি

দ্বারা অভিভূত হন না ; আলস্য, তন্দ্রা ও বহুবিধ ব্যাধি হইতেও মুক্ত থাকেন। শ্বাস-প্রশ্বাস-নিয়মনরূপ প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ-স্পন্দনকে আয়ত্ত করিতে পারিলে জ্ঞানাবরক কর্ম্মের ক্ষয় হয়, মনকে তত্ত্ববিশেষে স্থির করিয়া রাখিবার শক্তি জন্মে এবং অন্যান্য অনেক ক্ষমতাও লাভ করা যায়। সর্ব্বদা অবহিত হইয়া সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ দ্বারা মনকে ও ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শ হইতে যথাসম্ভব নিবৃত্ত রাখা এবং আন্তরভাব লইয়া থাকিতে বাধ্য করাই প্রত্যাহার সাধন। ইহা অভ্যস্ত হইলে মন ও ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করে। এই সব বহিরঙ্গ সাধনায় উল্লিখিতরূপে যে-সকল অসাধারণ শক্তি-সামর্থ্য ও ঐশ্বর্য্যলাভ হয়, যোগসাধক যদি তাহাতে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হন এবং সেই শক্তিকে অন্তরঙ্গ সাধনায় নিয়োজিত না করিয়া যদি অতি-প্রবল কল্যাণকর প্রয়োজন ব্যতীত তাহা বাহিরে প্রকাশ করেন, তবে তিনি যোগ হইতে ভ্রষ্ট হন ও তাঁহার আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়। সদাজাগরিত তীক্ষ্ণ বিচার এবং সদ্‌গুরুর বিশেষ কৃপা ব্যতীত এই প্রলোভন ও মোহ হইতে উদ্ধার পাওয়া খুব কঠিন। মহাভারত 'দুর্গস্তেষ মহাপন্থাঃ' বলিয়া উল্লেখপূর্ব্বক ও বিবিধ উপমা প্রদর্শনপূর্ব্বক যোগসাধককে সাবধান করিয়াছেন।

এই সব শক্তি ও ঐশ্বর্য্য সাধকের লক্ষ্য নহে; কিন্তু বিশেষ-বিশেষ যোগাঙ্গসাধনার অবশ্যম্ভাবী ফল। সুতরাং আধ্যাত্মিক চরম কল্যাণ লাভ করিতে হইলে এ-সকলের উপর

তীব্র বৈরাগ্য করিতে হইবে। সংসারাসক্তির ন্যায় এ-সকলের প্রতি আসক্তিও সুতীক্ষ্ণ বিচারাস্ত্র দ্বারা ছিন্ন করিতে হইবে; ইহাদের প্রয়োজনীয় অংশ মাত্র অন্তরঙ্গ-সাধনের সাহায্যার্থ প্রয়োগ করিতে হইবে। যথার্থ যোগিগণ তাহাই করিয়া থাকেন। যাহারা শক্তিকে ধারণ করিতে না পারিয়া প্রকাশ করে, তাহারা দুর্ব্বল; যাহারা নিজেদের এই সব শক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া অথবা প্রলোভনে পড়িয়া তাহা লইয়া ক্রীড়া করে, তাহারা মূর্খ; যাহারা ইহা দ্বারা লোকসকলকে চমৎকৃত করিতে চায়, তাহারা যোগিকুলকলঙ্ক।

ধারণা, ধ্যান ও সমাধির অভ্যাস যোগের অন্তরঙ্গ-সাধনা। এই তিনটি বেদান্তোপদিষ্ট নিদিধ্যাসনেরই স্তর। নাভিচক্র, হৃদয়-কমল, নাসিকাগ্র, জিহ্বাগ্র, মূর্দ্ধকেন্দ্র প্রভৃতি শরীরের কোন বিশেষ প্রদেশে অথবা শরীরের বাহিরে ঘট, প্রতিমা, দীপশিখা, সূর্য্যমণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল প্রভৃতি বিশেষ স্থানে, কিংবা অন্তঃকরণের কোন বিশেষ ভাবে বা ভগবানের কোন বিশেষ নামে বা রূপে ধ্যেয়বস্তুর প্রতিষ্ঠা করিয়া দেহেন্দ্রিয়ের সংযমন-পূর্ব্বক চিত্তকে তাহাতে আবদ্ধ রাখার নাম ধারণা।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥

গীতোক্ত এই শ্লোকে আত্মবিষয়ক ধারণাই উপদিষ্ট হইয়াছে। ধারণা অভ্যস্ত হইলে চিত্তবৃত্তি যখন অন্য বিষয়ের দিকে ধাবিত না হইয়া তৈলধারার ন্যায় নিরাবিল একতানতার

সহিত ধ্যেয়াকারে আকারিত হইয়াই প্রবাহিত হয়, তখনই ধ্যান হয়। ধ্যানের চরম উৎকর্ষের নাম সমাধি। ধ্যান যখন এরূপ প্রগাঢ় হয় যে, তাহাতে কেবল ধ্যেয়বিষয়েরই উপলব্ধি হইতে থাকে, ধ্যেয়াকার বৃত্তি ভিন্ন আর কোনও বৃত্তিই চিত্তে থাকে না, এমন কি নিজের পৃথক্ সত্তারও উপলব্ধি হয় না, চিত্ত সম্পূর্ণরূপে ধ্যেয়ময় হইয়া ধ্যেয়েরই আকার প্রাপ্ত হয়, তাদৃশ চিত্তস্থৈর্য্য বা চিত্তবৃত্তি-নিরোধই সমাধি নামে অভিহিত হয়। আত্মা, ব্রহ্ম বা ঈশ্বরে সমাধি ব্যতীত পরমার্থসিদ্ধি হয় না। সমাধির ফলেই যথার্থ প্রজ্ঞা বা তত্ত্বজ্ঞান হয়, পরমতত্ত্বের অপরোক্ষ অনুভূতি হয়।

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি নানা বাহ্য ও আন্তর বিষয়ে প্রয়োগ করিয়া নানাপ্রকার বিভূতি ও সিদ্ধি লাভ করা যায়। সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতিও লাভ করা যায় বলিয়া যোগশাস্ত্রে বর্ণিত আছে। কিন্তু 'তে সমাধৌ উপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ' (যোগসূত্র ৩।৩৭)—যোগলব্ধ নানাপ্রকার শক্তি ও বিভূতি ব্যুত্থান-অবস্থাতে সিদ্ধি হইলেও সমাধিতে তাহার বিঘ্নস্বরূপ, সমাধি দ্বারা লভ্য অব্যাহত পরমাত্মসাক্ষাৎকারের তাহারা বিরোধী, তাহারা চিত্তকে বহির্ম্মুখ করে এবং চরম-লক্ষ্যসাধনে অন্তরায় হয়। সুতরাং সকল প্রকার শক্তি, বিভূতি বা সিদ্ধিতে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক সমাহিত হইয়া জন্মমৃত্যু-ক্রিয়ার অতীত হইতে হইবে, কৈবল্য লাভ করিতে হইবে—ইহাই যোগশাস্ত্রের উপদেশ।

যোগিগুরু দত্তাত্রেয় বলিয়াছেন—

সমভ্যসেৎ তদা ধ্যানং ঘটিকাষষ্টিমেব চ।
বায়ুং নিরুধ্য তাং ধ্যায়েৎ দেবতামিষ্টদায়িনীম্॥
সগুণধ্যানমেতৎ স্যাদণিমাদিসুখপ্রদম্।
নির্গুণং খমিব ধ্যায়ন্ মোক্ষমার্গে প্রবর্ত্ততে॥
নির্গুণধ্যানসম্পন্নঃ সমাধিং চ সমভ্যসেৎ।
দিনদ্বাদশকেনৈব সমাধিং সমবাপ্নুয়াৎ॥

দিবাভাগের ষাট দণ্ড কালই ধ্যান অভ্যাস করিবে। বায়ু-নিরোধ করিয়া (প্রাণায়াম করিয়া) সেই ইষ্টদায়িনী দেবতাকে ধ্যান করিবে। ইহার নাম সগুণ ধ্যান। ইহার ফলে অণিমাদি সুফললাভ হয়। (ইহাতে বৈরাগ্য করিয়া) আকাশের ন্যায় নির্গুণ ব্রহ্মের ধ্যান অভ্যাস করিলে মোক্ষমার্গে অগ্রসর হওয়া যায়। নির্গুণ-ধ্যানসম্পন্ন হইয়া সমাধি অভ্যাস করা উচিত। এইরূপ নিত্য নিরন্তর নির্গুণ ধ্যান অভ্যাস করিলে দ্বাদশ দিনেই (অর্থাৎ অত্যল্পকালেই) সমাধির প্রতিষ্ঠা হয় ও তাহার ফলে কৈবল্য বা মোক্ষলাভ হয়।

মোক্ষলাভ হইলে অনন্ত কালের জন্য যে পরমানন্দ লাভ করা যায়, তাহার তুলনায় ঐশ্বর্য্য ও শক্তিজনিত সকল আনন্দই নিতান্ত তুচ্ছ। ক্ষুদ্রহৃদয় যোগিগণই যোগলব্ধ ঐশ্বর্য্যে মত্ত হয় ও মোক্ষ হইতে বঞ্চিত হয়। যথার্থ যোগিগণ মোক্ষ-লাভের উদ্দেশ্যেই পূর্ব্বোক্তরূপ যোগাঙ্গসকলের অনুষ্ঠান করেন। পতঞ্জলি বলিতেছেন—'যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে

জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ' (যোগসূত্র ২।২৮)—যোগাঙ্গানুষ্ঠানের দ্বারা অশুদ্ধিক্ষয় হইলে বিবেকখ্যাতি (প্রকৃতিবিবিক্ত আত্মস্বরূপ-সাক্ষাৎকার) পর্য্যন্ত জ্ঞান দীপ্তি হইতে থাকে।

যোগাধিকারী সাধকগণকে এইরূপ মোক্ষপ্রদ যোগপথে আনয়ন করিবার জন্যই যোগিগুরু গোরক্ষনাথ নাথ-যোগিসম্প্রদায়ের সংগঠন করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গোরক্ষনাথমন্দিরে তরুণ যোগার্থী

যোগিগুরু গোরক্ষনাথ-প্রবর্ত্তিত নাথ-যোগি-সম্প্রদায় ভারত-ভূমির সকল প্রান্তে অসামান্য আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। ভারত-বহির্ভূত তিব্বত, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশেও এই সম্প্রদায়ের প্রভাবের নিদর্শন বর্ত্তমান। প্রায় সকল প্রদেশেই গোরক্ষনাথের নামে মঠ, মন্দির, আশ্রম ও যোগগুহা প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। নাথ-যোগী সাধুগণ সর্ব্বত্র নিষ্কিঞ্চন-ভাবে বিচরণ করিয়া থাকেন। বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্ব্বতে, সহরে-বন্দরে, শ্মশানক্ষেত্রে ও তীর্থক্ষেত্রে অসংখ্য শিবলিঙ্গ ও কালীমূর্ত্তি গোরক্ষনাথের অনুবর্ত্তী মহাত্মগণ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ত্যাগ-বৈরাগ্য ও যোগতপস্যায় দীক্ষিত নাথসাধুগণ দেশের সর্ব্বত্র সকল শ্রেণীর নরনারীর মধ্যে যোগীশ্বর, জ্ঞানীশ্বর ও ত্যাগীশ্বর মহাদেবের এবং তাঁহার অঘটনঘটন-পটীয়সী, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-বিধায়িনী ও জ্ঞান-প্রেম-প্রদায়িনী মহাশক্তির উপাসনা প্রচার করিয়াছেন। যোগ ও জ্ঞানের গভীর তত্ত্বসমূহ সরল ও সরস করিয়া এবং ভক্তিপ্রেমে অভিষিঞ্চিত করিয়া তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে আধ্যাত্মিক শিক্ষার বিস্তার-সাধন করিয়াছেন।

ভারতের সকল স্থানেই নাথ-যোগিসম্প্রদায়ের মঠ-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত। তন্মধ্যে উত্তর-প্রদেশে গোরক্ষপুর সহরের উপকণ্ঠে গোরক্ষনাথ-মন্দিরের একটি বিশেষ ঐতিহ্য ও মর্য্যাদা আছে। কিংবদন্তী এই যে, যোগিগুরু গোরক্ষনাথ সুদীর্ঘকাল এই জঙ্গলাকীর্ণ বিজন স্থানে যোগতপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। তিনি কোন্ যুগে কতকাল এখানে সাধনা করিয়াছিলেন, তাহা নিরূপণ করা অবশ্যই অসম্ভব। তখন সহর ত দূরের কথা, নিকটে কোন লোকালয় ছিল কিনা, তাহাও সন্দেহ। গোরক্ষনাথের তপোভূমিকে কেন্দ্র করিয়াই লোক-বসতির বিস্তার হইয়াছে, কালক্রমে সহরও গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহার নামানুসারেই সহর ও অঞ্চলের নামকরণ হইয়াছে। গোরক্ষনাথের তপস্যার সময় হইতেই এই মঠ ও মন্দির বিদ্যমান, ইহা সকলেরই বিশ্বাস। দেশ, কাল ও অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে-সঙ্গে মঠের বাহ্যাকৃতির অবশ্যই বহুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। নিষ্কিঞ্চন যোগীর মঠে কতকটা বাহ্য ঐশ্বর্য্যেরও যোগ হইয়াছে। সারাবৎসর সাধু ও তীর্থযাত্রীর সমাগমে এবং সহর ও গ্রামের নৈকট্যহেতু স্থানটিকে আর নির্জ্জন তপস্যার স্থান বলা চলে না; কিন্তু গোরক্ষনাথের সময় হইতে গুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে আশ্রমের সাধনধারা অব্যাহত রহিয়াছে। ইহার গৌরব সর্ব্বজন-স্বীকৃত।

এই মন্দিরে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এখানে কোন দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত নাই—শিব-শক্তির কিংবা গোরক্ষনাথের

কোন বিশেষ মূর্ত্তি মন্দিরাভ্যন্তরে নাই। মন্দিরে আসন-বেদী আছে। সেখানেই পরমদেবতার উদ্দেশে নিয়মিত দৈনন্দিন পূজার্চ্চনা বিধিপূর্ব্বক হইয়া থাকে। বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া যে-কোন সাধক আপনার অভীষ্ট যে-কোন মূর্ত্তি স্মরণ বা কল্পনা করিয়া ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন কবিতে পারেন, কিংবা নিরাকার নিরঞ্জন ব্রহ্মের ধ্যানে ডুবিয়া যাইতে পারেন। বেদীটি যেন সর্ব্বাধার, সর্ব্বাধিষ্ঠান—সর্ব্ববিশেষবর্জ্জিত, সর্ব্ববিশেষাশ্রয় পরমপদ, পরমধাম। নিজ-নিজ ভাবাবেশ-অনুসারে যে-কোন উপাসক যে-কোন বিশেষ ভাবের খেলা সেখানে দর্শন ও আস্বাদন করিতে পারেন, অথবা সকল বিশেষের, সকল খণ্ড-সত্তার, সকল ভেদবৈষম্যের যে চরম ঐক্যভূমি, সেই অখণ্ড অনন্ত নির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দস্বরূপের নিবিড় ধ্যানে সমাহিত হইতে পারেন। গোরক্ষনাথের দার্শনিক মত 'দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিত' বলিয়াই প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার যথার্থ অনুবর্ত্তিগণ সকল দেবদেবীরই উপাসনায় বিশ্বাসী, আবার পরম তত্ত্বকে সমস্ত দ্বৈতাদ্বৈত-বিষয়ক মত-মতান্তরের ঊর্দ্ধে জানিয়া সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক বাদ-বিসংবাদ হইতে বিরত থাকেন। যোগিসম্প্রদায়েব এই কেন্দ্রীয় মন্দিরে বিশেষ বিগ্রহের অভাব যেন ইহার মতবাদের ও উপাসনার সর্ব্বজনীনতাই সূচিত করিতেছে। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, রামায়ত, গৃহী ও সন্ন্যাসী, সাকারোপাসক ও নিরাকার-সাধক, সগুণবাদী ও নির্গুণবাদী—সকলেই এই মন্দিরকে আপনার বলিয়া অনুভব করিতে

পারেন এবং আপন-আপন সংস্কার-অনুসারে এখানে আরাধনা করিতে পারেন।

'গোরক্ষসিদ্ধান্তসংগ্রহ'-নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে নাথ-তত্ত্ব এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—

নির্গুণং বামভাগে চ সব্যভাগেঽদ্ভুতা নিজা।
মধ্যভাগে স্বয়ংপূর্ণস্তস্মৈ নাথায় তে নমঃ॥
মুক্তাঃ স্তুবন্তি পাদাগ্রে নখাগ্রে জীবজাতয়ঃ।
মুক্তামুক্তগতের্মুক্তঃ সর্ব্বত্র রমতে স্থিরঃ॥
বামভাগে স্থিতঃ শম্ভুঃ সব্যে বিষ্ণুস্তথৈব চ।
মধ্যে নাথঃ পরং জ্যোতিস্তদ্ জ্যোতির্মত্তমোহরম্।

যাঁহার বামভাগে নির্গুণ এবং দক্ষিণভাগে স্বকীয়া অনির্ব্বচনীয়া মহাশক্তি এবং যিনি উভয় নির্গুণ ও সগুণ ভাবকে আলিঙ্গন করিয়া মধ্যভাগে স্বয়ংপূর্ণস্বরূপে বিরাজমান, সেই নাথকে নমস্কার। মুক্তপুরুষগণ যাঁহার পদাগ্রে নিত্য স্তুতিশীল এবং বদ্ধজীবগণ যাঁহার নখাগ্রে জন্মমৃত্যু-সুখদুঃখাদির অধীন হইয়া বিদ্যমান, যিনি স্বয়ং মুক্তগতি ও বদ্ধগতি হইতে নিত্যমুক্ত থাকিয়া সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে অচলপ্রতিষ্ঠভাবে পরমানন্দে বিরাজমান, সেই নাথকে নমস্কার। যাঁহার বাম-ভাগে শম্ভু এবং দক্ষিণভাগে বিষ্ণু এবং যিনি উভয়ের মধ্যে চিদানন্দ-জ্যোতিঃস্বরূপে বিরাজমান, সেই পরমজ্যোতি আমার অজ্ঞানান্ধকার নাশ করুন।

এই নাথই মন্দিরের দেবতা। তিনি সকল জীবেরই

হৃদয়মন্দিরের দেবতা, তিনি বিশ্বমন্দিরেরই দেবতা। তিনি নিত্য নির্গুণ হইয়াও নিত্য সগুণ, নিত্য নিষ্ক্রিয় হইয়াও নিত্য সক্রিয়, নিত্য এক হইয়াও নিত্য বহু, নিত্য সর্ব্বাতীত হইয়াও নিত্য সর্ব্বব্যাপী, সকল নামরূপের ঊর্দ্ধে থাকিয়াও সর্ব্বনামে ও সর্ব্বরূপে লীলায়মান। তাঁহারই স্বকীয়া মহাশক্তি তাঁহাকেই অধিষ্ঠান ও আশ্রয় করিয়া অনন্তকালে অনন্ত দেশে অনন্তভাবে আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়া চলিয়াছেন, অথচ এই নিয়ত ক্রিয়াশীলা মহাশক্তিকে বুকে করিয়াই তিনি নিত্য স্থির, অচল, অটল, আত্মসমাহিত ও আত্মানন্দে বিভোর। এই নাথই যোগী ও জ্ঞানীর নিত্য আরাধ্য, নিত্য জীবনাদর্শ। ভক্তিপূতহৃদয়ে এই নাথের আরাধনা করিয়া, জ্ঞানে এই নাথকেই পরমতত্ত্বরূপে উপলব্ধি করিয়া, যোগে সমগ্র জীবনকে নাথময় করিয়া সংসারের সর্ব্বপ্রকার বন্ধন, সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ ও কর্ম্মবিপাকাশয় হইতে সম্যক্ মুক্তিলাভই জীবনের লক্ষ্য। এই আদর্শই যোগিগুরু গোরক্ষনাথ ও তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ সকল সাধকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

এই নিত্যসত্য পরমতত্ত্ব নাথকে লক্ষ্য করিয়াই নাথমন্দিরে সেবা-পূজা ও সাধন-ভজনের বিধান। বাহ্যোপচারে বাহ্য পূজা হয়। ইহা বহিরঙ্গ-সাধনার অঙ্গ। যথার্থ মুমুক্ষু সাধকের পক্ষে দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, হৃদয় ও বুদ্ধি—সবই নাথপূজার উপকরণ। সকলই তাঁহার সেবায় উৎসর্গ করিতে হয়, সকলই তদ্ভাবে ভাবিত করিতে হয়, সমগ্র জীবনকে তন্ময় করিবার

জন্য নিয়ত প্রযত্নশীল হইতে হয়। তদুদ্দেশ্যেই ভক্তি, যোগ ও জ্ঞানের সর্ব্ববিধ সাধন-ব্যবস্থা।

সাধক যখন দীর্ঘকাল নিরন্তর সাধনা দ্বারা সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করেন, তখন তিনি নাথত্ব লাভ করেন, নিত্য নাথের সহিত ও পরমব্রহ্মের সহিত অভিন্নত্ব উপলব্ধি করেন। এই নাথত্ব-লাভই নাথ-যোগীদের সাধনার লক্ষ্য। যাঁহারা এই চরম সিদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হন, তাঁহাদিগকে 'অবধূত' বলা হয়। এইহেতু গোরক্ষনাথের সম্প্রদায়কে 'নাথ-যোগী', 'সিদ্ধ-যোগী' ও 'অবধূত' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। শিবকেই তাঁহারা আদিনাথ বলিয়া উপাসনা করেন। শিব সকল যোগীর গুরু, জ্ঞানীর গুরু, ভক্তের গুরু, প্রেমিকের গুরু—সকলের আদিগুরু—'স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ' (যোগসূত্র)। সিদ্ধ যোগী শিবস্বরূপত্ব লাভ করেন। গোরক্ষনাথ পূর্ণভাবে শিবস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সম্যক্ নাথত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্প্রদায়ের আরও অনেক যোগী যোগ ও জ্ঞানের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়া মানব-জীবনের চরম কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন। এইরূপ অনেক মহাসিদ্ধ মহাজ্ঞানীর নাম যোগগ্রন্থসমূহে দৃষ্ট হয়। প্রত্যেকটি মঠ ও মন্দির প্রথমতঃ যোগসাধনার কেন্দ্ররূপেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সাধকের অভাবে অনেক কেন্দ্রের পূর্ব্বগৌরব লুপ্ত হইয়াছে। গোরক্ষপুরের সংলগ্ন গোরক্ষনাথ-মঠ দীর্ঘকাল যোগসাধনার কেন্দ্ররূপে আপনার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল।

বর্ত্তমানেও এই মঠই উত্তর-ভারতের নাথ-যোগিসম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র।

মন্দির, মঠ, আশ্রম ও সম্প্রদায়-সম্পর্কে যাবতীয় ব্যাপার সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একজন মঠাধ্যক্ষ মনোনীত হন। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে সকল কার্য্য পরিচালিত হয়। তাঁহাকে গুরু গোরক্ষনাথের প্রতিনিধি বলিয়াই সাধু ও ধর্ম্মার্থী গৃহস্থগণ সম্মান করেন। তিনি মোহন্ত বা মহন্ত নামে সংবর্দ্ধিত হন। সাধারণ রীতি-অনুসারে গুরুশিষ্যপরম্পরাক্রমেই মোহন্তের নির্ব্বাচন বা নিয়োগ হইয়া থাকে। মোহন্তের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন, শাস্ত্রজ্ঞান, আদর্শনিষ্ঠা, চরিত্রবল ও ব্যক্তিত্বের প্রভাবের উপরই প্রতিষ্ঠানের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বাতাবরণ, সুশৃঙ্খল বিধিব্যবস্থা, পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য এবং জনসাধারণের উপর ইহার প্রভাব প্রধানতঃ নির্ভর করে। অনেক ধর্ম্ম-পিপাসু ও যোগজ্ঞানপিপাসু মুমুক্ষু যুবক সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক সাধ্যসাধন-তত্ত্বসম্বন্ধে শিক্ষা এবং যোগসাধনার অনুকূল আবেষ্টনী লাভ করিবার উদ্দেশ্যে আশ্রমে আসিয়া থাকে ও মঠাধ্যক্ষের শরণাপন্ন হয়। তাহাদের আধ্যাত্মিক পিপাসা চরিতার্থ করিবার সুচারু ব্যবস্থা করা মঠাধ্যক্ষের প্রধান কর্ত্তব্য। মঠ-প্রতিষ্ঠার ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ব্যবস্থার অভাব হইলেই প্রতিষ্ঠানের প্রাণশক্তিরও অভাব হইয়া থাকে। মোহন্তের যোগ্যতার উপরই এইসব বিধি-ব্যবস্থা প্রধানতঃ নির্ভর করে।

এসব বিষয়ে গোরক্ষপুর-কেন্দ্রের গোরক্ষনাথ-মঠের একটি

বিশেষ খ্যাতি দীর্ঘকাল যাবৎ অক্ষুণ্ণ ছিল। অনেক প্রভাবশালী যোগী ইহার মোহন্তপদে আরূঢ় হইয়াছেন এবং অসাধারণ যোগ্যতার সহিত যোগিগুরু গোরক্ষনাথের আদর্শ জনসমাজে প্রচার করিয়াছেন। এই মঠে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া অনেক যোগসাধক কঠোর সাধনা দ্বারা কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের ত্যাগবৈরাগ্য ও যোগবিভূতি দর্শন করিয়া এবং মাধুর্য্যময় চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া অনেক ধর্ম্মার্থী যোগপথে আকৃষ্ট হইয়াছেন। মঠের যোগসাধকগণ তীর্থপর্য্যটন-উপলক্ষ্যে দূরদূরান্তরে গমন করিয়া ইহার মহিমা খ্যাপন করিয়াছেন। কোন কোন সাধক যোগসাধনার সমুন্নত সোপানে আরোহণ করিয়া সিদ্ধযোগিরাট্ হইয়াছেন। এইরূপে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া গোরক্ষনাথের তপঃপূত পবিত্রক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত এই মন্দির ও আশ্রম অক্ষুণ্ণ প্রাণশক্তির সহিত, যোগসাধনার আদর্শ প্রচার করিয়া গৌরবমণ্ডিত হইয়াছে। দেশে ইহার খ্যাতিও বিস্তৃত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। বাবা গোপালনাথ তখন মোহন্তের গদীতে সমাসীন। একজন প্রভাবশালী যোগী বলিয়া তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আশ্রমে তখন বাহ্য চাকচিক্য কমই ছিল। আধুনিকতার আড়ম্বর কিছুমাত্র ছিল না। সংসারত্যাগী ভোগবিমুখ সাধুগণই আশ্রমে বাস করিতেন। প্রতি মঙ্গলবার সহর হইতে ধর্ম্মপ্রাণ গৃহস্থগণ শ্রীনাথজীর আসনের সম্মুখে প্রণাম ও পূজা করিতে যাইতেন। পর্ব্বাদি উপলক্ষ্যে গ্রামাঞ্চল ও দূরদূরান্তর হইতে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম

হইত। আশ্রমে কোন পাকা ইমারত হয় নাই, নাগরিক সভ্যতারও প্রভাব বিস্তার হয় নাই। সাধুদের বাসের নিমিত্ত, অভ্যাগতদের সম্বর্দ্ধনার নিমিত্ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর ছিল। আগন্তুক সাধুদের সেবার জন্যে যথোচিত ব্যবস্থা ছিল। আশ্রমের চতুষ্পার্শে আমবাগান, ফুলবাগান ও স্বাভাবিক বৃক্ষলতার অরণ্য। স্থানটি প্রাচীন তপোভূমির আদর্শেই রক্ষিত হইত। বহির্জ্জগতের কোলাহলের সহিত ইহার কোন যোগ ছিল না। সাধুগণ নিজ নিজ সাধন ভজন এবং মন্দিরের সেবা পূজা লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন। পর্য্যটক সাধুদের এবং তীর্থযাত্রীদের মুখে মুখে গোরক্ষপুরের গোরক্ষনাথ-মন্দির এবং যৌগিক প্রভাব-সম্পন্ন মন্দিরাধ্যক্ষের সুনাম বহুদূরবর্ত্তী ধর্ম্মার্থীদেরও শ্রুতিগোচর হইত।

একদিন এই মন্দিরে এক যুবাপুরুষের আবির্ভাব হইল। তাঁহার আকার প্রকারে এমনই কিছু অসাধারণত্ব ছিল, যাহাতে আশ্রমস্থ সাধুদের বিশেষ দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। তাঁহার সমুন্নত সুগঠিত দেহ, প্রশস্ত ললাট, প্রশস্ত বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু, উন্নত নাসিকা, সুকোমল রক্তবর্ণ করতল ও পদতল, সুগোল ও সুদীর্ঘ অঙ্গুলি সমূহ,—প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গেই এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, যাহাতে তাঁহাকে একজন সাধারণ ব্যক্তি বলিয়া মনে করা চলিত না। চক্ষুদ্বয় হইতে যেন এক দিব্যজ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে, অথচ চাহনীর মধ্যে কেমন একটি উদাস ও করুণ ভাব। নবযৌবনের অসাধারণ রূপলাবণ্যের

সহিত প্রধান যোগিপুরুষোচিত অসাধারণ গাম্ভীর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ, বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ন্যায় মর্য্যাদাবোধ ও শিষ্টাচার, তাহার সহিত দীন শিক্ষার্থীর ন্যায় কমণীয় বিনয়। সাধুগণ সকলেই আগন্তুক যুবককে দেখিয়া বিমোহিত হইলেন। তাঁহার পরিধানে মূল্যবান্ রেশমী বস্ত্র ছিল ; বেশভূষা এক ধনী সম্ভ্রান্ত বংশের শিক্ষিত তরুণের মত ; মুখমণ্ডল শ্মশ্রুবিহীন কিন্তু সুন্দর গুম্ফ শোভিত। অথচ এ সকলের মধ্যে কোথাও কোন কৃত্রিমতার লক্ষণ নাই, বিলাসিতা বা দাম্ভিকতার পরিচয় নাই।

আশ্রমবাসী সাধুগণ প্রথমতঃ মনে করিলেন, কোন সম্ভ্রান্ত ধনিসন্তান সৌখীন তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়াছেন, দর্শন ও প্রণাম করিয়াই চলিয়া যাইবেন। আগন্তুক যুবক আসনস্থ অদৃশ্য দেবতার সম্মুখে ভক্তিবিনীত হৃদয়ে প্রণত হইলেন, সাধুদিগকে অভিবাদন করিলেন, কিন্তু চলিয়া যাইবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার হাব্-ভাবে বোধ হইল, যেন তিনি আশ্রমে থাকিবার জন্যই আসিয়াছেন। তিনি কি যেন কি অনুসন্ধান করিতেছেন, কিসের জন্য যেন প্রতীক্ষা করিতেছেন! সাধুগণ তাঁহার পরিচয় ও উদ্দেশ্য জানিবার জন্যে উৎসুক হইলেন। কিন্তু গম্ভীরাত্মা যুবক কোন কথাই বলেন না, কাহারো কোন কথার উত্তর দেন না ; অথচ তাঁহার ব্যবহারে ঔদ্ধত্যের লক্ষণ বিন্দুমাত্রও নাই। তাঁহার কোন পরিচয়ই তাঁহার নিকট হইতে পাওয়া গেল না। তিনি ধীরভাবে মোহান্ত মহারাজের দর্শনপ্রার্থী হইলেন।

মোহান্ত মহারাজ সম্ভ্রান্ত যুবককে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। উভয়ের মধ্যে মৃদুভাবে কি কথাবার্ত্তা হইল, তাহা কেহই জানিতে পারিলেন না। মন্দির সেবকগণ মোহান্ত মহারাজের নিকট হইতে অবগত হইলেন যে, এই তরুণ যুবক যোগার্থী,—বৈরাগ্যের প্রাবল্যে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, অন্তরে তাঁহার অসাধারণ তত্ত্বজ্ঞান পিপাসা, যোগ সাধনায় দীক্ষিত হইবার জন্যে তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল। সাধুগণ বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। এরূপ সম্ভ্রান্ত পরিবারের বুদ্ধিমান্ বলীয়ান্ শিক্ষিত যুবকের চিত্তে এই কঠোর বৈরাগ্য ও সুতীব্র যোগ-পিপাসার উদয় হইল কেন? কেন তিনি সব সাংসারিক অভ্যুদয়ের ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের আশা বিসর্জ্জন দিয়া অজানা বিঘ্ন-সঙ্কুল পথে যাত্রা করিতে চাহিতেছেন? আশ্রমের বৃদ্ধ যোগীগণ তাঁহাকে এই সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া ঘরে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন। এই পথে কত কায়ক্লেশ, কত বাধাবিপত্তি, কত নিদারুণ পরীক্ষার পর পরীক্ষা! শাস্ত্র এই পথকে শাণিত ক্ষুরধারের সহিত তুলনা করিয়াছেন,—"ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম-পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি"। যুবক সবিনয়ে নতশিরে বৃদ্ধদের উপদেশ শ্রবণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার সংকল্পের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। যোগপথের বিভীষিকার কথা শুনিয়া তাঁহার অন্তরে কোন প্রকার ভয়ের উদয় হইল না, তাঁহার চিত্তে কোন দুর্ব্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। তিনি কোন তর্ক-বিতর্কে যোগ দেন না, কোন কথার প্রতিবাদ করেন না,

বিনয়মণ্ডিত গাম্ভীর্য্যের সহিত সকলের সকল কথা, সকল যুক্তি-বিচারই শ্রবণ করেন। অথচ তাঁহার সিদ্ধান্তের কোন ব্যতিক্রম হয় না, ভাবের কোন বৈলক্ষণ্য হয় না। বিচারশীল সাধুগণ দেখিলেন, যে, যোগাচার্য্য মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসূত্রে যাহাকে 'অধিতীব্র সংবেগ' আখ্যা দিয়াছেন, তাহা লইয়াই যুবক গৃহত্যাগ করিয়াছেন এবং যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হইতে চাহিতেছেন।

যোগার্থী যুবক আশ্রমে রহিয়া গেলেন। ধীরে ধীরে বিনা আড়ম্বরে মূল্যবান্ বস্ত্রসমূহ বিতরণ করিয়া দিয়া দীন যোগীবেশ ধারণ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে টাকা-পয়সাও ছিল। কতকাংশ গরীব দুঃখীদিগকে দান করিলেন, কতক সাধুদের সেবায় ব্যয় করিলেন, অবশিষ্ট সব গুরুর চরণে উৎসর্গ করিয়া দিলেন, নিজে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কিঞ্চন হইলেন। সাধুজীবনেও যে অর্থের কথঞ্চিৎ প্রয়োজন হইতে পারে, এই বিচারই তাঁহার নাই। অর্থের প্রতি মমতা বা আসক্তি তাঁহার বিন্দুমাত্রও ছিল না। সাধুদের ধারণা হইল যে, পূর্ব্ব হইতেই তিনি দানে মুক্তহস্ত ছিলেন, এবং সাধুসেবায় ও দীন দুঃখীদের সেবায় তাঁহার একটা গভীর আনন্দবোধ ছিল। সেবাকর্ম্মে নিপুণতাও তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই অর্জ্জিত ছিল বলিয়াই মনে হইত। হঠাৎ গার্হস্থ্যজীবন ছাড়িয়া আসিয়া যোগীর আশ্রমে প্রবেশ করিলেও, এই নূতন আবেষ্টনীর সহিত আপনাকে মিলাইয়া লইতে এবং ভিক্ষাজীবী সাধুদের 'রুখা-শুখা' আহারে অভ্যস্ত

হইতে, তাঁহার যে বিশেষ ক্লেশ হইতেছে, তাহাও তাঁহার হাব-ভাবে অনুমান করা যাইত না। তাঁহার অসাধারণ গাম্ভীর্য্যের সহিত সদাসুপ্রসন্ন ভাব, সেবানৈপুণ্যের সহিত সর্ব্বদা-উদাস ভাব, কর্ম্মকুশলতার সহিত ধীরস্থির আত্মভোলা ভাব, সাধুগণ বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতেন।

অল্পকাল মধ্যেই এই তরুণ যোগার্থীর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য, শুধু আশ্রমের সাধুদের নহে, যে সব সজ্জন আশ্রমে অনেক সময় আসা-যাওয়া করিতেন, তাঁহাদেরও সশ্রদ্ধ কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। অনেকেই তাঁহার পূর্ব্বজীবনের ঘটনা জানিবার জন্যে সমুৎসুক হইতেন। অনেকে কথাপ্রসঙ্গে তাঁহাকে জিজ্ঞাসাবাদও করিতেন। কিন্তু গম্ভীর পুরুষের মুখ হইতে তাঁহার জীবন সম্বন্ধে কোন কথাই প্রায় শোনা যাইত না। কথাবার্ত্তা ত তিনি প্রায় বলিতেনই না, নামধামও বলিতেন না, যাহা কিছু বলিতেন, তাহা হয় কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্বন্ধে, নচেৎ সাধ্যসাধন বিষয়ক কোন তত্ত্ব সম্বন্ধে। সামান্য দু-একটি কথাতেই তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, বিচারের গভীরতা, শাস্ত্রবাক্যের মর্ম্মোদ্‌ঘাটনের অদ্ভুত ক্ষমতা, জীবনের চরম লক্ষ্যসাধনে সংকল্পের দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া যাইত। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার জীবন যে আধ্যাত্মরাজ্যের উন্নত সোপানে সমারূঢ় এবং যোগসাধনায় চরম সিদ্ধিলাভে তিনি যে সর্ব্বতোভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন, এ বিষয়ে কাহারো কোন সন্দেহ থাকিত না।

নানাপ্রকার অনুসন্ধানে নবীন যোগার্থীর বাল্য ও কৈশোর সম্বন্ধে যতটুকু তথ্য সংগৃহীত হইল, তাহা সংক্ষেপতঃ এই—তিনি কাশ্মীরে জম্মুর নিকটবর্ত্তী কোন এক পল্লীগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রামের বিদ্যালয়েই তিনি শিক্ষালাভ করেন। তখন সে প্রান্তে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন হয় নাই। মাতৃ-ভাষায় তিনি সাধারণ বিদ্যাভ্যাস করেন। সংস্কৃত সামান্যই শিখিয়াছিলেন। বাল্যে বা কৈশোরে অর্থের অভাব তাঁহাকে অনুভব করিতে হয় নাই। অন্নবস্ত্রের ক্লেশ বা দারিদ্র্যের পেষণের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে নাই। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেরা সচ্ছল সংসারে যে ভাবে লালিত-পালিত বৰ্দ্ধিত হয়, তাঁহার জীবনের বিকাশও সেই ভাবেই হইতেছিল। কোন নিদারুণ শোকতাপের আঘাতও বালককে সহ্য করিতে হয় নাই। তিনি আনন্দের সহিতই লেখাপড়া শিখিতেছিলেন, খেলাধূলা করিতেছিলেন, দেহমনের উৎকর্ষ সাধন করিতে-ছিলেন। রসচর্চ্চার প্রতিও তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি অল্প বয়সেই গান-বাজনাও শিখিয়াছিলেন। সেতার বাজাইয়া ভজন করিতে পটুত্ব অৰ্জ্জন করিয়াছিলেন। পোষাক পরিচ্ছদে তিনি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতেন। দেহে তাঁহার যেমন অপরূপ লাবণ্য ছিল, তেমনি অসাধারণ বলও ছিল। সাধারণ বালকদের সহিত মেলামেশা করিলেও, তাঁহার সকল ব্যবহারে একটা সম্ভ্রান্তজনোচিত মার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাওয়া যাইত। তিনি সকলকেই ভালবাসিতেন, এবং

সকলেরই ভালবাসা পাইতেন। কাহাকেও সেবা করিবার সুযোগ পাইলে, কাহারো কোনরূপ সাহায্য করিতে পারিলে, তিনি বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিতেন। পশুপাখী কীট-পতঙ্গের প্রতিও তাঁহার যেন একটা স্বাভাবিক সহানুভূতি ছিল। তৎসঙ্গে তাঁহার অদম্য সাহস ছিল, সংকল্পের দৃঢ়তা অসাধারণ ছিল, ভয়ের সঙ্গে তাহার বিশেষ পরিচয় ছিল না। সমবয়স্ক বালবালিকাদের সহিত সমানভাবে লেখাপড়া ও খেলাধূলা করিলেও, তাঁহার একটা বৈশিষ্ট্য তাঁহার সাথীরা সকলেই অনুভব করিত।

কিশোর বয়সেই তাঁহার চিত্তে এক অভিনব ভাবের বিকাশ হইতে লাগিল। তাহার অন্তরাত্মা যেন কি চায়, যাহা চতুষ্পার্শ্বে কোথাও তিনি দেখিতে পান না। সংসারে তিনি ধনীমানী গুণী জ্ঞানী অনেক লোক দেখেন; কিন্তু এসকলের কোন কিছুর উপরই তাঁহার কোন আকর্ষণ হয়না। তাঁহার সম্মুখে ধন-মান লাভের পথ প্রশস্ত, সংসারিক জীবনের সুখ-সম্ভোগের পথ তাঁহার সামনে উন্মুক্ত ;—কিন্তু তাঁহার হৃদয় এসব কিছুই চায় না। সবই তাঁহার নিকট অকিঞ্চিৎকর বোধ হয়। কিছুই তাঁহার ভাল লাগে না। তাঁহার মনে হয়, সংসারের কোন ভোগ্য সামগ্রীই তাঁহাকে তৃপ্তি দিতে পারিবে না, তাঁহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারিবে না। তাঁহার অন্তরের অভাববোধ ক্রমেই তীব্র তীব্রতর হইতে লাগিল। প্রচলিত জ্ঞানের তিনি অনুশীলন করেন, কিন্তু

তাহাতে রুচিবোধ হয় না। টাকা-পয়সা নিয়া তিনি ব্যবহার করেন, কিন্তু তাহার প্রতি বিন্দুমাত্রও আসক্তি বা লোভ হয় না। আহারাদি স্বাভাবিক নিয়মে অভ্যাসবশে করিয়া যান, কিন্তু কোন পদার্থের প্রতি রসনার কোন লালসা হয় না। সাথী-সঙ্গীদের সহিত মেলামেশা করেন, কিন্তু তাহাতে তেমন আনন্দবোধ হয় না। কোন্ অজানার আকর্ষণে কিশোর বালকের মনকে যেন উন্মনা করিয়া তুলিয়াছে।

তাঁহার জন্মভূমির অনতিদূরে একটি বহুকালের শ্মশান-ভূমি ছিল। সেখানে নিষ্কিঞ্চন সাধু-সন্ন্যাসী যোগী-তপস্বীদের সাময়িক বসবাসের জন্য কথঞ্চিৎ বিধিব্যবস্থাও ছিল। পর্য্যটক সাধুগণ মাঝে মাঝে সেখানে গিয়া আশ্রয় লইতেন, বিশ্রাম করিতেন, ধর্ম্মপিপাসু গৃহস্থদের সেবা গ্রহণ করিতেন। শ্মশানক্ষেত্র বলিয়াই গ্রামের লোকেরা সেদিকে যাতায়াত খুব কমই করিত। বৈরাগ্যের উন্মাদনায় কিশোর বালক সেখানে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। তিনি অনেক সময় জনকোলাহলবিহীন শ্মশানপ্রান্তে চুপচাপ বসিয়া থাকিতেন, সাংসারিক জীবনের পরিণাম তাঁহার চিত্তে ভাসিয়া উঠিত। সংসারকে বস্তুতঃ যেন শ্মশানযাত্রা বলিয়াই তাঁহার প্রতীতি হইতে লাগিল। সবই অনিত্য, সবই দুঃখময়। পরাশান্তির পথ কোথায়? এই সব সংসারত্যাগী যোগী সন্ন্যাসীরাই কি যথার্থ শান্তিপথের যাত্রী? পরাশান্তি লাভের নিমিত্ত সংসার ত্যাগই যে অত্যাবশ্যক, এই ধারণা ক্রমেই তাঁহার

চিত্তে দৃঢ় হইতে লাগিল। তিনি ঘনিষ্ঠভাবে আগন্তুক সাধুদের সঙ্গ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি তাঁহাদের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করিতেন, তাঁহাদের সেবা করিতেন, তাঁহাদের রুটির ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, তাঁহাদের ধূনীর জন্য কাষ্ঠ বহন করিয়া দিতেন, নানাভাবে তাঁহাদের যথাসম্ভব স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের প্রচেষ্টা করিতেন। সাধুসেবা করিয়া, সাধুদের সহিত আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়া তাঁহার চিত্তে অনেকটা শান্তিবোধ হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে বৈরাগ্যও তীব্রতর হইতে লাগিল, সংসার ত্যাগের সংকল্পও দৃঢ়তর হইতে লাগিল। কখন কখন সাধুদের সঙ্গে শ্মশানেই তিনি রাত্রি কাটাইয়া দিতেন, কখন কখন অধিক রাত্রিতে গৃহে ফিরিতেন। আত্মীয় স্বজনের প্রতিবাদ বা ভর্ৎসনা তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। সাধুজীবনে তিনি অভ্যস্ত হইতে লাগিলেন, সাধুজীবনের প্রতি তাঁহার আকর্ষণও বাড়িতে লাগিল। সাধুদের সঙ্গে অনেক শাস্ত্রীয় তত্ত্বের সহিত তাঁহার সুষ্ঠু পরিচয় হইল, গীতা ও যোগবাশিষ্ঠের প্রতি তিনি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইলেন।

নবীন যুবক সংসার ও শ্মশানের সহিত যোগ রাখিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন। তিনি প্রয়োজনমত সংসারের কাজকর্ম্ম করিতেন, আত্মীয়-স্বজনের সেবা করিতেন, কিন্তু তাহাতে কোন রস পাইতেন না। অধ্যয়নাদি কিছু কিছু করিতেন; কিন্তু ধর্ম্মগ্রন্থ, বিবেকবৈরাগ্যমূলক গ্রন্থ ছাড়া অন্য কোন পুস্তক তাঁহার ভাল লাগিত না। তিনি গান বাজনার

চর্চ্চা করিতেন, কিন্তু ভজন সঙ্গীত ব্যতীত আর কিছুতে তাঁহার রুচি ছিল না। সেতারের সুরে তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন। তাঁহার মন যেন সর্ব্বদাই শ্মশানের দিকে আকৃষ্ট হইত। শ্মশানেশ্বর সর্ব্বত্যাগী মহাযোগী শিব ছিলেন তাঁহার জীবন-দেবতা, তাঁহার হৃদয়ের আরাধ্য; সর্ব্বদা তাঁহারই আকর্ষণ তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেন। অনেক সময় তাঁহার চিন্তায় তিনি ডুবিয়া যাইতেন। সংসারের কাজকর্ম্মের ভিতরে, ভোগসুখের ভিতরে, সর্ব্বদা সেই ভাবই তাঁহার চিত্তে উদিত হইত, যাহা যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্রেয়ীর মুখে অনুপম ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছিল,—"যেনাহংনামৃতা স্যাম্, কিমহং তেন কুর্য্যাম্"। তাঁহার অন্তরের আর্ত্তনাদ বাড়িয়াই চলিল। অথচ আত্মীয়-স্বজন সঙ্গী-সাথী কারো কাছেই তিনি হৃদয়ের অন্তর্নিহিত গোপন বেদনা স্বেচ্ছায় বাহ্যতঃ ব্যক্ত করিতেন না। তাঁহার গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, দৃষ্টি ক্রমেই উদাসীন হইতে লাগিল। কিন্তু কর্ত্তব্যকর্ম্মে তিনি কখনো শৈথিল্য করিতেন না, বেশভূষায় কোন ঔদাসীন্য দেখাইতেন না, অন্তরের বিবেক ও বৈরাগ্যের আগুন অন্তরেই চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতেন। অবকাশ পাইলে নির্জ্জনে নিজের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেন। শ্মশানে বিবেক-বৈরাগ্যপরায়ণ ধ্যান-সমাধিনিষ্ঠ সাধু পাইলে, সঙ্গ করিতেন, সেবা করিতেন, শাস্ত্রালোচনা করিতেন, সাধ্যসাধন রহস্য শিখিয়া লইতেন।

সাংসারিক জীবন ক্রমেই এই তরুণ যুবকের অসহ্য বোধ

হইতে লাগিল। কোন্ পূর্ব্বার্জ্জিত সংস্কার যেন উদ্বুদ্ধ হইয়া ভিতর হইতে প্রবল তাড়না আরম্ভ করিল। কোন্ পূর্ব্ব স্মৃতি জাগরুক হইয়া তাঁহাকে যেন নিবিড় যোগ সাধনার পথে সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিল। বিবেক ও বৈরাগ্যের তীব্র দহন সংসারের প্রতি তাঁহার সর্ব্বপ্রকার আকষণ ও সর্ব্বপ্রকার কর্ত্তব্যবোধ সমূলে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। তাঁহার লক্ষ্য নিরূপণ পূর্ণ হইল ; তাঁহার জীবন-পথ তিনি স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। তাঁহাকে সংসারের সর্ব্ববিধ সংশ্রব ত্যাগ করিতেই হইবে, যোগ-পথের পথিক হইতেই হইবে, পরাশান্তি লাভের উদ্দেশ্যে সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিতেই হইবে, চরম জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত করা চলিবে না,—এ বিষয়ে তাঁহার চিত্তে কোন সংশয় রহিল না। তিনি পুনঃ পুনঃ তীক্ষ্ণ বিচারের দ্বারা নিজের চিত্তকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইয়া তিনি গৃহত্যাগী ও যোগ-সাধক হইবার জন্যে প্রস্তুত হইলেন।

কিন্তু এক সমস্যা উপস্থিত হইল। তিনি সাধুদের মুখে শুনিয়াছেন, ধর্ম্মগ্রন্থে পড়িয়াছেন, যে, উপযুক্ত পথপ্রদর্শক বিনা যোগপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। সিদ্ধগুরুর সহায়তা ব্যতীত যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব নয়, অন্তরে যোগের প্রবল সংস্কার থাকিলেও এবং দেহমন যোগের অনুকূলভাবে সুগঠিত হইলেও সাধনাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সম্যক্ সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সামর্থ্যসম্পন্ন গুরুর আশ্রয় গ্রহণ একান্ত আবশ্যক।

এরূপ সমর্থগুরু কোথায় মিলিবে? কোথায় তিনি গুরুর অনুসন্ধান করিবেন? কে তাঁহার যোগপথের পদপ্রদর্শক হইবেন?

এই সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত তাঁহাকে বেশী ভাবিতেও হইল না, খুঁজিতেও হইল না, বেশী দিন প্রতীক্ষা করিতেও হইল না। শ্মশানেই ইহার সমাধান মিলিল। সেই শ্মশানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ত্যাগী সাধুদেরই যাতায়াত ছিল। নাথ-যোগি-সম্প্রদায়ের এক প্রবীণ সাধুর সহিত সেখানেই তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। পর্য্যটনের পথে সেই সাধু মাঝে মাঝে উক্ত শ্মশানে আসিয়া বিশ্রাম কবিতেন। তাঁহার ত্যাগময় অনাসক্ত জীবন, নিত্যনিরন্তর ধ্যাননিষ্ঠ চিত্তবৃত্তি ও যোগসাধন সম্বন্ধ গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া যোগার্থী যুবক তাঁহার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেন। প্রবীণ যোগীও নবীন যোগার্থীর প্রতি বিশেষ স্নেহশীল হন। যোগার্থীকে যোগ সাধনায় শিক্ষা দিবার জন্যেই যেন মহাত্মা সেই শ্মশানে মাস-খানেক অবস্থান করেন। তাঁহার প্রসাদে নবীন যোগশিক্ষার্থীর সাধ্যসাধন সম্পর্ক অনেক শিক্ষালাভ হইল। যুবক তাঁহাকেই গুরুরূপে বরণ করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কিন্তু প্রবীণ যোগী গুরুপদ স্বীকার করিলেন না। তিনি তাঁহাকে গোরক্ষপুরের গোরক্ষনাথ মন্দির এবং তাহার মোহান্ত বাবা গোপালনাথজীর কথা বলিলেন। প্রভাবশালী সিদ্ধযোগী বাবা গোপালনাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতেই তাঁহাকে

উপদেশ দিলেন। কাহার প্রেরণায় এই ত্যাগী মহাত্মা এই শ্মশানে আসিয়াছিলেন, কে জানে? নবীন যোগার্থীকে উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সেখানকার কার্য্য শেষ হইল। তিনি অনির্দ্দেশ যাত্রায় চলিয়া গেলেন। যোগার্থীও আপনার উদ্দেশ্যের এবং যাত্রাপথের কোন সন্ধান কাহাকেও না দিয়া, চিরাভ্যস্ত বেশভূষা লইয়াই গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যথাসময় আকস্মিক ভাবে তিনি গোরক্ষপুরে গোরক্ষনাথ মন্দিরে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং বাবা গোপালনাথকে গুরুপদে বরণ করিলেন।

কৌতুহলী সাধুগণ ও ভক্তগণ বিশেষ অনুসন্ধানেও তাঁহার পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধ ইহার অধিক কোন সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না।

তৃতীয় অধ্যায়

যোগদীক্ষা

সূক্ষ্মদর্শী প্রৌঢ় যোগী বাবা গোপালনাথ নবীন শিক্ষার্থীকে দেখিয়া যোগসাধনক্ষেত্রে তাঁহার অনন্যসাধারণ অধিকার সহজেই বুঝিতে পারিলেন। যে কোন গুরুর ভাগ্যে এরূপ শিষ্যলাভ কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে। যোগশিক্ষার্থীর প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গেই যোগীর লক্ষণ বিদ্যমান। তাঁহার দেহখানি যেন যোগসাধনার জন্যই নির্ম্মিত হইয়াছে। যোগশাস্ত্রে শ্রেষ্ঠ যোগীদের দেহাবয়বের যেরূপ লক্ষণ বর্ণিত আছে, তাঁহার মস্তক হইতে পদতল পর্য্যন্ত প্রত্যেক অবয়বে সেই সব লক্ষণ দেদীপ্যমান। কোথাও যেন বিধাতা কোন খুঁত রাখেন নাই। তাঁহার 'দীর্ঘ-আয়ত-স্নিগ্ধ-মধুর-শান্ত-শীতল মূর্ত্তি' দর্শকমাত্রেরই চিত্তাকর্ষক। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, সমুন্নত বক্ষঃস্থল, অস্থূল উদর ও নাভিস্থল, আজানুলম্বিত বাহুযুগল, সুরক্তিম করতল ও চরণতল, সুকোমল অথচ সুদৃঢ় মাংশপেশী,—সবই মহান্ পুরুষের লক্ষণ। তাঁহার চক্ষু দুটীতে অপূর্ব্ব দীপ্তির সহিত অপূর্ব্ব কমনীয়তা সংমিশ্রিত। দৃষ্টি স্থির গম্ভীর প্রশান্ত উজ্জ্বল। মুখমণ্ডলে বিনম্র ভাবের মধ্যে সংকল্পের অনমনীয়তার নিদর্শন সুস্পষ্ট। কোথাও কোন যৌবনসুলভ প্রসন্নতা বা হাল্‌কা ভাবের লেশমাত্রও নাই।

গুরু দেখিলেন, শিক্ষার্থীর প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে বিবেক ও বৈরাগ্যের অনল নিত্য প্রজ্বলিত। অনেক যোগার্থী তাঁহার নিকট আসিয়াছেন, অনেক যোগসাধকের সহিত তাঁহার নিবীড় পরিচয় আছে। কিন্তু এতাদৃশ বিবেক বৈরাগ্য, এরূপ সংকল্পের দৃঢ়তা, সিদ্ধিলাভের জন্য এই প্রকার তীব্র সংবেদন, এবং তৎসঙ্গে এই প্রকার প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য ও চরিত্র-মাধুর্য্য তিনি কমই দেখিয়াছেন। যুবক যে দু'একটি কথা বলেন, তাহার মধ্যে তাঁহার অসামান্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, যে দু'একটি প্রশ্ন করেন, তাহার মধ্যেও তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি এবং সাধ্যসাধনতত্ত্বে তাঁহার গভীর অনুপ্রবেশের নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রবীণ গুরুর সুদৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, এরূপ অসাধারণ যোগাধিকারীর পক্ষে সাধারণ গার্হস্থ্যজীবন যাপন করাও অসম্ভব, সাধারণ সাধুদের ন্যায় মঠে মন্দিরে আশ্রমে মণ্ডলীর মধ্যে অল্প কিছু সাধন ভজন বা ধ্যানাভ্যাস যোগাভ্যাস লইয়া সন্তুষ্ট থাকাও অসম্ভব। সম্যক্ অভীষ্ট সিদ্ধি ব্যতীত, যোগের চরম সীমায় উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত, এ সাধক কিছুতেই তৃপ্ত থাকিতে পারিবে না। এ যোগার্থী অনন্যসাধারণ। বাবা গোপালনাথ যোগশাস্ত্রের বিধান এবং আপনার অভিজ্ঞতা অনুসারে তরুণ যোগার্থীকে যোগমার্গে দীক্ষিত করিতে ও তাঁহার সাধনাকে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

যোগমার্গের আলোচনায় দৃষ্ট হইয়াছে যে, প্রথমতঃ যম ও নিয়মের অনুশীলন দ্বারা যোগার্থীর দেহেন্দ্রিয়মনবুদ্ধি সুনিয়ত

যোগাভ্যাসের অনুকূল করিয়া লইতে হয়। অল্প দিনেই ইহা প্রমাণিত হইল যে, যম ও নিয়ম এই অসাধারণ যোগশিক্ষার্থী যুবকের প্রায় স্বভাবসিদ্ধ। দশবিধ যম ও দশবিধ নিয়মের প্রত্যেকটিই তাঁহার জীবনে যেন স্বাভাবিক ভাবেই বর্ত্তমান। মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ কাহারো প্রতি কোন প্রকার হিংসা বা অনিষ্ট সাধনের ভাব তাঁহার চিন্তায় বাক্যে বা ব্যবহারে স্থান পায় না। কোন প্রকার অসত্য, কপটতা বা মিথ্যাচার তাঁহার জীবনের কোন বৃত্তিকে স্পর্শ করিতে পারে না। পর-দ্রব্যে লোভ ত দূরের কথা, সংসারের কোন দ্রব্যের প্রতিই তাঁহার বিন্দুমাত্র লালসা নাই। সর্ব্বভূতে অনুকম্পা ও সহানুভূতি তাঁহার চরিত্রের অঙ্গীভূত। ক্ষমা তাঁহার ব্যবহারে এমন স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পায়, যেন কাহারো কোন অপরাধই তিনি অপরাধ বলিয়া গ্রহণ করেন না। ধৈর্য্য তাঁহার অপরিমেয়, তাঁহার প্রসন্নভাব কোন অবস্থাতেই ক্ষুন্ন হয় না। তাঁহার দেহ মন পবিত্রতায় ভরপুর। শৌচাচারের বিধি তিনি কখনো লঙ্ঘন করেন না। ব্রহ্মচর্য্যে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। বীর্য্য তাঁহার অস্খলিত। শীতাতপ-বাত-বর্ষাদি এবং সর্ব্ববিধ ক্লেশ সহ্য করিতে তাঁহার দেহেন্দ্রিয় অভ্যস্ত। জাগতিক সর্ব্বাবস্থায় তাঁহার চিত্ত-সন্তোষ অব্যাহত, কেবলমাত্র জীবনের চরমকল্যাণ লাভ না হওয়াতেই তীব্র অসন্তোষ। শাস্ত্রে, গুরু ও ঈশ্বরে স্বভাবতই তিনি বিশ্বাসী। দেবপূজায় তিনি আস্থাবান্। দানে ও সেবায় তাঁহার স্বাভাবিক আনন্দ। কোনপ্রকার পাপ চিন্তা,

পাপ কথা, পাপ কার্য্য তাঁহার স্বভাব-বিগর্হিত। বিবেক ও বৈরাগ্যের আগুনে তাঁহার চিন্তার সর্ব্ববিধ মলিন সংস্কার ভস্মীভূত। যোগ ও জ্ঞানের সিদ্ধান্তসমূহের সহিত তিনি সাধারণভাবে পরিচিত। বিচার তাঁহার বিশুদ্ধ ও সুনিপুণ। সুতরাং যম ও নিয়মের কোন অঙ্গই তাঁহার অনধিগত নয়। তাঁহার যৌবনের উদ্দীপিত তেজ ও উৎসাহ স্বভাববলেই ত্যাগ বৈরাগ্য জ্ঞান যোগ ও ভগবদ্ভক্তির দিকেই প্রবলভাবে প্রধাবিত হইয়াছে, ভোগের পথে চলিবার কোন অবকাশই পায় নাই। তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে এক আধ্যাত্মিক প্রেরণার বন্যা আসিয়া তাঁহার সমস্ত প্রকৃতিকেই অধ্যাত্ম-ভাবানুপ্রাণিত করিয়া গুরুসন্নিধানে আনিয়া উপনীত করিয়াছে। যোগার্থীর যোগাধিকার লাভের নিমিত্ত যে প্রাথমিক সাধনা, তজ্জন্য তাহার কোন প্রয়াসই আবশ্যক নয়, যেহেতু তৎপ্রতিকূল কোন ভাবই তাঁহার স্বভাবে লক্ষিত হয় না।

গুরু গোপালনাথ এতাদৃশ নবীন যোগশিশিক্ষুকে সাম্প্রদায়িক বিধান অনুসারে প্রথমতঃ মন্ত্রযোগে ও সেবাযোগে দীক্ষা প্রদান করিলেন এবং হঠযোগের কতক বিশেষ প্রক্রিয়াও শিক্ষা দিলেন। ইহাই অন্তরঙ্গ যোগসাধনার প্রথম সোপান। গুরু তাঁহার নামকরণ করিলেন,—গম্ভীরনাথ। সম্ভবতঃ শিষ্যের স্বাভাবিক নিস্তরঙ্গ গাম্ভীর্য্য দেখিয়াই গুরু তাঁহাকে এই সার্থক নাম প্রদান করিয়াছিলেন। এই গুরুদত্ত নাম তাঁহার সমগ্র প্রকৃতির সঙ্গে কতদূর সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল, তাহা

ভাবীজীবনেও যাঁহারাই তাঁহাকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই উপলব্ধি করিয়াছেন। এরূপ বাক্যে গম্ভীর, কার্য্যে গম্ভীর, জ্ঞানে গম্ভীর, প্রেমে গম্ভীর, আচারব্যবহারে গম্ভীর, হাবভাবে গম্ভীর, প্রত্যেক দৃষ্টিপাতে গম্ভীর, প্রত্যেক হস্তপদ সঞ্চালনে গম্ভীর,—সর্ব্বতোভাবে অহর্নিশ প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যমণ্ডিত এরূপ একটি মূর্ত্তি কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। সজনে নির্জ্জনে, সহরে অরণ্যে, লৌকিক ব্যবহারক্ষেত্রে বা যৌগিক সাধনক্ষেত্রে,—কোন অবস্থাতেই তাঁহার আলোকসামান্য প্রসন্ন-গাম্ভীর্য্যের কোন ইতর-বিশেষ লক্ষিত হইত না। যোগজীবনের সূচনা হইতেই তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত,—"দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীঃ" এক মহামুনি। অন্তরের গম্ভীরতর গম্ভীরতম প্রদেশে ডুবিয়া যাইবার জন্যই তাঁহার গুরুশরণাগতি ও যোগসাধনা।

উপযুক্ত অধিকারীর পক্ষে যোগসাধনার প্রথম দীক্ষা মন্ত্রযোগে। গুরু শিষ্যকে শক্তি সমন্বিত সিদ্ধ মন্ত্র প্রদান করেন। যে মন্ত্রের সাধনায় বহু সাধক সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, গুরুদেব স্বয়ং যে মন্ত্রদ্বারা অনুপ্রাণিত, সেই মন্ত্রের মধ্যে অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি নিহিত থাকে, সকল পূর্ব্বতন সিদ্ধ সাধকের সাধনা দ্বারা সেই মন্ত্র সঞ্জীবিত, চৈতন্য-সমন্বিত। এরূপ সিদ্ধমন্ত্র গুরুমুখ হইতে শিষ্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া শিষ্যের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া তোলে এবং তাঁহার সমগ্র জীবনকে পরমার্থের অভিমুখে আকর্ষণ করে।

নাথ যোগী-সম্প্রদায়ের সাধকগণ নিত্যসিদ্ধ, নিত্যমুক্ত, যোগীশ্বর জ্ঞানীশ্বর আদিগুরু আদিনাথ,—"ক্লেশ-কর্ম্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষঃ"—সর্ব্বদেবময় গুণাতীত শিবকেই পরমারাধ্যরূপে চিন্তন করেন। তাঁহারই মন্ত্রে দীক্ষিত হন, তাঁহাকেই আদর্শ করিয়া যোগপথে অগ্রসর হন, তাঁহারই পারমার্থিক সচ্চিৎপ্রেমানন্দময় স্বরূপ অন্তরে উপলব্ধি করিবার জন্যে গুরুপ্রদর্শিত মার্গে আত্মশক্তি নিয়োজিত করেন। ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, গুরু গোপালনাথ উচ্চাধিকার-সম্পন্ন নূতন শিষ্যকে এই শিবারাধনার সম্প্রদায়ানুসৃত মহাসিদ্ধ মন্ত্রেই দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

নাথযোগী সম্প্রদায়ে শিবমন্ত্রে দীক্ষার সহিত শক্তিমন্ত্রে দীক্ষাও প্রচলিত। এইমতে শিব ও শক্তি তত্ত্বতঃ অভিন্ন।

"শিবস্যাভ্যন্তরে শক্তিঃ শক্তেরভ্যন্তরে শিবঃ।
অন্তরং নৈব জানীয়াৎ চন্দ্রচন্দ্রিকয়োরিব॥"

—শিবের অভ্যন্তরে শক্তি এবং শক্তির অভ্যন্তরে শিব, উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই, যেমন চন্দ্র ও চন্দ্রিকায় কোন ভেদ নাই। একই সচ্চিদানন্দঘন, পরমতত্ত্বের ক্রিয়াতীত গুণাতীত পরিণামরহিত আত্মস্বরূপ সমাহিত স্বভাবের নাম 'শিব', এবং সেই তত্ত্বেরই সক্রিয় সগুণ পরিণামী সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়বিলাসী ভাবের নাম 'শক্তি'। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়বিলাসিনী সচ্চিদানন্দময়ী মহাশক্তিকে বুকে রাখিয়াই শিব নিত্য নির্গুণ নিষ্ক্রিয়, আত্মানন্দ স্বরূপে নিত্য

বিরাজমান; শিবের বুক আশ্রয় করিয়া, শিবের সত্তায় সত্তাবতী হইয়া, শিবস্বরূপ হইতে কোন ক্রমে বিচ্ছিন্ন বা বিচ্যুত না হইয়া, তদীয়া মহাশক্তি অনাদি অনন্ত কাল বিচিত্র গুণে ভূষিত হইতেছেন, বিচিত্র ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন, আপনাকে বিচিত্ররূপে লীলায়িত করিতেছেন, অলঙ্ঘনীয় শৃঙ্খলার সহিত অগণিত জীব জগতের সৃষ্টি পালন পোষণ সংরক্ষণ ও ধ্বংশ বিধান করিতেছেন। জীবজগতের মধ্যে সর্ব্বত্র একই মহাশক্তির প্রকাশ, প্রত্যেক ব্যাষ্টি ও সমষ্টির উৎপত্তি পরিণাম ও বিনাশের মধ্যে একই মহাশক্তির লীলা, সবই মহাশক্তির অঙ্গীভূত, মহাশক্তি হইতে অভিন্ন। আবার, সেই মহাশক্তির মধ্যে শিবেরই প্রকাশ, মহাশক্তির প্রত্যেক অঙ্গে প্রত্যঙ্গে, প্রত্যেক লীলাবিলাসে, প্রত্যেক সৃষ্টি পালন সংহার ব্যাপারে, শিবেরই নিত্য স্বরূপগত চৈতন্যজ্যোতি ও নিস্তরঙ্গ অখণ্ড আনন্দ লীলায়িত। সুতরাং সবই শিব হইতে অভিন্ন। অথচ বিশ্বপ্রপঞ্চের বিচিত্র পরিণাম, মহাশক্তির বিচিত্র লীলা,—কিছুই শিবের অন্তরকে স্পর্শ করে না, শিবের সমাধি ভঙ্গ করে না, শিবের স্ব-ভাবে কোন বিক্ষোভ বা তরঙ্গ উৎপাদন করে না, শিবের স্বরূপানন্দ সম্ভোগের কোন আবরণ সৃষ্টি করে না।

জীবাত্মা যখন বিশ্বের সর্ব্বত্র শিবানী মহাশক্তির লীলা-বিলাস দর্শন ও আস্বাদন করে এবং শিবকেই বিশ্বের আত্মা ও আপনার আত্মা বলিয়া অনুভব করে, তখন তাহার কোন বন্ধন

ও ক্লেশ থাকে না, সারা বিশ্বের সহিত তাহার সমরসত্ব সম্পাদিত হয়। সে সারা বিশ্বকে আপনার মধ্যে এবং আপনাকে সারা বিশ্বের মধ্যে উপলব্ধি করে; বিশ্বের মধ্যে থাকিয়াও সে বিশ্বাতীতত্ব লাভ করে, দেশকালের মধ্যে বিচরণ করিয়াও সে দেশকালের সব পরিচ্ছিন্নতাকে অতিক্রম করে, শিবের সহিত একত্ব অনুভব করিয়া সে বিশ্বজগতের উপর প্রভুত্ব লাভ করে, তাহার জীবন জ্ঞানে প্রেমে শক্তিতে আনন্দে পরিপূর্ণতা লাভ করে। যোগীর জীবনের ইহাই আদর্শ, এই লক্ষ্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই যোগদীক্ষা।

নাথযোগী সম্প্রদায়ে এখন একটি সিদ্ধমন্ত্র গুরুশিষ্য পরম্পরায় প্রচলিত আছে, যাহার স্মরণ-মননে যোগার্থীর চিত্তে এই শিবশক্তি-তত্ত্বের স্ফুরণ হয় এবং জীবন ক্রমশঃ চরম লক্ষ্য সিদ্ধির অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। এই সম্প্রদায়ে শিবমন্ত্র ও শক্তিমন্ত্র একই প্রাণসূত্রে গ্রথিত। শক্তিমন্ত্র অবলম্বন সারা বিশ্বের মধ্যে শিবাভিন্না সচ্চিদানন্দময়ী মহাশক্তির পরিচয় হয়, শিবমন্ত্র অবলম্বনে বিশ্বাতীত সচ্চিদানন্দঘন পরমতত্ত্বের পরিচয় হয়। সৃষ্টির আদিতে ও অন্তে যাঁহার মধ্যে সব জীব ও জড় সম্যক্‌রূপে বিলীন অবস্থায় একীভূত থাকে, সৃষ্টিকালে যাহার লীলায় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রসূত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, যিনি আমার অন্তর বাহির পরিব্যাপ্ত ও আলোকিত করিয়া প্রকাশমান, স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ দেহে যিনি অনাদি অনন্তকাল আপোনাকে লীলায়িত করিয়া চলিয়াছেন, সেই পরম জ্যোতির্ম্ময়ী পরম

সৌন্দর্য্যময়ী পরমানন্দময়ী নিত্যজননী নিত্যকুমারী শিববক্ষো-বিলাসিনী মহাশক্তিকে আমি অন্তরে বাহিরে দর্শন করিতেছি, এবং তাঁহারই চরণে আমার অহন্তা ও মমতাকে নিঃশেষে নিবেদন করিয়া দিতেছি ; এইরূপ একটি উজ্জ্বল ভাবনা শক্তিমন্ত্রে নিহিত। মন্ত্রের এই তাৎপর্য্যকে নিয়ত স্মরণ-মনন-ধ্যান দ্বারা সম্যক্ অধিগত করার প্রচেষ্টাই মন্ত্রের সাধনা। সমস্ত জগৎ-চিন্তাকে, জাগতিক সংস্কারকে—চিত্ত হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া, আপনার সমগ্র সত্তা ও চেতনাকে সচ্চিদানন্দঘন শিবের ভাবনা দ্বারা শিবময় করিয়া তোলার প্রচেষ্টাই শিবমন্ত্রের সাধনা। শিবমন্ত্রের ভাবনায় শক্তি যেন শিবের ভিতরে ডুবিয়া যায়, সাধক সর্ব্বতোভাবে শিবময় হইয়া উঠেন।

বাবা গম্ভীরনাথের সিদ্ধ জীবনের কতক কতক বাণী হইতে অনুমিত হয় যে, সাধক জীবনে উভয়বিধ মন্ত্রের সাধনায় দীক্ষিত হইয়া তিনি শিব-শক্তি তত্ত্বের সম্যক্ উপলব্ধির জন্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণের বিশুদ্ধ সংস্কার পূর্ব্ব হইতেই এই নিগূঢ় অধ্যাত্ম-ভাবের মধ্যে ডুবিয়া যাইবার পক্ষে অনুকূল ছিল। গুরোপদেশ লাভের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রযোগের ভিতর দিয়াই তাঁহার গভীর সাধনা আরম্ভ হইল। এই সাধনার মধ্যেই যোগমার্গের অন্তরঙ্গ সাধনা ধারণা ধ্যান ও সমাধির অনুশীলন হয়। যে সাধনার সংস্কার বিশুদ্ধ, সংকল্প সুদৃঢ় ও তীব্র সংবেদসম্পন্ন, দেহেন্দ্রিয়মন অনুকূল—এই সাধনা অবলম্বনেই তাঁহার জীবন স্তরে স্তরে শিবশক্তিময় হইয়া উঠিতে থাকে।

নাথযোগী সম্প্রদায়ে মন্ত্রযোগের অপর একটি চমৎকার প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে। মহাযোগী মহাপুরুষগণ আমাদের স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার অন্তর্নিহিত একটি নিগূঢ় আধ্যাত্মিক রহস্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে এই শ্বাসক্রিয়া তত্ত্বতঃ প্রত্যেক জীবের জীবনে একটি স্বভাবসিদ্ধ সমরসকরণ প্রক্রিয়া;—অন্তর ও বাহিরের, ব্যষ্টি ও সমষ্টির, ব্যক্তিপ্রাণের ও বিশ্বপ্রাণের, জীবাত্মা ও পরমাত্মার একটি অদ্ভুত যোগসাধন কৌশল। প্রত্যেক শ্বাসত্যাগের সময় জীবাত্মা 'হং'-বা 'অহং'-শব্দের সহিত বাহিরে আসিয়া বিশ্বপ্রাণ বা পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হয়, ব্যষ্টি সমষ্টির মধ্যে আত্মবিলয় করে; আবার, প্রত্যেক শ্বাসগ্রহণের সময় 'সঃ'-শব্দের সহিত বিশ্বপ্রাণ বা পরমাত্মা জীবদেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এই প্রকার প্রত্যেক শ্বাসে শ্বাসে 'অহং' এবং' 'সঃ' স্বাভাবিক নিয়ম পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছে, জীবাত্মা ও বিশ্বাত্মার মিলন সাধিত হইতেছে, প্রত্যেক জীব ক্ষণে ক্ষণে আপনাকে বিশ্বের মধ্যে বিলাইয়া দিয়া এবং বিশ্বকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করিয়াই বাঁচিয়া থাকে; বিশ্বাত্মা ক্ষণে ক্ষণে জীবাত্মাকে আপনার ভিতর বিলীন করিয়া লয়, আবার আপনি জীবদেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে সঞ্জীবিত রাখে। 'অহং' 'সঃ' হইয়া যায়, আবার 'সঃ' অহং-রূপে প্রতীয়মান হয়। এই ভাবে নিত্য-নিরন্তর ব্যষ্টি ও বিশ্বের জীবনলীলা চলিতেছে। বিশ্বজীবনই ব্যষ্টি-জীবনের মধ্যে লীলায়িত। ব্যষ্টির প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ,

প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে বিশ্ব প্রতিফলিত, আবার বিশ্বের মধ্যেও ব্যষ্টি প্রতিফলিত। পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া, পরস্পারের সহিত নিত্যযুক্ত হইয়াই উভয়ের জীবন্ত সত্তা ও প্রকাশ। জীবন প্রবাহের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে জ্ঞান বা অনুভব শক্তির ক্রমবিকাশে যে ব্যষ্টি জীবের তত্ত্বদৃষ্টি উন্মীলিত হয়, তিনি ব্যষ্টি-জীবন ও সমষ্টি-জীবনের এই অঙ্গাঙ্গিত্ব, এই নিত্যযুক্তত্ব, এই তাত্ত্বিক একত্ব সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারেন। তিনি বিশ্বকে নিজের ভিতরে এবং নিজেকে বিশ্বের ভিতরে অনুভব করেন, বিশ্বাত্মার সহিত আপনার একত্ব অনুভব করিয়া তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন। তাঁহার ভেদ-বুদ্ধি, বৈষম্য-বুদ্ধি তিরোহিত হইয়া যায়। বিশ্বজগতে কোথাও তিনি কোন অসামঞ্জস্য দর্শন করেন না, কোথাও কিছু কদর্য্য বা বীভৎস দেখেন না। জগদ্-বিধান হইতে তিনি কোনপ্রকার আঘাত প্রাপ্ত হন না, তাঁহার অন্তরেও কোন প্রকার আঘাত-প্রবৃত্তির উদ্রেক হয় না। তিনি পরম সাম্যে স্থিতিলাভ করেন, সর্ব্ববস্থায় সকল ব্যাপারে এক পরমানন্দরস আস্বাদন করেন।

যোগাচার্য্যগণ উপদেশ করিয়াছেন,—বাবা গম্ভীরনাথও সিদ্ধাবস্থায় অনেক সময় উপদেশ করিয়াছেন,—যে, ইহার জন্যে সাধন খুব কঠিন নয়, বরং সহজ। ইহার সাধন কেবলমাত্র নজর রাখা ও স্মরণ রাখা। প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসে অবিরাম যাহা স্বভাবতঃ চলিতেছে, সে দিকে সুনিপুণ দৃষ্টি রাখা ও সর্ব্বদা তাহা স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করাই সাধন। প্রত্যেক শ্বাসের

সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক বিধান অনুসারেই 'অহং' এবং 'সঃ'-এর যে যোগ, যে সমরসত্ব, যে ঐক্য সাধিত হইতেছে, সে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাহার তাৎপর্য্য অনুস্মরণ করিতে অভ্যাস করিলেই কৃতার্থতা লাভ হয়। যাহা স্বভাবতঃ অহর্নিশি অজ্ঞাতসারে চলিতেছে, সজ্ঞানে অভিনিবেশ সহকারে তাহা দেখিতে থাকিলেই সাধন হইল। 'হং' ও 'সঃ'—শব্দ সহ শ্বাসের এই যে বহির্গতি ও অন্তর্গতি, ইহারই নাম 'হংস-মন্ত্র'। এই মন্ত্রের জপ স্বভাবতই দিবারাত্রি চলিতেছে। কাজেই হংস-মন্ত্রের সাধনে সাধকের নিজের প্রয়াস করিয়া জপ করিতে হয় না, শুধু প্রকৃতির এই অবিরাম জপের দিকে চিত্ত একাগ্র করিতে হয়, এবং ইহার যে সুগভীর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য তাহা মনে মনে স্মরণ করিতে হয়। এই হেতু এই সাধনা মন্ত্র-যোগ হইলেও ইহার নাম 'অজপা'। যোগশাস্ত্রে ইহাকে অজপা নামক গায়ত্রী সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। সারা দিন-রাত্রিতে স্বাভাবিক নিয়মে এই অজপা-জপ ২১৬০০ বার প্রতি মনুষ্যের চলে। শুধু এই স্বাভাবিক অজপা-জপের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া তাৎপর্য্য স্মরণের অনুশীলন করিলেই, স্মরণ ক্রমশঃ সাক্ষাৎ অনুভবে পরিণত হয়, এবং যোগিজন-বাঞ্ছিত মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

যোগিগুরু গোরক্ষনাথের উক্তি আছে,—

হং-কারেণ বহির্যাতি স-কারেণ বিশেৎ পুনঃ।
হংস-হংসেত্যমুং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা॥

ষট্‌শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেকবিংশতিঃ।
এতৎসংখ্যান্বিতং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা॥
অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী।
তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

যোগিসম্প্রদায়ে মন্ত্রযোগের আর একটি অতি সূক্ষ্ম অতি সুন্দর প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে। তাহার নাম 'নাদানুসন্ধান'। 'নাদ' পরম তত্ত্ব শিব ব্রহ্ম বা পরমাত্মার নিত্য শব্দময়ী মূর্ত্তি, সচ্চিদানন্দময়ী মহাশক্তির আদিম স্পন্দাত্মক প্রকাশ। বেদ উপনিষদাদি সকল শাস্ত্রে এবং যোগশাস্ত্রে এই নাদকে প্রণব নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই নাদ হইতেই জীব-জগতের উদ্ভব। সকল জীবের অন্তর্হৃদয়ে এবং সারাবিশ্বের হৃদয়ে এই নাদ প্রতিনিয়ত অনাহতভাবে ঝঙ্কৃত হইতেছে। এই নাদের উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই। বিশ্বভুবন নাদময় এবং প্রত্যেক জীবদেহও নাদময়। বিচিত্র শব্দ, বিচিত্র ধ্বনি, বিচিত্র ভাষা, সবই এই এক অনাহত নাদ সমুদ্রেরই বিচিত্র তরঙ্গ ভঙ্গী, এক অখণ্ড নাদেরই খণ্ডিত অভিব্যক্তি। এই নাদের মূলস্বরূপ—ওঁম্। ইহা কোন জীবোচ্চারিত বা জড়সংঘর্ষসমুৎপন্ন অনিত্য শব্দ বিশেষ বা ধ্বনি বিশেষ নয়; স্বয়ং শিব বা ব্রহ্মেরই শব্দরূপে নিত্য আত্ম-প্রকাশ। সব উৎপত্তি-বিনাশশীল শব্দ এই অনাহত নিত্য ওঁম্‌কার হইতেই উৎপন্ন হয়, আবার ইহারই মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। মাণ্ডুক্য উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—"ভূতং ভবদ্

ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপি ওঁম্-কার এব। সর্ব্বংহ্যেতদ্ ব্রহ্ম। অয়মাত্মাব্রহ্ম।”—যাহা কিছু অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, অর্থাৎ যাহা কিছু কালে উৎপন্ন হয় এবং কালক্রমে বিষয় প্রাপ্ত হয়, সবই স্বরূপতঃ ওঁ-কার, অর্থাৎ ওঁম্ হইতেই তাহাদের উদ্ভব, ওঁ-কারেই তাহাদের বিলয় এবং স্থিতিকালে ওঁম্-দ্বারাই তাহারা পরিব্যাপ্ত। আবার, যাহা ত্রিকালের অতীত নিত্য সত্য, উৎপত্তি 'বিলয় বিহীন, তাহাও ওঁ-কারই। অতএব ওঁকার-ব্যতিরিক্ত অপর কিছুর স্বতন্ত্র সত্তাই নাই,—সকলই এই ওঁ-কাররূপী ব্রহ্ম; এই আত্মাও ওঁ-কাররূপী ব্রহ্ম। এক ওঁকাররূপী ব্রহ্মই সকলর মধ্যে প্রকাশিত, এবং সকলকে অতিক্রম করিয়াও নিত্য স্বস্বরূপে বিরাজমান।

ওঁ-মন্ত্র অবলম্বনে এই নিত্য সত্য সর্ব্বদেশকালব্যাপী ও সর্ব্বদেশকালাতীত ব্রহ্মস্বরূপ ওঁ-কারের অনুসন্ধানই যোগের নাদানুসন্ধান। বিশ্বপ্রপঞ্চের সর্ব্ববিধ কোলাহল, সর্ব্বপ্রকার উৎপত্তি বিলয় শীল শব্দ তরঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া, বিচিত্র-ভেদ-বিভক্ত ধ্বনি সমূহের অন্তরে প্রবেশ করিয়া, সেই ভেদ বিহীন তরঙ্গ বিহীন উৎপত্তি বিলয় বিহীন মহান্ মধুর নাদরূপী প্রণব-রূপী ব্রহ্মকে অনুক্ষণ সন্ধান করিতে হইবে। অনুসন্ধানের পথে কতপ্রকার বিচিত্র ভেদ বিভিন্ন অনিত্য শত তরঙ্গ শ্রবণকে বিক্ষিপ্ত করে, মনক কখনো উত্ত্যক্ত করে, কখনো প্রলুব্ধ করে। সে সকল হইতে শ্রবণ-মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া সেই

অনাহত নাদ শ্রবণ করিতে হইবে, তাহার মধ্যে মনকে ডুবাইয়া দিতে হইবে। মাণ্ডুক্য উপনিষৎ বলিয়াছেন,—সেই ওঁ-কার-রূপী ব্রহ্ম চতুষ্পাৎ—চতুর্মাত্রা বিশিষ্ট। জাগ্রদবস্থায় তাঁর বিশ্ব-রূপের প্রকাশ, স্বপ্নাবস্থায় তাঁর তৈজশরূপের প্রকাশ, এবং সুষুপ্তাবস্থায় তাঁর প্রাজ্ঞ-রূপের প্রকাশ। এ সবই তাঁর এক এক মাত্রার প্রকাশ মাত্র। এসব ভেদ করিয়া তাঁর সর্বোর্দ্ধ নিত্য স্বরূপের সহিত চিত্তকে যুক্ত করিতে হইবে। সেই স্বরূপ "অমাত্রশ্চতুর্থোঽ ব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোঽদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈচ্চ"—মাত্রাবিহীন, তুরীয়, সর্ব্বভেদ ব্যবহারাতীত, বিশ্বপ্রপঞ্চাতীত, দ্বৈতবিহীন শিবস্বরূপ। এই ওঁ-কারই আত্মার স্বরূপ।

দীর্ঘ বা প্লুত স্বরে উচ্চারিত ওঁম্-মন্ত্র কিংবা গুরুদত্ত ব্রহ্ম বাচক কোন নাম বা মন্ত্র সুদৃঢ় ভাবে অবলম্বন করিয়া, জাগতিক সব নামরূপের আসক্তি ও আকর্ষণ হইতে চিত্তের মুক্তিসাধন করা আবশ্যক হয়। প্রণবে বা নামে যত রতি হয়, চিত্ত যত তাহাতে একাগ্র হয়, বাহিরের সব নাম-রূপের প্রতি চিত্তের ঔদাসীন্য যত বাড়িতে থাকে, প্রণব বা নামের ততই সূক্ষ্ম-স্বরূপ উপলব্ধিগোচর হইতে থাকে। যতক্ষণ মন্ত্র রসনায় উচ্চারিত ও কর্ণের শ্রুতিগোচর থাকে, ততক্ষণ তার স্থূল রূপের সহিতই পরিচয়, ততক্ষণ তাহা মনের বিষয়রূপে মনের বাহিরেই উৎপন্ন ও বিলয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। প্রত্যাহারও একাগ্রতা অনুশীলনের ফলে মনের সঙ্গে তাহার যত নিবিড়

যোগ স্থাপিত হয়, ততই মন্ত্র বা নামের সূক্ষ্মরূপের প্রকাশ হয়, মন্ত্র বা নাম তত মানস আকারে বা ভাব আকারে প্রতিভাত হয়। ততই .তার উৎপত্তি-বিলয়শীল ভাব লুপ্ত হইয়া অবিচ্ছিন্ন ধারারূপে চিত্তে তাহার জ্যোতির্ম্ময় প্রবাহ চলিতে থাকে। অভ্যাসের প্রগাঢ়তায় মন যেন মন্ত্র বা নামের সূক্ষ্ম অবিরাম ধারার মধ্যে ডুবিয়া যায়, এবং মন্ত্র বা নাম নিত্য অনাহত নাদের সহিত একীভূত হইয়া যায়, অন্তরে অনেক প্রকার শব্দের অনুভূতি হয়, অনেক প্রকার জ্যোতি দর্শনাদিও হয়। সে সকলের প্রলোভন ও বিক্ষেপ হইতে চিত্তকে মুক্ত রাখিবার জন্যে সজাগ থাকিতে হয়। অনাহত নাদের সহিত পরিচয় হইলে, আর সব শব্দ ও রূপ আকিঞ্চিৎকর হইয়া যায়। তখন এক নাদ, এক সুর, এক মনোহর সঙ্গীত, সারা বিশ্ব ভুবন প্লাবিত করিয়া, সাধক-হৃদয় ও বিশ্বহৃদয়কে একীভূত করিয়া, সমস্ত চেতনাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া, অনুভূত হইতে থাকে। সমস্ত বিশ্ববৈচিত্র্য এক আদ্যন্তমধ্যবিহীন অখণ্ড প্রণব-নাদের মধ্যে একীভূত হইয়া অপরিসীম মধুরত্ব প্রাপ্ত হয়। সারা বিশ্বপ্রপঞ্চ অন্তরে অন্তরে কি যে সঙ্গীতময়, কি যে মাধুর্য্যময়, কি যে আনন্দময়, কি যে অমৃতময়, তাহার যথার্থ পরিচয় হয় তখনই, যখন সাধকের সমগ্র চেতানা এই অনাহত নাদের সহিত মিলিত হয়। এই নাদানুভূতির ক্ষেত্রেও স্তরভেদ আছে, প্রগাঢ়তার ভেদ আছে। সব স্তর অতিক্রম করিলে, নাদের আর কোনরূপ প্রবাহ-ভাবও থাকে না। নাদ তখন

'শান্তং শিবম্ অদ্বৈতং' ব্রহ্মস্বরূপে স্বমহিমায় প্রতিভাত, সাধকের চেতনা সম্যক্‌রূপে তদ্‌ভাবে ভাবিত, তদাকারে আকারিত।

মন্ত্র সাধককে সাধনাদ্বারা মন্ত্রকে, গুরুদত্ত নামকে, স্থূল প্রণবকে শনৈঃ শনৈঃ অনাহত স্বপ্রকাশ নিত্য নাদের স্তরে উন্নীত করিতে হয়, নাদের সহিত সম্যক্‌রূপে মিলাইয়া দিতে হয়; নাদের মধ্যে পরম তত্ত্বের সম্যক্ জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ অনুভব করিতে হয় এবং পরম তত্ত্বকে সেই নাদের,—তথা আপনার ও বিশ্বপ্রপঞ্চের যথার্থ স্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি করিতে হয়। ইহার ভিতর দিয়াই জীবের শিবত্ব লাভ হয়।

নবীন যোগী গম্ভীরনাথ প্রবীন গুরু গোপালনাথজীর নিকট হইতে সিদ্ধগুরু পরম্পরাগত মন্ত্রযোগে দীক্ষিত হইলেন, মন্ত্রের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য অবগত হইলেন। মন্ত্রের রহস্যোদ্‌ঘাটনের বিবিধ কৌশল শিক্ষা করিলেন। তত্ত্বসাক্ষাৎকারানুকুল সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর বিশেষ বিশেষ ভাবনা পদ্ধতি ও বিচার প্রণালী সম্বন্ধেও উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন। গুরুর সহজেই প্রতীতি হইল যে, শিষ্য দেহে তরুণ হইলেও যোগপথে বস্তুতঃ নূতন নয়। সামান্য ইঙ্গিতেই উপদেশের নিগূঢ় মর্ম্ম এই অসাধারণ যোগপিপাসুর অন্তরে উজ্জ্বল ভাবে স্ফুরিত হইয়া উঠে। গুরুর সামান্য অঙ্গুলি স্পর্শেই যেন তাঁহার হৃদয়ের সব কপাট খুলিয়া যায়। সব তত্ত্ব, সব সাধ্য সাধন রহস্যই যেন তাঁহার সংস্কারগত হইয়া আছে; একটু সংকেতমাত্রই তাহা স্মৃতিরূপে জাগিয়া উঠে। কখন কখন বোধ হয়, যেন গুরুর অনুভূতি ও

অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করিয়াও তত্ত্বের অভ্যন্তরে শিষ্য অনুপ্রবেশ লাভ করে। এতাদৃশ শিষ্য লাভ করিয়া গুরু অবশ্যই নিজেকে ভাগ্যবান্ মনে করিলেন।

অন্তরঙ্গ যোগ সাধনায় শিষ্যের অসামান্য অধিকার দেখিয়া এবং যোগের সর্ব্বাঙ্গীন অনুশীলনে শিষ্যের সুদৃঢ় সংকল্প হৃদয়ঙ্গম করিয়া, গুরু গোপালনাথ তাঁহাকে হঠযোগের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্বন্ধেও উপদেশ প্রদান করিলেন। হঠযোগের সুগভীর সাধনা নাথযোগী সম্প্রদায়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই সম্প্রদায়ের সিদ্ধ যোগিগণ হঠযোগে বিচক্ষণ বলিয়া সমগ্র দেশে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। তাহারা এই যোগের সাধনায় অনেক নূতন নূতন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন এবং যোগশাস্ত্রের প্রভূত বিস্তার সাধন করিয়াছেন। মানুষের ভিতরে কত শক্তি অন্তর্নিহিত, অথচ অনুশীলনের অভাবে প্রসুপ্ত অবস্থায় থাকিয়া যায়, তাহা তাঁহারা হঠযোগ দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন। সাধারণ মানুষ যাহাকে অলৌকিক শক্তি ও অলৌকিক জ্ঞান আখ্যা প্রদান করে, তাহা বস্তুতঃ মানুষের অননুশীলিত শক্তি ও জ্ঞান; যথোচিত অনুশীলন দ্বারা মানুষমাত্রেই সেই সব শক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ সম্পাদন করিতে পারে। মানুষ যেখানে সাধারণতঃ তাহার স্বাভাবিক শক্তি ও জ্ঞানের সীমারেখা টানিয়া দেয়, সেই সীমা অতিক্রম করিতেও মানুষের স্বাভাবিক অধিকার, এবং সেই সীমা অতিক্রম করিবার জন্যেই মানুষের সাধনা। আধুনিক কালে যাঁহাদিগকে বৈজ্ঞানিক বলা হয়, তাঁহারা বাহ্য

উপায় অবলম্বন করিয়া বিচিত্র যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করিয়া, মানুষের শক্তি ও জ্ঞানের পরিধিকে বহু গুণ বর্দ্ধিত করিয়াছেন, এবং আরো বর্দ্ধিত করিতে সচেষ্ট। যোগিগণ আন্তর উপায় অবলম্বন করিয়া দেহেন্দ্রিয়মনের উপর প্রভুত্ব অর্জ্জন করিয়া, সুপ্ত সামর্থ্যকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, ব্যাক্তিগত জীবনে শক্তি ও জ্ঞানের পরিধিকে তদপেক্ষাও অধিক বর্দ্ধিত করিয়া দেখাইয়াছেন। হঠযোগ মানবীয় জ্ঞান ও শক্তির অসাধারণ বিকাশ সাধনেরই বিশেষ কৌশল।

হঠযোগের সাধনায় বহুবিধ আসন, প্রাণায়ম, মুদ্রা, বন্ধ, বেধ এবং ক্রিয়াযোগাদির অনুশীলন করিতে হয়। শরীর-শোধনের নিমিত্ত ষট্‌কর্ম্মের বিধান। যথা,—

ধৌতি বস্তি স্তথা নেতি স্ত্রাটকং নৌলিকং তথা।
কপাল ভাতি শ্চৈতানি ষট্‌কর্ম্মাণি প্রচক্ষতে॥
কর্ম্মষট্‌কমিদং গোপ্যং ঘটশোধনকারকম্।
বিচিত্রগুণ সন্ধায়ি পূজ্যতে যোগি পুঙ্গবৈঃ॥

ধৌতি, বস্তি, নেতি, ত্রাটক, নৌলিক, কপালভাতি,—যোগিগণ এই ছয়টীকে বলেন ষট্‌কর্ম্ম। এই ষট্‌কর্ম্ম গোপনীয়। ইহাতে শরীরের ভিতরে যত প্রকার দোষ আছে, তাহার শোধন হয়, এবং সাধকের দেহে বিচিত্র অদ্ভুত গুণ ও শক্তির প্রকাশ হয়। যোগিপুরুষগণ এই সাধন বিশেষ আদর করিয়া থাকেন।

এই সব সাধারণ ক্রিয়াযোগ ব্যতীত, অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করিবার জন্য এবং জরামৃত্যুর অধীনতা হইতে মুক্তি-

লাভের নিমিত্ত, বহুপ্রকার সাধনা উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা,—

মহামুদ্রা মহাবন্ধো মহাবেধশ্চ খেচরী।
উড্ডানং মূল বন্ধশ্চ বান্ধা জালন্ধরাভিধঃ।
করণী বিপরীতাখ্যা বজ্রোলী শক্তিচালনম্।
ইদংহি মুদ্রাদশমং জরামরণনাশনম্॥
আদিনাথোদিতং দিব্যমষ্টৈশ্বর্য্যপ্রদায়কম্।
বল্লভং সর্ব্বসিদ্ধানাং দুর্লভং মরতামপি॥

মহামুদ্রা, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, উড্ডান, মূলবন্ধ, জালন্ধরবন্ধ, বিপরীত করণী, বজ্রোলী, শক্তিচালন,—এই দশবিধ মুদ্রার অভ্যাসে জরা ও মরণের নাশ হয়। আদিনাথ এই দশবিধ মুদ্রার উপদেশ করিয়াছেন। এই সব মুদ্রায় সিদ্ধি-লাভ করি:ত পারিলে অনিমাদি অন্টবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করা যায়। দেবতাদেরও ইহা দুর্লভ। সব সিদ্ধগণের এই সাধন বিশেষ প্রিয়।

এই প্রকার বহুবিধ সাধনা হঠযোগের অঙ্গীভূত। শাস্ত্র-গ্রন্থে, বিশেষত নাথযোগীদের গ্রন্থে, এই সব সাধনার উপদেশ আছে। কিন্তু বিচক্ষণ গুরুর সাক্ষাৎ উপদেশ ব্যতীত এবং বিশেষ অধিকারী ব্যতীত, ইহার যথোচিত অনুশীলন সম্ভব নয়, এবং কেবল মাত্র গ্রন্থের বিবরণ দেখিয়া প্রযত্ন করা নিরাপদও নয়। যাঁহারা এইসব বিবধ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা প্রমাণিত করিয়াছেন, যে, মানুষের মধ্যে কী অদ্ভুত শক্তি সামর্থ্য নিহিত আছে। হঠযোগ সাধনা দ্বারা

মানুষ তাহার আভ্যন্তরীণ সব শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ও আয়ত্ত করিয়া অসাধ্য সাধন করিতে সমর্থ হয়। সে দেহের সব যন্ত্রপাতিব উপর, সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর, প্রভুত্বস্থাপন করিতে পারে, এবং বহিঃপ্রকৃতির বিবধ শক্তির উপরও আধিপত্য করিতে পারে। সে ইচ্ছামতে নিজের দেহকে অতিক্ষুদ্র বা অতিবৃহৎ করিতে পারে, অতিশয় লঘু কিংবা অতিশয় ভারী করিতে পারে, আকাশমার্গে গমনাগমন করিতে পারে, অপরের দেহ প্রবেশ করিতে পারে, অপরের মনের সব চিন্তা ও ভাব জানিতে পারে, অতীত এবং ভবিষ্যৎকে বর্ত্তমানের মত দেখিতে পারে, দূরদর্শন, সূক্ষ্মদর্শন, অতীন্দ্রিয় দর্শন প্রভৃতি সহজেই করিতে পারে; সে সঙ্কল্প দ্বারা এক পদার্থকে পদার্থান্তরে পরিণত করিতে পারে: চলন্ত এন্‌জিনের গতিরোধ করিতে পারে, সূক্ষ্মশরীরে অন্যের অদৃশ্য থাকিয়া যেখানে সেখানে যাতায়াত করিতে পারে; প্রয়োজনবোধ হইলে সে সুদীর্ঘকাল সুস্থদেহে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, কিংবা একই সময়ে বিভিন্ন দেহ গ্রহণ করিয়া বিচরণ করিতে পারে। হঠযোগের বিশেষ বিশেষ সাধনার ফলে সাধকের অদ্ভুত অদ্ভুত শক্তির বিকাশ হয়। যাহা কল্পনা করাও সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে। ভোগ ও ত্যাগ উভয়ই তাঁহার পক্ষে নিতান্ত সহজ হয়।

কিন্তু যাঁহারা আধ্যাত্মিক জীবনের সম্যক্ কৃতার্থতা লাভের উদ্দেশ্যে হঠযোগের অনুশীলন করেন, তাঁহরা বহুবিধ শক্তি

লাভ করিয়াও তৎপ্রতি উদাসীন হন। তাঁহারা সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করেন পরমতত্ত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার জন্যে,—এই দেহে, এই জগতে, সর্ব্বশক্তির আধারস্বরূপ শিবের সহিত সর্ব্বতোভাবে মিলিত ও একীভূত হইবার জন্যে,—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত দেহপিণ্ডের, বিশ্বাত্মার সহিত ব্যষ্টিমনের সমরসত্ব অনুভব করিবার জন্যে,—সব ভেদবৈষম্যের ঊর্দ্ধে উঠিয়া নিত্য নিরন্তর পরমানন্দ সম্ভোগের জন্যে। তাঁহারা হঠযোগকে রাজযোগের সোপানরূপে অভ্যাস করেন।

যোগ শাস্ত্রমতে, যে শিবাশ্রিতা শিবাভিন্না সচ্চিদানন্দময়ী মহাশক্তি আপনাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপে অনাদি অনন্তকাল অভিব্যক্ত ও লীলায়িত করিতেছেন, সেই মহাশক্তিই মানুষের ভিতরে যেন নিদ্রিত অবস্থায় আছেন। সেই মহাশক্তিকে যোগিগণ কুলকুণ্ডলিনী শক্তি আখ্যা দিয়া থাকেন। বিশ্বপ্রসবিনী বিশ্ববিলাসিনী মহাশক্তি যখন আপনাকে সংকুচিত করিয়া, সর্পের ন্যায় কুণ্ডলীকৃত করিয়া, নিদ্রিতবৎ অবস্থান করেন, তখনই তাঁহাকে কুণ্ডলিনী শক্তি বলা হয়। সব জীবের মধ্যে তিনি এইভাবে অবস্থান করেন। যেমন তিনি সমষ্টি-জগতে, তেমনি তিনি ব্যষ্টিদেহে.—যেমন ব্রহ্মাণ্ডে, তেমনি পিণ্ডে। জীবজগতে মানুষের বিশেষ অধিকার সমুচিত সাধনা দ্বারা নিদ্রিতা মহাশক্তির উদ্বোধন সম্পাদন করা, এবং স্তরে স্তরে সেই মহাশক্তির বিচিত্র ঐশ্বর্য্য আপনার মধ্যে অনুভব করা। যোগিগণের 'চক্রভেদ'—সাধনা এই

মহাশক্তিরই জাগরণের সাধনা। তাঁহারা দেহের মধ্যে ষট্‌চক্র বা অষ্টচক্র বা নবচক্র পরিকল্পনা করেন। মহাশক্তি যেন নিম্নতম মূলাধার চক্রে ঘুমাইয়া আছেন। তাঁহাকে জাগাইয়া দেহাভ্যন্তরস্থ সুষুম্নামার্গে স্তরে স্তরে উঠাইতে হইবে। বিকশিত করিতে হইবে, এবং অন্তে সহস্রার চক্রে পরম ব্যোমে পরম শিবের সহিত মিলিত করিতে হইবে, অর্থাৎ শিব এবং শক্তির অভিন্নতা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধিও আস্বাদন করিতে হইবে। তখন 'কুল' ও 'অকুল'—শক্তি ও শিব—বিশ্বময়ী ও বিশ্বাতীত,—অখণ্ড অনুভূতিতে এক হইয়া যায়।

অকুলং কুলমাধত্তে কুলঞ্চাকুলমিচ্ছতি।
জলবুদ্‌বুদবদ্ ন্যায়া দেকাকারঃ পরঃ শিবঃ॥

(সিদ্ধ সিদ্ধান্ত পদ্ধতি)

কুল (অশেষবৈচিত্রপ্রসবিনী মহাশক্তি) তখন অকুলকে (সর্ব্ববৈচিত্র্যাতীত একরস চৈতন্যস্বরূপকে) আলিঙ্গন করেন, এবং অকুল কুলকে আলিঙ্গন করেন; জল ও বুদ্‌বুদরাশির মত দুই এর সম্পূর্ণ একত্ব সম্পাদিত হয়; এই কুল ও অকুলের ঐক্যই পরম শিবের তাত্ত্বিক স্বরূপ।

. এই চরম লক্ষ্য অন্তরে লইয়াই যথার্থ যোগপিপাসু হঠ-যোগ দ্বারা কুলের (অর্থাৎ মহাশক্তির) উপাসনা করেন, মহাশক্তিকে নিজের অন্তরে জাগাইয়া তোলেন, তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে সব বৈচিত্র্য ও বৈষম্য হইতে একত্ব ও পরম সাম্যের দিকে উন্নীত করেন, এবং অকুলের সঙ্গে (বিশ্বাতীত

পরম শিবের সঙ্গে) কুলকে সম্যক্ মিলিত করিয়া পরমানন্দ আস্বাদন করেন। এইরূপে হঠযোগ রাজযোগে পরিণত হয়।

রাজযোগের নিবিড় সাধনার ক্ষেত্রেও বহু স্তরভেদ আছে। সব স্থূল-প্রপঞ্চকে সূক্ষ্মে লয় করিতে হয়, সব সূক্ষ্মকে কারণে লয় করিতে হয়, কারণকে মহাকারণে লয় করিতে হয়, মহাকারণকে সর্ব্বকার্য্যকারণ সম্বন্ধাতীত পরমতত্ত্বে লয় করিতে হয়। চিত্তের সর্ব্ববিধ বাসনা ও সংস্কারকে জয় করিতে হয়। মনকে মনের ঊর্দ্ধে তুলিয়া বিশুদ্ধ চৈতন্যের সহিত একীভুত করিতে হয়। জড় ও চেতনের ভেদ অতিক্রম করিতে হয়, বহুত্বও একত্বের ভেদ উল্লঙ্ঘন করিতে হয়, পরিণামিত্ব ও নিত্যত্বের অভেদভূমিতে উঠিতে হয়, অন্তর ও বাহিরের, জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞেয়ত্বের, আত্মত্ব ও অনাত্মত্বের সমত্ব অনুভব করিতে হয়। জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি রূপ অবস্থাত্রয়ের ভেদকেও জয় করিতে হয়। রাজযোগের সাধক ধারণা ধ্যান ও সমাধির নিবিড় নিবিড়তর নিবিড়তম অনুশীলন দ্বারা সর্ব্ববিধ চিত্তাবস্থা, সর্ব্ববিধ, সংস্কার, সর্ব্ববিধ ভেদবোধের ঊর্দ্ধে উঠিয়া পূর্ণজ্ঞানে ও পূর্ণানন্দে প্রতিষ্ঠিত হন, পরম শিবের পূর্ণতম অনুভবের সহিত তাঁহার অনুভব এক হইয়া যায়। তিনি শিবস্বরূপতা লাভ করেন, ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ হন। সেই অখণ্ড অনন্ত দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিত পূর্ণতম জ্ঞানানন্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, তিনি পুনরায় বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে অবতরণ করেন, অন্তরে নিরাবরণ অভেদানুভূতি লইয়া ভেদবহুল লোক ব্যবহার

ক্ষেত্রে বিচরণ করেন, হৃদয়ে গুণাতীত ভাব অক্ষুন্ন রাখিয়া জগতে সর্ব্ববিধ গুণ লইয়া খেলা করেন। নাথযোগিগণ ইহাকে 'অবধূত'—অবস্থা বলেন। অবধূত—অবস্থা লাভই নাথ যোগী সম্প্রদায়ের সাধনার আদর্শ। যাঁহারা ইহাতে সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহারা মহাসিদ্ধ বলিয়া পুজিত হন। নাথ সম্প্রদায়ে পূর্ব্বকালে এইরূপ অনেক মহাসিদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাসিদ্ধদের ন্যায় পূর্ণাঙ্গ যোগসাধনায় সিদ্ধি-লাভের জন্যে তীব্রতম ব্যাকুলতা অন্তরে লইয়া নবীন যোগার্থী গম্ভীরনাথ গুরুসমীপে উপনীত। তাঁহার দেহেন্দ্রিয় মনবুদ্ধি পূর্ণাঙ্গ যোগসাধনার নিমিত্তই যেন বিধাতা নির্ম্মান করি-য়াছিলেন। তিনি ক্রমে ক্রমে প্রবীণ গুরুর নিকট হইতে মন্ত্রযোগের সহিত হঠযোগ, লয়যোগ ও রাজযোগের সর্ব্ববিধ উপদেশ গ্রহণ করিলেন, বিবিধ প্রক্রিয়ার কৌশলসমূহ অবগত হইলেন। তাঁহার প্রাক্তন যোগ সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইল। তিনি নিত্য নিরন্তর যোগাভ্যাসে আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিবার জন্যে গুরুর অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন।

কিন্তু তখনই অন্তরঙ্গ যোগসাধনায় ডুবিয়া যাইবার অনুমতি না দিয়া গুরু তাঁহাকে কিছুকাল সেবাব্রতে নিয়োজিত করিলেন। গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া যোগপিপাসু গম্ভীরনাথ গুরু ও মন্দিরের সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। গুরু যখন যে কার্য্যের আদেশ করিতেন, তাহাই তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে সম্পাদন করিতেন। মন্দির সংক্রান্ত বিভিন্ন

কার্য্যে তিনি অভ্যস্ত হইলেন। তিনি কখনো শ্রীনাথজীর পূজার্চ্চনা করিতেন, কখনো সাধু ও অভ্যাগতদের সেবাশুশ্রূষা করিতেন, কখনো গুরুজীর দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করিতেন, কখনো আশ্রমের আয়ব্যয়াদি সম্বন্ধেও তত্ত্বাবধান করিতেন, আশ্রমের প্রজাবর্গ এবং প্রতিপালিত গোমহিষাদিও তাঁহার সেবা হইতে বঞ্চিত হইত না। গুরু যখন যে কার্য্যের জন্যে পাঠাইতেন, তাহাই তিনি গুরুসেবাবুদ্ধিতে করিতেন। কিন্তু তাঁহার মন সর্ব্বদাই থাকিত যোগের দিকে, জীবনের চরম সার্থকতা সাধনের দিকে! কথাবার্ত্তাত প্রায় বলিতেনই না। সময়েরও কদাপি অপচয় করিতেন না। বাহ্যিক সেবা-কার্য্যেও যতটুকু সময় অতিবাহিত হইত, তদ্‌ব্যতীত সব সময়ই তিনি গুরূপদিষ্ট যোগানুশীলনে ব্যাপৃত থাকিতেন। সেবাকার্য্যের সময়েও তাঁহার মন্ত্রসাধনা চলিতে থাকিত। গুরুর নিকট হইতে তিনি যে যোগদৃষ্টির উপদেশ পাইয়াছেন, কর্ম্মসাধনার যে আদর্শ অবগত হইয়াছেন, সেই যোগদৃষ্টি লইয়া সেই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি আশ্রম-সংক্রান্ত যাবতীয় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। বহুলোকের মধ্যে থাকিয়া, বহুপ্রকার কার্য্যের সহিত জড়িত হইয়াও, দৃষ্টিকে কিভাবে অন্তর্মুখী রাখিতে হয়, কিভাবে স্বার্থবুদ্ধির লেশমাত্রও না রাখিয়া সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সেবা করিতে হয়, কি ভাবে বাহ্যিক কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়াও স্বীয় অভীষ্টের সঙ্গে অন্তরের যোগ অবিচ্ছিন্ন রাখা যায়। এই সেবাব্রতের মধ্যে এসকল

যোগাঙ্গেরও অনুশীলন হইত, এবং সম্ভবতঃ ইহাই গুরুজীর অভিপ্রায় ছিল।

সাধন সম্বন্ধীয় দীক্ষা শিক্ষা ব্যতীত, সংসারত্যাগী মুমুক্ষু সাধককে নাথযোগী সাধু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইবার জন্য দুইটি সাম্প্রদায়িক আচার প্রচলিত আছে। একটি শিখাচ্ছেদন দ্বিতীয়টি কর্ণবেধ। শিখাচ্ছেদনকে চলতি ভাষায় 'চুটী কাটা' বলা হয়। ইহা মুণ্ডনের অনুকুল। গুরু স্বহস্তে কাঁচি দিয়া শিষ্যের শিখা বা এক গোছা কেশ কাটিয়া তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য বা গার্হস্থ্য আশ্রম হইতে সন্ন্যাস আশ্রমের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গুরু শিষ্যের মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক পূর্ব্ব জীবনের অবসান এবং নবজীবনের আরম্ভ করিয়া দিলেন। তখন সাধকের পুনর্জ্জন্ম। তখন হইতে গুরুই শিষ্যের পিতা; মাতা, আশ্রয়দাতা, পরিচালক ও অভিভাবক। এই আধ্যাত্মিক নবজন্ম লাভের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বাশ্রমের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন হইয়া যায়, পূর্ব্বাশ্রমোচিত সকল কর্ত্তব্যের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি হয়। তখন তাহার পূর্ব্বাশ্রমের নামগোত্রেরও বিসর্জ্জন হয়, বেশভূষারও পরিত্যাগ হয়। গুরু তাহাকে নূতন সন্ন্যাসোচিত নাম প্রদান করেন, পরিধানের জন্যে কৌপীন ও বহির্ব্বাস দান করেন। তৎসঙ্গে, গুরু দুই তিন অঙ্গুলি পরিমিত একটি কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত বাঁশীর মত যন্ত্র বিশেষ রেশম সূত্র বাঁধিয়া শিষ্যের গলায় মালার মত পরাইয়া দেন। ঐ বাঁশীটির নাম 'নাদ', এবং ঐ সূত্রমালার

নাম 'সেলি' বা 'জনেয়ু'। নাদটি ঠিক হৃদয়ের উপর লম্বিত থাকে। এই নাদ-যন্ত্র হৃদয়াভ্যন্তরস্থ অনাহত নাদেরই প্রতীক। যোগার্থীকে সর্ব্বদা সেই অনাহত দিব্য নাদের কথা স্মরণ করাইয়া সেইদিকে চিত্তকে সমাকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই বাহিরে এই কণ্ঠ বিলম্বিত নাদ-যন্ত্রের বিধান। কোন সাধুর গলায় সেলি ও নাদ দর্শন করিলেই তাহাকে নাথযোগি সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। এই শিখাচ্ছেদন ও নাদসেলি গ্রহণের পর যোগসাধককে অওঘর বলা হয়।

শিষ্য গুরুকে বা দেবতাকে কিংবা অন্য কোন শ্রদ্ধার্হ যোগীকে প্রণাম করিবার সময় ঐ নাদে ফুঁ দিয়া প্রণবধ্বনি করেণ, এবং 'আদেশ' 'আদেশ' উচ্চারণ করেন। গুরু বা অপরযোগী ও 'আদেশ' 'আদেশ' উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রত্যাভিবাদন করিয়া থাকেন! 'আদেশ' শব্দের তাৎপর্য্য সিদ্ধ সিদ্ধান্ত পদ্ধতিতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ঃ—

আত্মেতি পরমাত্মেতি জীবাত্মেতি বিচারণে।
ত্রয়াণাম্ ঐক্যসম্ভূতি রাদেশ ইতি কীর্ত্তিতঃ॥
আদেশ ইতি সদ্‌বাণীং সর্ব্বদ্বন্দ্বক্ষয়াপহাম্।
যো যোগিনং প্রতি বদেৎ স যাত্যাত্মানমীশ্বরম্॥

আত্মা, পরমাত্মা ও জীবাত্মা, এই তিনের যে অভেদানুভূতি, তাহারই নাম আদেশ। তাৎপর্য্য অনুধাবন পূর্ব্বক এই আদেশ শব্দ উচ্চারণ করিলেই সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্ব ও মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ হয়। এক যোগী অপর যোগীকে এই পরমতত্ত্ববোধক শব্দ

দ্বারা অভিবাদন করিবেন। অর্থাৎ সর্ব্বদা মিলন সময়ে প্রত্যেক যোগী অপর যোগীকে পরম তত্ত্ব স্মরণ করাইয়া দিবেন এবং পরস্পরকে এই তত্ত্ব দৃষ্টিতে দর্শন ও অভিবাদন করিবেন। উভয়েরই হৃদয় তাহার পরমতত্ত্বের সহিত যুক্ত হয়!

সংসারবিরাগী তত্ত্বৈকনিষ্ঠ উত্তমাধিকারী তরুণ যোগার্থীকে যোগসাধনায় দীক্ষিত করিয়া এবং যোগপথের বিভিন্ন ধারা ও সাধনপ্রক্রিয়ার সহিত পরিচিত করাইয়া, গুরু গোপালনাথ অল্প কাল মধ্যেই শিখাচ্ছেদন পূর্ব্বক তাঁহাকে 'অওঘর'-শ্রেণী-ভুক্ত করিয়া লইলেন, এবং তাঁহাকে নাদ, সেলি ও কৌপীন ধারণ করাইলেন। বাবা গম্ভীরনাথ অবশ্য শুধু বাহ্যতঃ সাধু সাজিলেন না। সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই যেন তিনি পূর্ব্বাশ্রমের সমস্ত স্মৃতি মন হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। তাঁহার নূতন জন্ম হইল। তিনি এক পরমতত্ত্বান্বেষী যোগ-সাধক, ইহা ভিন্ন তাঁহার নিজের কাছেও যেন নিজেব আর কোন পরিচয় রহিল না। কেহ তাঁহার অন্য কোন পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন,—"প্রপঞ্চসে ক্যা হোগা"।

নাথযোগী সাধুদের চরম সাম্প্রদায়িক দীক্ষার প্রধান অনুষ্ঠান কর্ণবেধ। গুরু শিষ্যের দুই কাণে দুইটি বৃহৎ ছিদ্র করিয়া তাহাতে দুইটি কুণ্ডল পরাইয়া দেন। ঐ কুণ্ডল সাধারণতঃ প্রস্তর, বেলোয়ার বা গণ্ডারের শৃঙ্গ দ্বারা নির্ম্মিত হয়। ঐ কুণ্ডলকে নাথযোগীগণ শিবের কুণ্ডল বলিয়া বিশ্বাস করেন। এই কুণ্ডলের নামান্তর 'মুদ্রা' ও দর্শন'। এই

সাম্প্রদায়িক নিয়ম হেতু নাথযোগী সাধুদিগকে 'দর্শনী'-যোগী এবং সাধারণ ভাষায় 'কাণফাটা' যোগী বলা হইয়া থাকে। এই দীক্ষা হইলে সাম্প্রদায়িক বিধানে যোগর্থীর পূর্ণ ত্যাগ বা সন্ন্যাস হইল, এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণরূপে যোগপন্থী ত্যাগী সাধু বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্যে এই কর্ণবেধ ও কুণ্ডলধারণ অত্যাবশ্যক নয়। কিন্তু সাপ্রদায়িক চিরন্তন রীতি অনুসারে নাথযোগী সাথকগণ এই দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন।

গুরু গোপালনাথ শিষ্য গম্ভীরনাথকে সাম্প্রদায়িক বিধানানুযায়ী পূর্ণযোগী করিবার উদ্দেশ্যে, তাঁহার এই শেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি নিজে এই অনুষ্ঠানে গুরুপদ লইলেন না। দেবীপাটনে এই সম্প্রদায়েরই এক বিশিষ্ট যোগী বাবা শিবনাথজীর দ্বারা এই আনুষ্ঠানিক দীক্ষা সম্পাদন করাইলেন। ইহা সাম্প্রদায়িক রীতি-অনুমোদিত। ঐকান্তিক যোগার্থী গম্ভীরনাথের এই সব সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানে কোন আগ্রহও নাই, আপত্তিও নাই। তিনি গুরুর চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। গুরু যখন যেরূপ ব্যবস্থা করেন, যাহা তাঁহার সাধনার জন্যে অনুকুল বিবেচনা করেন, তাহাতেই তিনি রাজী। তাঁহার সাম্প্রদায়িক দীক্ষা সম্পূর্ণ হইল। তিনি গুরূপদিষ্ট সাধনমার্গে আপনার চরম অভীষ্ট লাভের উদ্দেশ্যে দেহমনপ্রাণ নিয়োজিত করিলেন, এবং সাথনায় সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়া যাইবার জন্যে গুরুর অনুমতি প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

কাশী ও ঝুঁসিতে নিবিড় যোগসাধনা।

অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য ও অদম্য তত্ত্বপিপাসা লইয়া নবীন যোগী গম্ভীরনাথ গুরুসেবা, দেবসেবা ও আশ্রমসেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্ত আশ্রমজীবনে ক্রমেই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। এক একটি দিন অতিবাহিত হয়, আর তাঁর ব্যাকুলতা ও তীব্রতর হইয়া উঠে। তিনি সেবাব্রত যথাযথভাবে সম্পাদন করেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তরাত্মা তাহাতে তৃপ্ত হয় না। তিনি গুরুকৃপায় যোগসাধনার বিবিধ কৌশল শিখিয়াছেন; সেই সাধনাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে এবং সাধ্য তত্ত্বকে সম্যক্-রূপে অধিগত করিতে, দীর্ঘকাল নিরন্তর সাধনায় নিমজ্জিত হওয়া আবশ্যক। আশ্রমজীবনের বিবিধ কর্ত্তব্য সম্পাদনের মধ্যে যতটা নিবিড় সাধনার অবকাশ পাওয়া যায়, তাহা মোটেই যথেস্ট নহে। আশ্রমের বাতাবরণও নিরাবিল যোগসাধনার পক্ষে অনুকুল নহে। তিনি কাহারো সঙ্গে বার্ত্তালাপ প্রায় করেনই না; দিনরাত্রির মধ্যে এক মুহূর্ত্তও তিনি বৃথা নস্ট করেন না; হৃদয়ে তাঁহার গুরূপদিষ্ট মন্ত্রের তাৎপর্য্য প্রবলবেগে অহর্ণিশ প্রবহমান; আশ্রমের সর্ব্ববিধ সেবাকার্য্য তিমি ভগবৎ-সেবা-বুদ্ধিতে যোগ সাধনার অঙ্গীয়রূপে সম্পাদন করেন; কোন অবস্থাতেই তাহার তত্ত্ববিচারের বিস্মৃতি ঘটে না; কর্ম্ম

হইতে যখনই অবসর প্রাপ্ত হন,তখনই আসন প্রাণায়াম মুদ্রা প্রভৃতি গুরূপদিষ্ট হঠযোগের প্রক্রিয়া সকলও অনুশীলন করেন। কিন্তু সর্ব্বদাই তাঁহার মনে হয়, এরূপ ভাসা-ভাসা সাধনে জীবনের সম্যক্‌কৃতার্থতা সাধিত হইবে না, চরম তত্ত্বের নিরাবরণ সাক্ষাৎকার হইবে না, শিবত্বে প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভব হইবে না। যোগিগুরু গোরক্ষনাথের জীবনাদর্শ সর্ব্বদা তাঁহার অন্তশ্চক্ষুর সম্মুখে দেদীপ্যমান থাকিত। তিনি যেন তাঁহার আহ্বান শুনিতে পাইতেন। গোরক্ষনাথ প্রভৃতি যে সব মহাপুরুষ তত্ত্বজ্ঞানে যোগৈশ্বর্য্যে ও পূর্ণানন্দে স্থিতিলাভ করিয়া বিশ্বপূজ্য হইয়াছেন, তাঁহারা লোকসঙ্গ বর্জ্জন পূর্ব্বক দীর্ঘকাল নিরন্তর নিবিড়তম যোগ সাধনায় মিমজ্জিত হইয়াই সিদ্ধির উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিয়াছেন। সর্ব্বসঙ্গ বিবর্জ্জিত তীব্র সাধনা ব্যতীত চরমসিদ্ধি অসম্ভব। আশ্রমজীবনে যতদূর সম্ভব যোগানুশীলন তিনি করিতে লাগিলেন। সাধনার যতই আস্বাদ পান, ততই তাঁহার ব্যাকুলতা বাড়িতে থাকে। যতই নূতন নূতন রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়, যতই তত্ত্বরাজ্যের কপাট একের পর এক খুলিয়া যায়, ততই তাঁহার সাধনার আবেগবৃদ্ধি হয়, ততই আশ্রমিক আবেষ্টনী হইতে মুক্তিলাভের প্রয়োজনও তীক্ষ্ণভাবে অনুভূত হয়।

কিন্তু তাঁহার গুরুভক্তি ছিল অপরিসীম তিনি জানিতেন,—

যস্য দেবে পরাভক্তি, যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

গুরুকে তিনি ঈশ্বর স্থানীয়,—বিশ্বগুরু শিবের জীবন্ত বিগ্রহ,-দর্শন করিতেন। গুরুসেবা তাঁহার প্রিয় কার্য্যছিল। গুরুর প্রসন্ন অনুজ্ঞা ব্যতীত আশ্রম ত্যাগ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তিনি প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। গুরু তাঁহার আন্তরিক অবস্থা বুঝিতেন। এরূপ অসাধারণ যোগাধিকারসম্পন্ন শিষ্যকে বেশী দিন আশ্রমের প্রতীকুল আবেষ্টনীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখা যে সঙ্গত হইবে না, তাহা তিনি জানিতেন। তথাপি কিছু কাল সেবাকর্ম্মে তাঁহাকে নিযুক্ত রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াই তিনি আশ্রমত্যাগের অনুমতি দিতে বিলম্ব করিতে লাগিলেন। প্রায় তিন বৎসর তিনি তাঁহাকে আপন সন্নিধানে রাখিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার শিক্ষাও সম্পুর্ণ হইল, সেবাধর্ম্মেও পরিপক্কতা হইল, যোগের বহিরঙ্গ সাধনেও পটুতা হইল, অন্তরঙ্গ সাধনার আবেগও প্রায় চরমে উঠিল। গুরু সময় বুঝিয়া শিষ্যকে আশ্রমত্যাগের অনুমতি প্রদান করিলেন।

গুরুর সস্নেহ অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া তরুণ যোগী গম্ভীরনাথ তাঁহার চরণধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন এবং নিষ্কিঞ্চন জীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি নাথ-মন্দির প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক প্রণাম করিলেন, সাধুদিগকে অভিবাদন করিলেন। অন্তরে অসীমের আকাঙ্ক্ষা, লইয়া প্রশান্ত গম্ভীর ভাবে তিনি সকলের নিকট বিদায় লইলেন।

তিনি আশ্রম ত্যাগ করিলেন, গুরুর স্নেহসিক্ত সান্নিধ্য হইতে দূরে চলিলেন। কোথায় যাইবেন, কোথায় তাঁহার

বাঞ্ছিত সুগভীর যোগসাধনার অনুকূল স্থান মিলিবে, কিছুই ঠিক নাই। পরিচিত বাতাবরণ পরিত্যাগ করিয়া তিনি পদব্রজে চলিতে আরম্ভ করিলেন। গন্তব্যস্থল তিনি নিজেই জানেন না, কাহাকেও বলিবেন কিরূপে? জনকোলাহল বিহীন পথ ধরিয়া তিনি অনির্দ্দিষ্ট যাত্রায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভগবদ্-বিধানে ছিল তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাস। তিনি যেন অন্তরে অন্তরে নিশ্চিত রূপেই জানিতেন যে, তাঁহার লক্ষ্য সিদ্ধির নিমিত্ত যাহা কিছু আবশ্যক হইবে, করুণাময় ভগবান্ই তাহার সমুচিত ব্যবস্থা করিবেন বা করিয়া রাখিয়াছেন। কেবলমাত্র গুরূপদিষ্ট সাধনমার্গে চরম অভীষ্টসিদ্ধির অভিমুখে অবিরাম অগ্রসর হইবার জন্যই তাঁহাকে আপন পুরুষকার প্রয়োগ করিতে হইবে; তদ্ব্যতীত অন্য কোন দিকে দৃষ্টি দেওয়া অনাবশ্যক; তদনুকুল সব বিধিব্যবস্থা করুণাময় ভগবান্ই করিয়া দিবেন। এ সুদৃঢ় বিশ্বাসে তিনি ছিলেন বলীয়ান্, নির্ভীক, নিশ্চিন্ত।

চলিতে চলিতে তিনি কাশীর পথ ধরিলেন। কাশীধাম গোরক্ষপুর হইতে প্রায় সোজা দক্ষিণ দিকে;—দূরত্ব প্রায় ১৫০ মাইল। বিশ্বনাথধাম বারাণসী ক্ষেত্রের প্রতি হিন্দুসাধারণের ন্যায় তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। সংস্কারবশে হোক বা ভগবৎপ্রেরণায় হোক, তাঁহার চিত্তে বিশ্বনাথ দর্শনের সংকল্প উদিত হইল, তিনি কাশীর পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার সম্বলের মধ্যে কৌপীন ও কম্বল। অন্তরে

তাঁহার শিবশক্তিতত্ত্বের অবিচ্ছিন্ন চিন্তাপ্রবাহ। ভোজন ও আশ্রয়ের চিন্তা সে চিত্তে স্থান পায় না। তাঁহার বিচার ছিল,—

ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি সাধকাঃ।
যোহসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ স কিং ভক্তানুপেক্ষতে॥

ভোজন ও আচ্ছাদনের জন্য সাধকগণ বৃথাই চিন্তা করে; যে দেবতা সারা বিশ্বের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন, তিনি কি ভক্তদেরে উপেক্ষা করেন? গীতা সাক্ষাৎ ভগবানের বাণী বলিয়া তিনি বিশ্বাস করিতেন। গীতায় ভগবান্ স্বমুখে যাহা বলিয়াছেন, তাহাত কখনো মিথ্যা হইতে পারে না। ভগবান্ সব ঐকান্তিক ভক্তকে এই অভয়বাণী দিয়াছেন,—

অনন্যা শ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

যাহারা নিত্য নিরন্তর ভগবানের চিন্তা করে, সর্ব্বতোভাবে ভগবানেরই উপাসনা করে এবং একান্তভাবে ভগবানেরই উপর নির্ভর করে, সেই নিত্যাভিযুক্ত, অনন্যমনাঃ ভগবদ্‌গতচিত্ত ভক্তদের যোগক্ষেম ভগবানই বহন করেন, তাহাদের জীবন-ধারণের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, ভগবানই তাহা সংগ্রহ করিয়া দেন।

সুতরাং ঐকান্তিক সাধকদের দেহরক্ষার জন্যে প্রচেষ্টা করা নিতান্তই অনাবশ্যক। এই সুদৃঢ় বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ করিয়া যোগী গম্ভীরনাথ অযাচক বৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক পথ

চলিতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্তে সংকল্পের উদয় হইল যে, তিনি স্বয়ংপ্রবৃত্ত হইয়া ভিক্ষা করিবেন না, অভুক্ত থাকিলেও কাহারো নিকট কিছু বলিবেন না, সর্ব্বদা ভগবানের অহেতুকী কৃপার উপব নির্ভর করিয়া চলিবেন। কাশীর পথেই তাঁহার সংকল্পের দৃঢ়তা এবং একান্তভগবন্নির্ভরতার বেশ পরীক্ষা হইল। জনবিরল পথে তিনি চলিতে লাগিলেন। দুইদিন কেহই ভোজন নিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল না। দেহ কতকটা দুর্ব্বল হইল, কিন্তু তাঁহার সংকল্প দুর্ব্বল হইল না, বিশ্বাস শিথিল হইল না। তিনি প্রতিশ্বাসে ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া, সম্পূর্ণ-রূপে ভগবানের কৃপার উপর নির্ভরশীল হইয়া, ধীর পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তৃতীয় দিনে তাঁহার পরিচিত এক ব্রাহ্মণের সহিত নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণ দেখিয়াই বুঝিলেন, তিনি উপবাসী। তিনি অবশ্য নিজের অভুক্ত অবস্থার কথা কিছু বলিলেন না, নিজের সংকল্পের কথাও জানাইলেন না। ব্রাহ্মণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে কিছুক্ষণ এক ছায়াশীতল স্থানে প্রতীক্ষা করিতে অনুবোধ করিলেন তিনি কিছু অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, ব্রাহ্মণ বলিলেন,— তাঁহাকে কিছু খাওয়াইবার জন্য তাঁহার উপর শ্রীনাথজীর আদেশ। অসত্যা গম্ভীরনাথ বসিলেন। ব্রাহ্মণ দৌড়াইয়া নিকটবর্ত্তী গ্রামে গেলেন। কোথাও পক্কান্ন জুটিল না। তখন চিড়া ও দধি নিয়া তিনি ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া আসিলেন। গম্ভীরনাথ ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহার

ধ্যানভঙ্গ করিলেন এবং আহারের জন্যে অনুরোধ করিলেন। যোগী বুঝিলেন, ইহা ভগবানেরই লীলা। তিনি আহার করিয়া পুনরায় কাশীর অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ গোরক্ষপুরের দিকে চলিলেন। উক্ত ব্রাহ্মণই গোরক্ষনাথ মন্দিরে আসিয়া এই ঘটনা সাধুদের নিকট প্রকাশ করেন।

এইভাবে অন্তরে বিশ্বনাথকে লইয়া, বাহিরে পথ চলিয়া কয়েকদিনে তিনি কাশীধামে পৌছিলেন। কোথায় কি ভাবে তাঁহার আহার জুটিল, কোথায় কিভাবে তিনি রাত্রিযাপন করিতেন, সে সব সংবাদ কেহই জানে না।

কাশী মাহাত্ম্যে ও গঙ্গামাহাত্ম্যে বাবা গম্ভীরনাথের অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি কাশীকে তীর্থের 'রাজা' বলিয়া উল্লেখ করিতেন। তিনি গঙ্গায় অবগাহন করিলেন, বিশ্বনাথ দর্শন করিলেন, বিধিমত পূজার্চ্চনা করিলেন। কাশীকেই তিনি তাঁহার সাধনস্থান করিবেন, এরূপ সংকল্প হয়ত তাঁহার পূর্ব্বে ছিল না। তিনি নিঃসংকল্প হইয়া কাশীতে গঙ্গাতীরে কয়েকদিন অবস্থান করিলেন এবং আপন সাধনায় আত্মনিয়োগ করিলেন। বিশ্বনাথের আকর্ষণে তিনি কাশীতে রহিয়া গেলেন। গঙ্গাতীরে একটি অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থান তাঁহার নিকটে নিবিড় যোগসাধনার অনুকুল বোধ হইল। তখন তিনি কাশীধামে সম্পূর্ণ অপরিচিত। কাশীনগরীতে লোককোলাহল থাকিলেও, তাঁহার সাধন স্থানে কেহ আসিয়া তাঁহার সাধনার বিঘ্ন উৎপাদন করিবে, এরূপ কোন হেতু ছিল

না। অন্য লোকের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করারও তাঁহার অভ্যাস ছিল না, প্রয়োজনও ছিল না। ভোজনাদির জন্যে ভিক্ষাও তিনি করিতেন না। ভগবানের কৃপার উপর একান্ত নির্ভরশীল হইয়া তিনি নিজের মধ্যে নিজে ডুবিয়া থাকিতেন। আহারের ব্যবস্থা কিভাবে হইয়া গিয়াছিল, তাহা জানা যায় না।

স্মরণাতীত কাল হইতে এই মহাতীর্থে বহু একনিষ্ঠ সাধক সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। বহু মহাযোগী মহাজ্ঞানী মহাভক্ত সাধনায় কৃতকৃতার্থ হইয়া জীবন্মুক্ত অবস্থায় এই বিশ্বনাথধামে ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান ব্রহ্মানন্দরসপানে বিভোর হইয়া কালযাপন করিয়াছেন। অনেকে 'বহুজন হিতায় বহুজনসুখায়' জ্ঞানধর্ম্মামৃত বিতরণ করিয়া জীবকল্যাণ সাধন করিয়াছেন। তাঁহাদের আধ্যাত্মিক প্রভাব এখনো ঐকান্তিক সাধকগণ নিবিড় ভাবে অনুভব করিয়া থাকেন। এই মহাতীর্থে ভারতের সকল তীর্থের সমাবেশ,—হিন্দুধর্ম্মার্থিগণের মধ্যে এই প্রবাদ প্রচলিত।

গম্ভীরনাথ অনুকূল স্থান পাইয়া গুরূপদিষ্ট সাধনায় আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিলেন। মন্ত্রযোগ, হঠযোগ রাজযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয় করিয়াই তাঁহার সাধনা ছিল। তিন বৎসর নিত্য নিরন্তর তাঁহার নিবিড় সাধনা চলিতে থাকে। তিন বৎসরের অবিরাম সাধনায় এই স্বভাবতঃ উচ্চাধিকার-সম্পন্ন যোগসাধক অধ্যাত্মারাজ্যে অসামান্য উন্নত স্তরে অধিরোহণ করেন। অন্তঃকরণ শিবশক্তিময় হয়, সূক্ষ্ম মন

বিক্ষেপ হইতেও চিত্তেন্দ্রিয়ের মুক্তিসাধন হয়, হঠযোগের অনেক কঠিন প্রক্রিয়ায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেন, অনেক আলৌকিক শক্তিও অধিগত হয়, শুদ্ধ বুদ্ধিতে ব্রহ্মজ্ঞানের আভাস ফুটিয়া উঠে।

সাধকের জীবনে যখন আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শক্তির বিকাশ হইতে থাকে, লোকালয়ের নিকট থাকিয়া তাহা গোপন রাখা বড়ই কঠিন হয়। অহর্নিশ সাধন নিরত ধীর স্থির গম্ভীর মৌনবান্ যোগী পুরুষ আপনাকে যথাসম্ভব গোপন রাখিতে সচেষ্ট থাকিলেও, কোন না কোন প্রকারে কৌতুহলী জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সাধারণ সাধুদের অপেক্ষা তাঁহার বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে। এক এক জন করিয়া লোকে যত দৃষ্টি দিতে থাকে, তাঁহার বৈশিষ্ট্যও ততই প্রকাশিত হইতে থাকে, এবং লোকের আকর্ষণও বেশী হইতে থাকে। গম্ভীরনাথ তিন বৎসর লোকালয়ের সন্নিকট বাস করিয়াও কোনরূপে আত্মগোপন করিয়া নিরাবিল সাধন ভজনে নিবিষ্ট থাকিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্রমেই ধর্ম্মার্থী লোকসঙ্ঘের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি বেশীমাত্রায় আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার প্রিয় কাশীধাম তাঁহার নিবিড় যোগ সাধনার পক্ষে আর অনুকূল রহিল না। অথচ তাঁহার বিচারে তাঁহার আধ্যাত্মিক সাধনা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র পরিপক্কতা লাভ করিতে আরো সুদীর্ঘকাল তাঁহাকে গভীরতর ভাবে সাধনায় নিমজ্জিত থাকিতে হইবে। সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করিতে তিনি দৃঢ় সংকল্প। যখন তিনি

দেখিলেন যে, বিশ্বনাথধামে বাস করিয়া তাঁহার অভীপ্সিত সাধনায় নিত্য নিরন্তর ডুবিয়া থাকা অসম্ভব, তখন কাহাকেও কিছু না বলিয়া স্থান ত্যাগ করিলেন! পরদিন লোকে দেখিল, যোগী তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে নাই। কোথায় চলিয়া গিয়াছেন, কেহই জানে না।

কাশীধাম্ পরিত্যাগ করিয়া তিনি চলিলেন পশ্চিমাভিমুখে। পরিচিত লোকের দৃষ্টি এড়াইবার জন্যে তিনি বিজন পথ ধরিলেন। প্রয়াগরাজ তাঁহাকে আকর্ষণ করিল। আহারাদির চিন্তা তাঁহার মনেই আসে না। এখন শুধু ভগবন্‌বাক্যে বিশ্বাস নহে, তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা—ঐকান্তিক সাধনের যোগক্ষেম ভগবান্ বহন করেন। অভীষ্টসিদ্ধির চিন্তা ব্যতীত তাঁহার মনে আর কোন চিন্তারই স্থান নাই। চলিতে চলিতে তিনি ত্রিবেণী সঙ্গমে উপনীত হইলেন। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর পুণ্যমিলনতীর্থে তিনি স্নান করিলেন। তাঁহার চিত্তও তখন ঈড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্নার মিলনক্ষেত্র আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ করিয়াছে। তাঁহার কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত এবং সহস্রারে শিবের সহিত আনন্দমিলন লাভের জন্যে যেন ব্যাকুল। তাহার জ্যোতির্ম্ময় দেহ ধীর স্থির গম্ভীর। অন্তঃকরণ যে আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছে, তাহার মধ্যে ডুবিয়া যাইবার জন্যে তার অসীম আগ্রহ।

জনসাধারণের কৌতূহলী দৃষ্টি ও বাহ্যজগতের কোলাহল এড়াইয়া অবিরাম নিবিড় যোগধাধনায় নিমজ্জিত থাকিবার

নিমিত্ত তিনি অনুকুল স্থানের অনুসন্ধান করিলেন। ঐকান্তিক সাধকদিগের সুযোগসুবিধা বিধান করিবার জন্যে যাঁহার করুণাময় হস্ত সদাপ্রসারিত, সেই যোগীশ্বর ভগবানই ঝুঁসিতে জাহ্নবীতীরে একটি নির্জ্জন গুহায় তাঁহার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। গুফাটী গঙ্গার সহিত প্রায় সংলগ্ন। পারের উপর হইতে সহসা সেদিকে কাহারো দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না; উপরের কোলাহলও সেখানে পৌছায়না। ঐকান্তিক সাধক ব্যতীত কেহই সেখানে অতি অল্পকালের জন্যও বাস করিতে পারে না।

নির্জ্জন গুফা পাইয়া যোগীর চিত্ত প্রসন্ন হইল। তাঁহার যেন বোধ হইল, তাঁহারই জন্য গুফাটী প্রতিক্ষা করিতেছে। সেখানে তাঁহার দৈহিক প্রয়োজন সাধন কি ভাবে হইবে, সে প্রশ্ন তাঁহার মনেই উঠিল না। সেখানেই তাঁহার সাধনার পূর্ণতা সম্পাদনের সংকল্প চিত্তে উদিত হইল। তিনি বসিয়া গেলেন। অল্পকাল মধ্যেই বাবা মুকুটনাথ নামক নাথ-সম্প্রদায়েরই এক তরুণ সাধু,—কাহার প্রেরণায় কে বলিবে,—স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেখানে নিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। যোগীর দেহটিকে সুস্থ সবল ও স্বাচ্ছন্দ্যযুক্ত রাখিবার নিমিত্ত যাহা কিছু আবশ্যক, উক্ত সাধু নিকটবর্ত্তী লোকালয় হইতে তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। যোগী যখন যতটুকু আবশ্যক বোধ করিতেন, গ্রহণ করিতেন। সেবকের সহিত তাঁহার বাক্যালাপ কদাচিৎ

হইত। তিনি তাঁহার আরব্ধ যোগসাধনার সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আপনার সকল শক্তি ও সময় নিয়োজিত করিলেন! এখানেও ভগবানের বিধানে তিনি তিনবৎসর-কাল রহিয়া গেলেন। এই সময়ের মধ্যেই যোগ ও জ্ঞানের অত্যুচ্চ শিখরে তিনি আরোহণ করেন।

পঞ্চম অধ্যায়

অনিকেত যোগী

কয়েক বৎসর নিবিড় সাধনায় স্থিরভূমি লাভের পর অনিকেত হইয়া ধ্যান ও সমদর্শিত্ব অভ্যাসের সংকল্প তাঁহার শুদ্ধচিত্তে উদিত হইল। এই অবস্থায় তিনি পরিব্রাজক ভাব অবলম্বন করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী কালের কথাবার্ত্তা হইতে অনুমান হয় যে, ভারতবর্ষের প্রায় সব দুর্গম তীর্থ তিনি নিষ্কিঞ্চন যোগিবেশে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। হিমালয়ের সব দুর্গম রাস্তা ও দর্শনীয় স্থানের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। একবার শিবরাত্রির সময় কয়েকজন সাধু গোরক্ষপুর হইতে নেপালে পশুপতিনাথ দর্শনে যাইতেছিলেন। তিনি তাঁহার যুবক সন্ন্যাসী শিষ্য বাবা শান্তিনাথজীকে তাঁহাদের সঙ্গে পর্য্যটনে বাহির হইতে আদেশ দিলেন। তাঁহার অন্যতর শিষ্য বাবা নিবৃত্তিনাথ তখনও সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই। তিনিও তাঁহাদের সঙ্গী হইতে অনুমতি প্রার্থনা করিলে বাবাজী সানন্দচিত্তে অনুমতি প্রদান করিয়া বলিলেন যে, এই বয়সেই তীর্থ ভ্রমণ করা উচিত। তাঁহারা যখন যাত্রাকালে প্রণাম করিতে গেলেন, তখন বাবাজী তাঁহাদিগকে 'মুক্তিনাথ', 'কৈলাস' ও 'মানস সরোবরে' যাইবার জন্যও আদেশ দিলেন। কয়টি রাস্তা আছে, কোন রাস্তায় কি সুবিধা ও কি অসুবিধা

আছে, কোন্ রাস্তা কতটুকু বিপৎসঙ্কুল, কোথায় কোথায় বিশ্রাম করিতে হইবে, কোথায় কিরূপ ভিক্ষা মিলিবে, কোথায় কিনিয়া খাইতে হইবে, সঙ্গে কি লইতে হইবে, কোথায় কি ভাবে, কি ভাষায় পরিচয় প্রদান করিতে হইবে, ইত্যাদি সকল বিষয়ে বিস্তৃত উপদেশ প্রদান করিলেন। ধ্যানপরায়ণ নীরব যোগীর জাগতিক অভিজ্ঞতার অপ্রত্যাশিত পরিচয় পাইয়া তাঁহারা বিস্মিত হইলেন। উপদেশান্তে তিনি বলিলেন—"ভ্রম ছুট্ জানা চাহিয়ে।"

পর্য্যটনে অনেক প্রকার ভ্রম, সংশয় ও বিপর্য্যয় নষ্ট হয়। পর্য্যটকগণ, বিবিধ দেশের, বিবিধ সমাজের, বিবিধ জাতির, বিবিধ প্রকৃতিবিশিষ্ট লোকের সংস্পর্শে আসিতে বাধ্য হওয়ায় তাহাদের আহার বিহার আচার ব্যবহার মতামত প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা প্রকার বৈচিত্র্য দর্শন করিয়া, অনেক প্রকার সংকীর্ণতা ও ভ্রান্ত ধারণা হইতে মুক্তিলাভ করেন। বিষয়ী দিগের বিষয়মত্ততা ও তাহার পরিণাম সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া এবং বিষয় সংস্পর্শের বহুবিধ দোষ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া সাধক বিষয়-ভোগে বিতৃষ্ণ ও বৈরাগ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। পর্য্যটনের সময় একদিকে যেমন অনেক প্রকার শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ ভোগ করিতে হয়, অন্যদিকে তেমনি অনেক প্রলোভনও সম্মুখে উপস্থিত হইয়া থাকে। এই ক্লেশস্বীকার যত অভ্যস্ত হয় এবং প্রলোভনকে যত জয় করা যায়, চিত্ত ততই দৃঢ়রূপে লক্ষে সংলগ্ন হয়, আত্ম-বিশ্বাস ততই বর্দ্ধিত হয়, ভবিষ্যতে পতনের সম্ভাবনাও

ততই অল্প হয়। ভিক্ষা প্রভৃতি উপলক্ষে অনেক নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও নানারূপ অনাদর, অপমান ও লাঞ্ছনা আসিয়া আধ্যাত্ম জীবনের প্রধান শত্রু অভিমানকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে থাকে। অনেক সময় ভীষণ বিপদ হইতে নিতান্ত অভাবনীয় উপায়ে মুক্তিলাভ করিয়া অনন্যাশ্রয় পর্য্যটক গুরু ও ভগবানের নিত্যসান্নিধ্যে ও অবিরাম-প্রবাহিনী করুণাধারায় সুদৃঢ়বিশ্বাসী হইয়া থাকেন।

একাকী বিপদসঙ্কুল পথে চলিতে চলিতে চিত্ত নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ভগবান্‌কেই দৃঢ়রূপে আকড়াইয়া ধরিতে অভ্যস্ত হয়। নিষ্কিঞ্চন অবস্থায় নিতান্ত অপরিচিত স্থান সমূহে ভ্রমণ করিবার সময়ও যখন দেখা যায় যে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া যাইতেছে, কখন কি ভাবে কোথা হইতে কি জুটিয়া যায়, তাহাও অনেক সময় বুঝিতে পারা যায় না,—তখন ভগবান্ যে যোগক্ষেম বহন করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে সমস্ত সংশয় বিদূরিত হয়। নানা দৃশ্য-দর্শনের পিপাসা মানুষের একটি স্বাভাবিক বৃত্তি। প্রধান প্রধান স্থান সমূহ দর্শন করিলে সেই ঔৎসুক্যও নিবারিত হইয়া যায়।

এইরূপে, পর্য্যটন দ্বারা নানা প্রকার ভ্রম বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বলিয়াই পর্য্যটন সাধনের এক অবস্থায় বিশেষ উপকারী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিশেষতঃ পর্য্যটনকালে অনেক দৃঢ়-বৈরাগ্যবান, নিয়ত-ভজনশীল, একনিষ্ঠ, আত্মসমাহিত সাধক ও সিদ্ধ মহাপুরুষের সংসর্গ লাভ হওয়ায় মুমুক্ষুতা ও

সাধনে ঐকান্তিকতা অনেক পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। 'যুবা বয়সে' পর্য্যটন শেষ করিয়া তৎপরে সমাধিযোগ অভ্যাস করিলে সাধন সুকর হয়। বাবা গম্ভীরনাথ এই হেতু স্বীয় শিষ্যগণকে তীর্থ-যাত্রা ও পর্য্যটনে উৎসাহিত করিতেন।

ভারতবর্ষের উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম সব প্রান্তের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ ও তপোভূমিইত তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। প্রায়ই পদব্রজে গমন করিতেন। তবে, তাঁহার পর্য্যটনের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। অনিকেত অবস্থায় সাধনাভ্যাসই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তিনি যে সর্ব্বদা চলিতেই থাকিতেন, তাহা নয়; সাধনার উপযোগী স্থান পাইলে, কোথাও এক মাস, কোথাও দুই মাস, কোথাও চারি মাস বা ছয় মাস পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া সাধনে ডুবিয়া যাইতেন; আবার চলিতে আরম্ভ করিতেন। অবস্থিতির জন্য কোথাও সুবিধামত গুফা পাইলে, তাহার মধ্যে আসন পরিগ্রহ করিতেন, নচেৎ অধিকাংশ সময় বৃক্ষতলে বা মুক্ত-আকাশতলেই অবস্থান করিতেন। তাঁহার সম্বলের মধ্যে একখানি কম্বল, একটি "খাপ্‌রা" এবং পরিধানে একখানি কৌপীন ছিল। কেশজাল অবজ্ঞাত হইয়া প্রাকৃতিক নিয়মবশে জটার আকার ধারণ করিয়াছিল। অবস্থিতিকালে বা ভ্রমণ-কালে কোন অবস্থাতেই তাঁহার গাম্ভীর্য্য ও অন্তর্মুখীনতার ব্যতিক্রম হইত না। তাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদাই তত্ত্বে নিবদ্ধ, অন্তঃকরণ সতত অন্তর্য্যামীর চিন্তাতেই নিমগ্ন। কথাবার্ত্তা নিজে ত প্রায় কখনই বলিতেন না, তপস্যা ও গাম্ভীর্য্যের

প্রতিমাস্বরূপ তাঁহার মূর্ত্তিখানি দেখিয়া আগন্তুকেরাও অবাক্ হইয়া দর্শন করিত, কোন কথাবার্ত্তার অবতারণা করিতে সাহসী হইত না।

প্রয়াগ রাজ হইতে অন্তর্য্যামীর প্রেরণায় নানা স্থান ঘুরিয়া তিনি নর্ম্মদাতটে উপনীত হন। তাঁহার ভ্রমণের বিবরণ কিছু জানা যায় না। নর্ম্মদা আর্য্য ঋষিগণের পবিত্রতম সপ্ত নদীর মধ্যে একটী। এই নদীর উভয় তীরবর্ত্তী তপস্যার অনুকূল স্থান সমূহে অসংখ্য মহাপুরুষ সাধন-ভজনে ও সৎকর্ম্মে জীবন সার্থক করিয়া মানবত্বের চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। নর্ম্মদার উৎপত্তিস্থল হইতে সমুদ্রসঙ্গম পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান এরূপ মহিম মণ্ডিত যে, নর্ম্মদা পরিক্রমা মোক্ষের অনুকূল অতিশয় পবিত্রকর্ম্ম বলিয়া হিন্দু সাধকগণ বিশ্বাস করেন।

নিষ্কাম নিষ্কিঞ্চন যোগী গম্ভীরনাথ নর্ম্মদাতীরে পৌঁছিয়া নর্ম্মদা পরিক্রমায় ব্রতী হইলেন। অন্তরে তাঁহার শিবজ্ঞান শিবধ্যান শিবময় ভুবনদর্শন, বাহিরে যন্ত্রচালিতবৎ পথ চলা। অনবরত চলিতে থাকা তাঁহার স্বভাব ছিল না। তিনি কোন প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য লইয়া তীর্থ ভ্রমণ করিতেন না। নদীটীর দুই পাড় ঘুরিয়া পুণ্যার্জ্জন করার তাঁহার আগ্রহ ছিল না। নিজের অভ্যন্তরে ডুবিয়া গিয়াই যেন, তিনি পবিত্র তীর্থসমূহের আধ্যাত্মিক ভাব প্রবাহে অবগাহন করিতেন। চঞ্চল চিত্তে চঞ্চল ইন্দ্রিয়গ্রাম লইয়া দৌড়াদৌড়ি করিয়া যাঁহারা তীর্থ-ভ্রমণের কর্ত্তব্যটি ‘যেন তেন প্রকারেণ’ সারিয়া ফেলেন,

তাঁহারা তীর্থমাহাত্ম্য বুঝিতে পারেন না। মহাভারতে মহর্ষি পুলস্ত্য ভীষ্মদেবকে বলিতেছেন,—

"যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফল মশ্নুতে॥
প্রতিগ্রহাদপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অহঙ্কার নিবৃত্তশ্চ স তীর্থফল মশ্নুতে॥
অকলঙ্কো নিরারম্ভো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ স তীর্থফল মশ্নুতে॥
অক্রোধনশ্চ রাজেন্দ্র সত্যশীলো দৃঢ়ব্রতঃ।
আত্মোপমশ্চ ভূতেষু স তীর্থফল মশ্নুতে॥

যাঁহার হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মন সুসংযত; এবং বিদ্যা, তপশ্চর্য্যা ও কীর্ত্তি সুসংযত, (অর্থাৎ যিনি কখনও বিদ্যা ও তপঃশক্তির অপপ্রয়োগ করেন না, এবং যিনি কোনরূপ অসৎ কর্ম্ম দ্বারা কীর্ত্তি অর্জ্জন করেন না), তিনিই তীর্থফল লাভ করেন। প্রসন্নচিত্তে প্রদত্ত বা অহিংসা পূর্ব্বক উপার্জ্জিত নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অতিরিক্ত কিছু যিনি গ্রহণ করেন না, যিনি যদৃচ্ছলাভে সন্তুষ্ট ও অহঙ্কারশূন্য, শাঠ্যবিহীন, দম্ভবিহীন, জিতেন্দ্রিয়, ও পাপপ্রবৃত্তি বর্জ্জিত, ক্রোধহীন, সত্যশীল, দৃঢ়ব্রত ও সর্ব্বভূতে মৈত্রী সম্পন্ন, তিনিই তীর্থের সম্যক্ মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন।

কি ভাবে তীর্থ ভ্রমণ করিতে হয়, কি ভাবে তীর্থ ভ্রমণ করিলে যথার্থ কল্যাণ লাভ হয়, তাহার আদর্শ বাবা গম্ভীরনাথ

প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। যে সব মহাপুরুষ ভাবি জীবনে লোকগুরুর আসন ও "লোকসংগ্রহের" ভার গ্রহণ করেন, তাঁহাদের জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ যে কোন কার্য্য আলোচনা করিলেই এই ধারণা জন্মে যে, প্রথম হইতেই তাঁহাদের চরিত্র যেন কোন অজ্ঞাত শক্তির প্রেরণায় জনসাধারণের আদর্শ হইয়া বিকাশ প্রাপ্ত হইতে থাকে। বাবা গম্ভীরনাথ চলিতে চলিতে যখন দেখিতেন যে, কোন স্থান পূর্ব্বগত সিদ্ধমহাত্মাদের তপঃ প্রভাবে বিশেষ মাহাত্ম্য-সমন্বিত এবং বর্ত্তমানেও সাধনের বিশেষ অনুকূল, তখন সেখানে গভীর ধ্যানে ডুবিয়া যাইতেন ; অবস্থানুসারে হয়ত একমাস, দুইমাস বা ততোঽধিক কাল সেখানে যোগের অন্তরঙ্গ সাধনায় নিবিষ্ট থাকিতেন ; তারপর আবার চলিতে আরম্ভ করিতেন। তাঁহার নিবিড় সাধন ও তীর্থভ্রমণ উভয় কর্ম্মই একসঙ্গে চলিত। নর্ম্মদার উৎপত্তি স্থল শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ মহাতীর্থ অমরকন্টকে তিনি অপেক্ষাকৃত অধিক সময় সমাধি-অভ্যাসে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এইরূপে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি প্রায় চারি বৎসরে নর্ম্মদা পরিক্রমা শেষ করিয়াছিলেন।

নর্ম্মদা পরিক্রমার পর তিনি আরও বহু তীর্থে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কোন্ কোন্ স্থানে গিয়াছিলেন, তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নহে। যে সব স্থানের কথা জানা গিয়াছে, তন্মধ্যে কোন্ কোন্ স্থানে এই পরিব্রাজক ভাবে গিয়াছিলেন এবং কোন্ কোন্ স্থানে জীবন্মুক্ত অবস্থায়

গিয়াছিলেন, তাহা ঠিক্ না জানায়, এক সঙ্গেই পরে সে বিষয়ের উল্লেখ করা যাইবে।

পর্য্যটনের সময় তিনি অনেক লৌকিক অভিজ্ঞতা লাভ এবং অনেক 'অলৌকিক' ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক। সাধারণ দৃষ্টিতে যাহা অলৌকিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এরূপ অনেক ঘটনা জগতে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই ঘটিয়া থাকে। সাধারণতঃ যাহা আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়ীভূত হয় না, অথবা সাধারণজ্ঞানে যাহার কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলা নির্দ্দেশ করিতে আমরা সমর্থ হই না, তাহাকেই আমরা 'অলৌকিক' আখ্যা প্রদান করিয়া থাকি। কিন্তু বস্তুতঃ লৌকিক ও অলৌকিকের মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট সীমারেখা অঙ্কিত করা চলে না। আমাদের জ্ঞানবৃদ্ধি ও ইন্দ্রিয় শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেক অলৌকিক ব্যাপার লৌকিকের অন্তর্ভুক্ত হইতে থাকে। যোগিগণ ও জ্ঞানিগণ যোগ ও জ্ঞানের অনুশীলন দ্বারা প্রাকৃতিক নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়াই এরূপ অনেক শক্তি ও জ্ঞান লাভ করেন, যাহা তদ্রূপ-অনুশীলন-বিহীন সাধারণ লোকে নিতান্ত অপ্রাকৃত বা অলৌকিক বোধ করিয়া থাকে। আমরা যে সব ব্যাপার ও যে সব পদার্থ দর্শন করিয়া থাকি, তৎসম্বন্ধেও যদি অধিকাংশ লোক কোন ভ্রান্ত-ধারণা পোষণ করে, তবে সেই ভ্রান্ত-ধারণাকেই অনেক সময় আমরা লৌকিক জ্ঞান বলিয়া থাকি, এবং কোন তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি তৎসম্বন্ধে সত্যজ্ঞান উপদেশ করিলে তাহা অলৌকিক

জ্ঞান মনে করি। আবার স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা, কাম, লোভ, অহঙ্কার, মিথ্যাচার, প্রভৃতির ফলে এবং উপযুক্ত অনুশীলনের অভাবে আমাদের ইচ্ছা শক্তি ও ইন্দ্রিয় শক্তি সাধারণতঃ নিতান্ত ক্ষীণ ও দুর্ব্বল থাকে বলিয়া এই ক্ষীণ ও দুর্ব্বল শক্তিকেই আমরা মন ও ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক শক্তি বলিয়া ভুল ধারণা করি ; এবং যেরূপ শক্তির বিকাশ আমরা সাধারণ লোকের মধ্যে দেখিতে পাই না, তাহা কোথাও দেখিলেই অলৌকিক বা অস্বাভাবিক ভাবিয়া চমকিত হই। যাঁহারা দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের বিশুদ্ধি সম্পাদন এবং জ্ঞান ও যোগের বিশেষ অনুশীলন দ্বারা জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছাশক্তির সমুচিত শোধন ও বিকাশ সাধন করেন, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা ও কার্য্যকলাপ প্রাকৃতিক বিধানের বহির্ভূত না হইলেও সাধারণ লোকের চক্ষে তাহা অলৌকিক প্রতীয়মান হয়। মহাপুরুষগণ তাঁহাদের অনুশীলনলব্ধ অসাধারণ জ্ঞান ও শক্তি উপযুক্ত শিষ্যের নিকট ভিন্ন প্রায়শঃ অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হন না। বাবা গম্ভীরনাথের তত্ত্বৈকনিষ্ঠ দৃষ্টিতে এই সব অলৌকিক জ্ঞান শক্তি ও অভিজ্ঞতার কোন আধ্যাত্মিক মূল্য ছিল না। এসবও যেন তিনি প্রপঞ্চের মধ্যেই ধরিতেন। এ সম্বন্ধে কেহ কোন প্রশ্ন করিলেও নিতান্ত উপেক্ষার সহিতই জবাব দিতেন। কোন যোগৈশ্বর্য্য প্রকাশ ত তাঁহার স্বভাবের বিপরীতই ছিল।

বাবা শান্তিনাথ ও বাবা নিবৃত্তিনাথ যে দিন কৈলাস ও

মানস সরোবর পর্য্যটনান্তে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের নানারূপ অভিজ্ঞতার কথা শ্রীগুরুচরণে নিবেদন করিতেছিলেন, এবং কোন কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা দ্বারা নিজেদের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া নিতেছিলেন, সেইদিন কথাপ্রসঙ্গে দু'একটি অলৌকিক ঘটনার বিষয় বাবাজী তাঁহাদের নিকট উল্লেখ করিয়াছিলেন। উক্ত শিষ্যদ্বয়ের নিকট শ্রুত একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

নর্ম্মদার তীরে হাটিতে হাটিতে একদা দৈবাৎ তিনি একটি নির্জ্জন কুটীরের সমীপবর্ত্তী হইলেন। একজন ব্রহ্মচারী ঐ কুটীরে থাকিয়া সাধন ভজন করিতেন। তিনি তখন উপস্থিত ছিলেন না, বাবা গম্ভীরনাথ স্থানটির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করিলেন এবং ধ্যানমগ্ন হইলেন। তিনি তিন দিন সেখানে ছিলেন। প্রতিদিনই তিনি দেখিতেন যে, একটি প্রকাণ্ড সর্প ফণা বিস্তার করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়, কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকে, তৎপর তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া যায়। এরূপ সর্প তিনি পূর্ব্বে কখন দেখেন নাই। সর্পটির অদ্ভুত আকৃতি ও বিস্ময়কর ব্যবহার দর্শন করিয়া তিনি সমাধিস্থ হইয়া যাইতেন। তৃতীয় দিবসে ব্রহ্মচারী প্রত্যাগত হইলে কথা-প্রসঙ্গে ব্রহ্মচারী বাবাজীর নিকটে বলিলেন যে সেখানে সর্পদেহ ধারণ করিয়া এক আলোক-সামান্য মহাত্মা বাস করেন বাবাজীও তখন ব্রহ্মচারীকে তদ্দৃষ্ট অদ্ভুত সর্পের বিবরণ জানাইলেন। ব্রহ্মচারী অবাক্ হইয়া

তাঁহাকে বলিলেন, 'আমি এই সর্পটিকে দেখিবার উদ্দেশ্যেই এখানে কুটীর বাঁধিয়া ১২ বৎসর যাবৎ প্রতীক্ষা করিতেছি। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত ইহার দর্শন পাই নাই। আর আপনি আগন্তুকরূপে আসিয়া তিনদিনই এই মহাত্মার দর্শন পাইলেন আপনি বড় ভাগ্যবান্।' এই সর্পরূপী মহাত্মা কোন্ সূত্রে ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক পরিজ্ঞাত হইয়াছিল, কি হেতু কি অভিপ্রায়ে বা কি উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত, তাঁহাকে সর্পরূপ গ্রহণ করিতে হইয়াছে, ব্রহ্মচারীর সঙ্গেই বা তাহার এমন কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে যে তাহার দর্শনলাভের উদ্দেশ্যে তিনি বার বৎসর তপোরত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন, তাঁহার দর্শন পাইলেই বা ব্রহ্মচারীর কি কৃতার্থতা লাভ হইবে, এত নিকটে থাকা সত্ত্বেও দর্শন ঘটিতেছে না কেন, বাবা গম্ভীরনাথকে প্রতিদিন দর্শন করিতে আসা ও প্রদক্ষিণ করারই বা কি কারণ থাকিতে পারে, এরূপ অনেক প্রশ্নই স্বভাবতঃ মনে উদিত হয়। বাবাজীর উক্ত শিষ্যদ্বয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া এসব প্রশ্নের কোন উত্তর সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তিনি যদি কথাপ্রসঙ্গে হঠাৎ কোন অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া ফেলিতেন, তবে তৎসম্বন্ধে অন্যান্য প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তিনি হয় লৌকিক ভাবেই তাহার ব্যাখ্যা দিয়া কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতেন, অথবা নীরব থাকিতেন; ইহাই তাঁহার শিক্ষার প্রণালী ছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কপিলধারায় অন্তরঙ্গ যোগসাধনা

বাবা গম্ভীরনাথ ধ্যাননিষ্ঠ চিত্তে নানা স্থানে পর্য্যটন করিবার পর পুনরায় কোন নিভৃত গুহায় সুনির্দ্দিষ্ট আসনে দীর্ঘকাল-ব্যাপী তীব্রতর অভ্যাস যোগে নিরত হইবার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন। এখনো তাঁহার পূর্ণাঙ্গ যোগের চরম সিদ্ধিতে অচলাস্থিতি লাভ হয় নাই। এই সময়ে একবার তিনি গুরুধাম দর্শন করিতে গোরক্ষপুর আসেন। পর্য্যটক সাধুদের মুখে মুখে তখন তাঁহার অসাধারণ যোগসাধনার কথা নানাস্থানে প্রচারিত হইয়াছে। গোরক্ষনাথ মন্দিরে তাঁহার গুরুদেব ও অন্যান্য সাধুগণ তাঁহার যশোগাথা শ্রবণে গৌরবান্বিত। তাঁহাকে আশ্রমে পাইয়া তাঁহারা ছাড়িতে চান না। তাঁহাকে সকলের অনুরোধে কয়েক মাস মন্দিরে অবস্থান করিতে হইল। কিন্তু যাঁহার চিত্ত যোগের চরম ও পরম পূর্ণতা লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত, তিনি কি লোকসঙ্গে বেশীদিন থাকিতে পারেন? তিনি গভীর ধ্যানে ব্রহ্ম-ভূত হইয়া চরম জ্ঞান ও চরম আনন্দের আস্বাদ লাভ করিয়াছেন, কিন্তু সর্ব্বাবস্থায় সেই জ্ঞান ও আনন্দকে অনাবৃত ও অবিক্ষিপ্ত রাখিতে এখনো পূর্ণরূপে অভ্যস্ত হন নাই। এখনো যোগ-শাস্ত্রোপদিষ্ট কায়সিদ্ধি তাঁহার সম্যক্ আয়ত্ত হয় নাই, পিণ্ড

ও ব্রহ্মাণ্ডের সম্যক্ সমরসত্বের অনুভূতি তাঁহার স্বভাবে পরিণত হয় নাই, অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির উপর সম্যক্ বিজয় সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, অন্তরে বাহিরে সমভাবে সর্ব্বক্ষণ শিব-শক্তির লীলা বিলাস দর্শন ও আস্বাদন স্বাভাবিক জীবন প্রবাহের অঙ্গীভূত হয় নাই। এখনো তাঁহার সমাধি ও জাগরনের, নিদ্রা ও ব্যুত্থানের, সমত্ব সম্পাদিত হয় নাই। লোকচক্ষুতে তিনি সিদ্ধ পুরুষ প্রতীয়মান হইলেও, তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি এখনো অপূর্ণ রহিয়াছে। তিনি কি তাঁহার অধিগত জ্ঞান ও শক্তির আস্বাদন লইয়াই তৃপ্ত থাকিতে পারেন? তিনি কি যোগজীবনের মাঝখানেই তাঁহার তীব্র সাধনার পরিসমাপ্তি করিতে পারেন? আশ্রমে বাবা গম্ভীরনাথ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিলেন এবং অচিরেই সকলের সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরুদ্দেশ যাত্রা করিলেন।

নিরাবিল যোগাভ্যাসের অনুকূল স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে অন্তর্য্যামীর প্রেরণায় তিনি গয়ার সমীপবর্ত্তী ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের সানুদেশে কপিলধারায় উপস্থিত হইলেন। এই স্থানটি তাঁহার বড়ই পছন্দ হইল। মানুষের হাতে পড়িয়া স্থানটির বাহ্যাকৃতি এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, বাবা গম্ভীরনাথের প্রথম দর্শন কালে ইহার অবস্থা কেমন ছিল, তাহা অনুভব করিবার জন্য একটু কল্পনাশক্তির আশ্রয় লইতে হয়। বর্ত্তমানে সেখানে পরমহংস রতনগিরি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের পাকাবাড়ী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের নিবিড়তার সঙ্গে

কৃত্রিমতার আড়ম্বর যোগ করিয়া দিয়াছে। কয়েকজন সাধু নিয়তভাবে সেই আশ্রমে বাস করায়, এবং সহর হইতে মাঝে মাঝে সেখানে লোকজন যাতায়াত করায়, স্থানটাকে এখন সম্পূর্ণ নির্জ্জন বলা চলে না। কিন্তু বাবা গম্ভীরনাথ যখন নিরবচ্ছিন্ন যোগাভ্যাসের জন্য এই স্থানটি মনোনীত করেন, তখন এ সব কিছুই ছিল না। দুই একজন বৈরাগ্যবান্ নির্জ্জন-প্রিয় সাধক ব্যতীত অন্য লোক অতি অল্পই সেখানে গমনাগমন করিত। স্থানটির প্রাকৃতিক অবয়ব সন্নিবেশ যেমন মনোরম, তেমনি সাধনের অনুকূল। তিন দিকে উচ্চ ও অনুচ্চ নানা-শ্রেণীর পাহাড়ের প্রাচীর স্থানটিকে পরিবেষ্টন করিয়া তাহার নির্জ্জনতা ও গাম্ভীর্য্যকে নিরাপদ ও সৌন্দর্য্য মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে; তন্মধ্যে ব্রহ্মযোনি সর্ব্বোচ্চ। অন্যদিক দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ গিরিপথ বক্রগতিতে অগ্রসর হইয়া লোকালয়ের সহিত তাহার সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছে। স্থানটি দুরারোহ গিরিশৃঙ্গের উপরে অবস্থিত নয়, অথচ নিম্নের সমতল ভূমি হইতে অনেক উচ্চে; দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ নয়, অথচ মাঝে মাঝে বৃক্ষচ্ছায়া সুশোভিত; ছোট বড় বৃক্ষ শ্রেণী লতা-পল্লব-সমাচ্ছন্ন শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া সূর্য্য কিরণ প্রবাহের কোমলতা সম্পাদন করিতেছে। তাহারাও যেন ধ্যাননিষ্ঠ যোগী। পার্ব্বত্য হিংস্রপশুও তাহাদের নিম্নে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়, হিংসা-বিহীন নির্ভীক সাধুসন্ন্যাসীও বিশ্রাম লাভ করেন। সেখানে শৈত্যেরও তীক্ষ্ণতা নাই, উত্তাপেরও প্রাখর্য্য নাই; সমীরণ

সতত মৃদুমন্দ গতিতে প্রবাহিত হইয়া স্নেহ-মধুর হস্তে ব্যজন করিতে করিতে চলিতেছে ; কেহ তাহার সেবা গ্রহণ করিতেছে কিনা সেদিকে দৃষ্টি প্রদান করিবার অবসর তাহার নাই। একটি ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী কি যেন কি শান্তিপ্রদ মন্ত্র সুললিত ছন্দে আপন মনে গাহিতে গাহিতে এদিক্ ওদিক্ ঘুরিয়া ফিরিয়া সমতল ভূমির দিকে অনবরত অগ্রসর হইতেছে। এই নির্ঝরিণীই কপিলধারা। পিপাসায় জল প্রদান করিয়া, সঙ্গীতালাপে অবসাদ ও সন্তাপ বিদূরিত করিয়া, স্নান আচমন শৌচাদি ক্রিয়ার জন্য স্বচ্ছসলিলের সরবরাহ করিয়া, দেহমনের মালিন্য ধৌত করিয়া, এবং অন্যান্য নানাবিধ উপায়ে স্নেহময়ী তপস্বিনী কপিলধারা সাধকদিগকে ও সমাগত অতিথিদিগকে সেবা করিয়া থাকে। ব্যাঘ্রাদি জন্তু সকলও তাহার সেবা হইতে বঞ্চিত হয় না। কপিলধারার নিকটে,—সমতল ভূমির অনেকটা কাছে—কপিলেশ্বর শিবের প্রাচীন মন্দির। সেই মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে কয়েকটি উচ্চ বৃক্ষ শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া মন্দিরটিকে সুশীতল করিয়া রাখিয়াছে।

যদিও বর্ত্তমানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা, লোকচলাচলবৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে স্থানটীর নির্জ্জনতা ও গাম্ভীর্য্যের এবং প্রাকৃতিক নগ্ন-সৌন্দর্য্যের অনেকটা হানি হইয়াছে, তথাপি এই স্থানটি যে সাধনার বিশেষ উপযুক্ত, শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিদের তাহা সহজবোধ্য। একজন বহির্মুখ ব্যক্তিও যদি নিবিষ্টমনে ক্ষণকাল এখানে কোন বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া, মস্তকোপরি সুনীল আকাশ, চতু-

পার্শ্বে উচ্চনীচ পর্ব্বত শ্রেণী, কপিলধারার মৃদু মধুর সঙ্গীত, অশ্বত্থ বৃক্ষের একতান সর্‌সর্‌ ধ্বনি, নিম্নদেশে সমতল ভূমির পদার্থ-রাজির ক্ষুদ্রতা প্রভৃতি উপভোগ করিতে থাকেন, তবে স্থানের স্বাভাবিক প্রশান্ত গম্ভীর উদাসভাব ক্রমশঃ হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসে, প্রাণ উদাস হইতে থাকে, চক্ষু অপনা আপনি নিমীলিত হইয়া আসে, সমস্ত চিত্ত আত্মসমাহিত হইতে চায়। এই স্থানটী পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, তাহা যদি কল্পনা নেত্রে দর্শন করিয়া লওয়া যায়, তবে ধারণা হয় যে, স্থানটি বাবা গম্ভীরনাথের ন্যায় মহাযোগীর সাধনারই উপযুক্ত ছিল।

বিশেষতঃ গয়াক্ষেত্র হিন্দুদিগের একটী প্রধান তীর্থ ও তপোভূমি। সেখানে গয়াসুরের মস্তকোপরি বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদান একটী প্রধান পারলৌকিক ক্রিয়া হিন্দুমাত্রেই বিশ্বাস করেন যে, যাহার উদ্দেশ্যে গয়ায় পিণ্ডদান করা যায়, সেই মৃতব্যক্তির জীবাত্মা প্রেতযোনি হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয়, সে কোন বিশেষ পাপের ফলে নীচ যোনিতে জন্মিয়া থাকিলে, তাহা হইতে শীঘ্র মুক্তি লাভ করে, এবং সে যেখানেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকুক না কেন, এবং যে অবস্থাতেই অবস্থান করুক না কেন, সেখানেই এই পিণ্ডদানের ফলে সে সুখ অনুভব করে ও তাহার কষ্টের লাঘব হয়। বাবা গম্ভীরনাথও এই বিশ্বাস সমর্থন করিতেন, এবং গয়ায় পিণ্ডদান করিতে উপদেশ দিতেন।

জগদ্‌গুরু বুদ্ধদেব বুদ্ধগয়ায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, ইহা

সর্ব্বজন বিদিত। কলিপাবনাবতার চৈতন্যদেবের হৃদয়-প্রস্রবণ-বিনিঃসৃত যে ভক্তি ও প্রেমের বন্যা বঙ্গদেশ ও দাক্ষিণাত্য প্লাবিত করিয়াছিল, গয়াতেই তাহা তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়া প্রথম প্রবাহিত হয়। যাঁহার সাধনা ও উপদেশ নবীন বঙ্গের হৃদয়ে ভক্তিভাব ও সাধুসঙ্গলিপ্সা বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া দিয়াছে এবং যাঁহার প্রভাবে বঙ্গভূমি ভক্তিভূমি বলিয়া পরিচিত হইয়া সাধুসমাজের বিশেষ স্নিগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, সেই মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও গয়াতেই কপিলধারার সমীপবর্ত্তী আকাশ-গঙ্গাপাহাড়ে সদ্‌গুরুকৃপা লাভ ও তীব্র সাধন ভজন করিয়াছিলেন। কত মহাযোগী মহাজ্ঞানী গয়ার নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্যস্থান-সমূহে সাধন ভজনে নিমজ্জিত হইয়া মানবজীবনের চরম কল্যাণ লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। বহু সাধন গুহা ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। যাঁহারা সিদ্ধি-লাভান্তে জীবের প্রতি করুণাবশতঃ লোকালয়ে লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবে জ্ঞান ও ধর্ম্মের জ্যোতি বিকিরণ করেন, লোকে তাঁহাদেরই কথা জানে, এবং তাঁহাদেরই মধ্যে কোন কোন অসাধারণ-প্রভাব-সম্পন্ন মহাত্মার নাম ও কার্য্যকলাপের বিবরণ, ইতিহাস, কাব্যকলা সাহিত্য প্রভৃতিতে স্থান লাভ করে। কিন্তু যে সকল লোকোত্তর মহাপুরুষ লোকশিক্ষার বাসনাকেও বাসনা বলিয়া পরিত্যাগ করেন, করুণাকেও বন্ধন মনে করিয়া চিত্ত হইতে বিদায় করেন, তাঁহারা লোকচক্ষুর অন্তরালে পার্ব্বত্য গুহাদিতে অবস্থান

করিয়াই চিরজীবন আত্মানন্দ সম্ভোগ করিয়া যথাকালে দেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বিদেহ মুক্তিলাভ করেন : তাঁহাদের সাধনা ও তত্ত্ব-জ্ঞানের শক্তি জগতের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিধান অনুসারে অলক্ষিত ভাবে অপরাপর সকল মানুষের অন্তঃকরণের উপর,—মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনের উপর—জাগতিক জীবন প্রবাহের গতির উপর—অনিবার্য্য প্রভাব বিস্তার করিলেও, তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রায়শঃ কিছুই জানিবার উপায় থাকে না, তাঁহাদের খোঁজ খবরও প্রায় কেহই গ্রহণ করেন না।

ভারতবর্ষের সাধন জীবনের আদর্শ যেরূপ, তাহাতে লোক-সমাজে পরিচিত যথার্থ মহাপুরুষ অপেক্ষা, অপরিচিত, নিরন্তর সাধননিরত, সমাধি-আনন্দে বিভোর, যথার্থ মহাপুরুষের সংখ্যা অধিক বলিয়াই অনুমান হয়। গয়ার শৈলাঞ্চলে এরূপ জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অনেক সাধক সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। হিমালয় ব্যতীত গয়ার পর্ব্বত শ্রেণীর মত সাধনার অনুকূল স্থান অতি বিরল। তাই অসংখ্য সাধক লোকের জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে চিরকাল এসব স্থানে সাধন করিয়া আসিতেছেন। বাবা গম্ভীরনাথও এই স্থানকেই তাঁহার সাধনার চরম অবস্থায় নিগূঢ়তম যোগাভ্যাসের জন্য মনোনীত করিলেন।

বাবা গম্ভীরনাথ যখন কপিলধারায় আসন গ্রহণ করিলেন, তখন সেখানে আশ্রমাদি ত দূরের কথা, কোন গুফা বা পর্ণকুটীরও ছিল না। তিনি দিবস রজনী উন্মুক্ত আকাশতলে

ঐকান্তিক সাধন ভজনে অতিবাহিত করিতেন। কখন কখন ব্রহ্মযোনি প্রভৃতি উচ্চ পর্ব্বতোপরি গমন পূর্ব্বক সমাধিনিমগ্ন হইতেন, কখন বা পর্ব্বতগাত্রে অথবা স্বাভাবনির্ম্মিত গহ্বরে সমাসীন হইয়া আত্মসমাহিত ভাবে অবস্থান করিতেন, প্রায়শঃ কপিলধারাতেই কোন বৃক্ষতলে বা আকাশতলে ধ্যানস্তিমিত লোচনে আত্মানন্দ সম্ভোগে ডুবিয়া থাকিতেন। শীত গ্রীষ্ম তাঁহার নিকট সমান ছিল। বর্ষার বারিধারা শিরোপরি বর্ষিত হইতেছে, যোগিরাজ স্থিরাসনে প্রসন্নচিত্তে নিশ্চলভাবে বসিয়া আছেন, কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ছিলেন,—সঙ্গে কোন সাধু বা সেবকও থাকিত না। পরিধানে একখানি মাত্র কৌপীন, গাত্রে একখানি মাত্র কম্বল, এবং দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে একটি খর্পর (বা নারিকেল নির্ম্মিত পাত্র বিশেষ) ও একটি ফৌরী (যোগদণ্ড বিশেষ)।

কিন্তু এরূপ অনন্যচেতা সাধকদের 'যোগক্ষেম বহনের' ব্যবস্থা ভগবান্ পূর্ব্বেই করিয়া রাখেন। তিনি গয়ায় যাইবার অত্যল্প কাল পরেই আক্কু কুর্ম্মী নামক এক নিম্ন জাতীয় দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহার দর্শন লাভ করে। সে কাষ্ঠাদি সংগ্রহের জন্য কপিলধারা প্রভৃতি পার্ব্বত্য স্থানে গমনাগমন করিত। এই নিষ্কিঞ্চন ধ্যাননিষ্ঠ সাধুকে দর্শন করিয়া সে—কি জানি কাহার প্রেরণায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সেবা করিতে আরম্ভ করে। এই নীচকুলোদ্ভব ধনহীন জ্ঞানহীন লোকটি কোন অলক্ষ্যশক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়াই যেন সাধুর কি প্রয়োজন, তাহা

বুঝিতে পারিত,—এবং তাঁহার কোন আদেশ বা ইঙ্গিতের অপেক্ষা না করিয়া আপনা আপনি ধ্যানমগ্ন সাধুর ধূনীর জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ করিত, ধূনী জ্বালাইয়া রাখিত, আহারের জন্য ফলমূল দুগ্ধাদি আয়োজন করিয়া আনিত, এবং অন্যান্য বিবিধ উপায়ে মহাযোগীর শরীরটীর সময়োপযোগী স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে চেষ্টা করিত। এই গরীব বেচারীর পরিবারও নিতান্ত ক্ষুদ্র ছিল না। তাহারা দুই ভাই, উভয়ের স্ত্রী ও কয়েকটি পুত্রকন্যা ছিল। দুই ভাইকে কেবলমাত্র শারীরিক পরিশ্রম দ্বারাই পরিবারের ভরণপোষণ করিতে হইত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আক্কু এই মহাপুরুষের সেবায় তাহার অনেক সময় ও শক্তি নিয়োজিত করিত। ইহাই তাহার সকল কর্ত্তব্যের মধ্যে যেন শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইল। তাহার দেখাদেখি তাহার ভাই মুন্নিও আসিয়া সাধুসেবায় যোগদান করিল। ক্রমে সমস্ত আক্কু পরিবার বাবা গম্ভীরনাথের একনিষ্ঠ সেবক হইয়া উঠিল। তাহারা তাঁহার সেবা করিত, তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা আপন মনে তাঁহার নিকট বলিয়া যাইত,—তিনি শুনিতেছেন কিনা বা শুনিলেও কোন প্রতিবিধান করিবেন কিনা, তদ্বিষয়ে কোনরূপ চিন্তা করাই যেন তাহারা প্রয়োজন মনে করিত না,—কোন বিপদে পড়িলে তাঁহার নিকট নিবেদন করিয়াই নিশ্চিন্ত হইত। বাবা গম্ভীরনাথেরও পরবর্ত্তী জীবনের ব্যবহারে বোধ হইত যে, তিনি যেন আপনাকে আক্কু পরিবারের নিকট চির ঋণে আবদ্ধ মনে করিতেন। তিনি

জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এই পরিবারের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্নেহদৃষ্টি রক্ষা করিয়াছেন ; ইহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পরে প্রদত্ত হইবে।

দুইমাস কি ততোধিক কিছু সময় এইরূপে অতিবাহিত হইলে পর, একজন যোগধর্ম্মপিপাসু সাধক তাঁহার সঙ্গ লাভ করেন। ইনি বাবা নৃপৎনাথ। তিনি তখন গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায় সদ্‌গুরুর অন্বেষণ করিতেছিলেন। বাবা গম্ভীরনাথের দর্শন লাভ করিয়া তিনি দীক্ষাপ্রার্থী হন। কিন্তু বাবাজী শিষ্য করিতে সম্পূর্ণ অসম্মত। বীরসাধক নৃপৎনাথও ভগ্নমনোরথ না হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করিয়া, গুরুসেবাই মোক্ষের উপায় বোধে তাঁহার সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। তদবধি নৃপৎনাথ কদাচিৎ তাঁহার সঙ্গ ছাড়া হইয়াছেন। বাবাজী যখন সাধনে নিমগ্ন, নৃপৎনাথ তখন তাঁহার দেহের রক্ষণে ও সাচ্ছন্দ্যবিধানে ব্যাপৃত। তিনি তাঁহার আহারাদির ব্যবস্থা ত করিতেনই, অধিকন্তু তাঁহার সাধনে কোনরূপ বিঘ্ন না হয়, তদুদ্দেশ্যে বীরসেবক নৃপৎনাথ অনেক-সময় ভৈরবের বেশ ধারণ পূর্ব্বক ত্রিশূল হস্তে হিংস্রজন্তু বিতাড়িত করিতেন, লোকজন আসিয়া নির্জ্জনতা ভঙ্গ করে বা কোনরূপ উদ্বেগ জন্মায় এই আশঙ্কায় প্রয়োজন বোধে কখন কখন আগন্তুকদিগকেও ভীতি প্রদর্শন করিতেন।

নৃপৎনাথ আদর্শ গুরুর আদর্শ সেবক ছিলেন। তবে,

তাঁহার রুদ্রভাব কিছু বেশী ছিল। শ্রদ্ধালু আগন্তুকদিগের প্রতি রুদ্রভাব প্রকাশের জন্য মাঝে মাঝে তিনি গুরুকর্তৃক ভর্ৎসিত হইতেন। কিন্তু কোমলপ্রাণ প্রেমিক সাধককে নিরাবিল সাধনের সুযোগপ্রদান করিবার জন্য সম্ভবতঃ সেবকের কতকটা রুদ্রভাবের প্রয়োজন ছিল। ১৩।১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে সেবা করার পরও বাহ্যতঃ গুরুদেব সেবককে কোনরূপ মন্ত্রদীক্ষা প্রদান করেন নাই। ইহাতে নিষ্কাম সেবকের মাহাত্ম্য আরও অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছিল, এবং এই নিষ্কাম সেবাদ্বারা বাস্তবিকই নৃপৎনাথ কৃতার্থ হইয়াছিলেন। সাধন জীবন শেষ হইবার পরে অপরাপর অনেক সাধুর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে যেন বাধ্য হইয়াই গুরুজী নৃপথনাথকে বাহ্যতঃ দীক্ষা প্রদান করেন।

আক্ ও নৃপৎনাথের দ্বারা সেবিত হইয়া কিছুকাল বাবাজী স্বচ্ছন্দভাবে কপিলধারায় সাধনে নিমগ্ন থাকেন। তৎপর গ্রহণ উপলক্ষে তিনি একবার কাশীতে গমন করেন। তখন তিনি নাথসম্প্রদায়ের গোরখ্‌টিলাতেই কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময় বাবা শুদ্ধনাথ তাঁহার অনন্যসাধারণ ভাবগম্ভীর তেজোমণ্ডিত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং সেবকরূপে তাঁহার সঙ্গে গয়ায় আসেন। শুদ্ধনাথও তদবধি নৃপৎনাথের সহকারী রূপে কায়মনোবাক্যে বাবাজীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। এইরূপে তিনি বহুকাল গুরুসেবাদ্বারা আত্মশুদ্ধি লাভ করিয়া, নৃপৎনাথের দীক্ষার

কয়েকমাস পরে, বাবাজীর চেলা হওয়ার অধিকার পান। বাবাজীর সাধন-জীবনে এই তিন জনই প্রধান সেবক। তিন জনেরই সৌভাগ্য অনন্যসাধারণ। তন্মধ্যে আক্কু বহুদিন পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিয়াছিল। বাবাজীর মহাসমাধির ৫।৬ মাস পূর্ব্বে বাবা নৃপৎনাথের তিরোধান হয়। বাবা শুদ্ধনাথ তারপরও কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন তাঁহার নিকট হইতেই বাবাজীর সাধন জীবন-সম্বন্ধে অধিকাংশ তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। এতদ্‌ভিন্ন আর দুইজন ধনী গৃহস্থও গয়ায় সাধনের সময় বাবাজীর সেবা করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। একজন গয়াব মাধোলাল গয়ালি, আর একজন পাটনার মতিলাল ঘোষ। মাধোলালের সহিত পরিচয়ের পর কপিলধারায় গুফা নির্ম্মাণ ও অন্যান্য সর্ব্ববিধ ব্যয়ের ভার প্রায় তিনিই বহন করিয়াছেন।

কপিলধারা পাহাড়ের নিম্নে খর্পর ভৈরব নামক স্থানে নৃপৎনাথ ও শুদ্ধনাথ ক্ষুদ্র একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া লইয়াছিলেন। সেখানেই তাঁহারা আহার, শয়ন ও বিশ্রাম করিতেন। বাবা গম্ভীরনাথ পাহাড়ের উপরে নিষ্কিঞ্চন, নিরালম্ব ও নিরাশ্রয় ভাবে ধ্যানমগ্ন থাকিতেন, আর সেবকদ্বয় যখন যাহা প্রয়োজন তাহা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতেন এবং অবসর সময়ে নীচে আসিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেন। এই ভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইতে থাকিলে, ক্রমেই লোকপরম্পরায় 'খুব বড় মহাত্মা' বলিয়া কৌতুহলী লোকসমাজে তাঁহার নাম প্রচারিত হইতে থাকে। ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের চতুষ্পার্শ্বে নিভৃত স্থান সমূহে

যে সকল সাধক পরমার্থান্বেষণে নিরত ছিলেন, তাঁহারাও তাঁহার প্রভাব অনুভব করিয়া তাঁহাকে বিশেষ ভাবে ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পবিত্র সান্নিধ্যে চিত্ত সহজে সমাহিত হইবে, এই আশায় অনেক মহাত্মা রাত্রিকালে নিজ নিজ আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার নিকটে আসিয়া আসন গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহার সহিত ধ্যানে যোগ দিতেন। দিবাভাগে অনেক শ্রদ্ধাবান্ গৃহী সকামভাবে বা নিষ্কামভাবে তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া আসিতে লাগিলেন। তিনি কখন কখন লোকদৃষ্টি পরিহার করিবার জন্য সুগভীর নির্জ্জন প্রদেশে চলিয়া যাইতেন, কখন কখন নৃপৎনাথ লোকজনের যাতায়াতে বাধা প্রদান করিতেন, কখন কখন বা তিনি নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া আপন ভাবে অবস্থান করিতেন এবং ভক্তিমান্ দর্শন-লিপ্সুগণ দর্শন ও প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেন।

এই সময় মাধোলাল পাণ্ডা একটি ভীষণ মোকর্দ্দমায় জড়িত হইয়া পড়েন। মোকর্দ্দমায় পরাজয় ঘটিলে, তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, অথচ জয়লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনাও আপাতদৃষ্টিতে লক্ষিত হইতেছিল না। এরূপ অবস্থায় স্বভাবতঃই সংসারী লোকের হৃদয়ে আত্যন্তিক দীনতার সঞ্চার হয় এবং ভগবদ্ভক্তি ও সাধুভক্তিও অতিমাত্রায় বর্দ্ধিত হয়। তিনি বাবা গম্ভীরনাথের অসাধারণ তপঃপ্রভাবের সংবাদ অবগত হইয়া দীনভাবে ও আর্ত্তির সহিত তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন এবং তাঁহার সেবায় দেহ, প্রাণ ও মন ঢালিয়া দিলেন। আর্ত্ত এবং অর্থার্থী ভক্তও

যদি স্বীয় কামনাপূর্ত্তির উদ্দেশ্যে অকপট ও ব্যাকুল হৃদয়ে ভগবানের বা ভগদ্‌গতপ্রাণ মহাপুরুষের চরণে আত্মসমর্পণ করেন, তবে ভগবানের ও মহাপুরুষের কৃপায় কেবলমাত্র তাঁহার কামনারই পূর্ত্তি হয় না, অধিকন্তু তাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধি লাভ করিয়া আর্ত্তি ও অর্থপিপাসা হইতে মুক্ত হয় এবং অহৈতুকী ভক্তির অধিকারী হয়। বাবা গম্ভীরনাথ কখনও কোন অলৌকিক যোগশক্তি প্রকাশ করিতেন না, সুতরাং প্রকাশ্যভাবে কোন অলৌকিক শক্তি প্রয়োগ করিযা তিনি যে সকাম সেবকের হৃদ্‌গত প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন, তাহা সম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি দয়ার্দ্র চিত্তে ভক্ত মাধোলালের প্রতি কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, এবং একদিন তাঁহাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া সহজভাবে—'আচ্ছাই হোগা' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন ও বিষাদগ্রস্ত হইতে নিষেধ করিলেন। যথাসময়ে মাধোলাল নিতান্ত অপ্রত্যাশিতরূপে হাইকোর্টে জয়লাভ করেন। এই জয়লাভ যে মহাপুরুষের কৃপা ও আশীর্ব্বাদেরই ফল, তৎসম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন সন্দেহই উদিত হইল না। তদবধি মাধোলাল বাবাজীর একজন বিশিষ্ট অনুগত ভক্ত হইলেন, তাঁহার সেবার ভিতরে যে সকাম ভাব ছিল, তাহা বিদূরিত হইল, তিনি নিষ্কাম ভাবে বাবার সেবায় নিযুক্ত হইলেন এবং যে কোন উপায়ে তাঁহার কিছু স্বাচ্ছন্দ্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হইলেই তিনি আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিতেন।

কিছুকাল পরে বাবাজীর নিবিড় সাধনার জন্য কপিলধারায়

একটি যোগগুহা প্রস্তুত করিয়া দিবার সংকল্প তাঁহার মনে উদিত হইল। তদ্বিষয়ে তিনি বাবাজীর অনুমতি প্রার্থনা করিলেন এবং বাবাজীও অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। কি ভাবে গুহা নির্ম্মাণ করিতে হইবে, সেবকের আগ্রহে তৎসম্বন্ধেও বাবাজী উপদেশ দান করিলেন। তদনুসারে মাধোলাল বাবাজীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাঁহার উপদেশানুযায়ী সুন্দর একটি যোগগুহা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিতে লাগিলেন। এই গুহার সন্নিকটে একটি বেদীও নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং বেদীর মধ্যস্থলে একটি বিল্ববৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল। বাবাজী স্বহস্তে সেই বেদীর উপর কয়েকটি ত্রিশূল প্রোথিত করিয়াছিলেন। বেদীর চারি কোণে চারিটি আসন স্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত যোগগুহা এবং তৎসংলগ্ন বেদী প্রভৃতি এখনও বর্ত্তমান আছে। এই গুহায় যোগিরাজ গম্ভীরনাথ নিয়মিত ভাবে ১২।১৩ বৎসর ঐকান্তিক যোগসাধনে নিমগ্ন ছিলেন।

হঠপ্রদীপিকায় যোগমঠের যেরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়, সম্ভবতঃ সেই প্রণালীতেই তিনি এই গুহা নির্ম্মাণের উপদেশ দিয়াছিলেন।

স্বল্পদ্বারমরন্ধ্রগর্ত্তপিটকং নাত্যুচ্চনীচায়তম্,
সম্যগ্ গোময়সান্দ্রলিপ্ত মমলং নিঃশেষবাধোজ্ঝিতম্।
বাহ্যে মণ্ডপকূপবেদিরুচিরং প্রাকারসম্বেষ্টিতম,
প্রোক্তং যোগমঠস্য লক্ষণমিদং সিদ্ধৈর্হঠাভ্যাসিভিঃ॥

যোগমঠ ক্ষুদ্রদ্বার বিশিষ্ট, রন্ধ্র গর্ত্তাদিশূন্য, স্বল্পায়তন, নাতি-উচ্চ, নাতিনিম্ন, গোময়লিপ্ত ও পরিষ্কার হইবে; যোগবিঘ্নকর কোন জীব বা বস্তু সেখানে থাকিবে না; বহির্ভাগ মণ্ডপ, কূপ ও বেদী দ্বারা শোভিত হইবে, এবং প্রাচীরের বেষ্টন থাকিবে। হঠযোগাভ্যাসী সিদ্ধগণ যোগমঠের এইরূপ লক্ষণ বর্ণন করিয়া থাকেন।

এই স্থানটি স্বভাবতঃই যোগমঠের লক্ষণযুক্ত, তাহাতে যোগগুহা নির্ম্মিত হইয়া ইহার পূর্ণাঙ্গতা সম্পাদন করিল।

যোগগুহা প্রস্তুত হইলে তিনি প্রথম কিছুদিন গভীর ধ্যান ও গুহ্য যোগাঙ্গাভ্যাসের জন্য গুহায় প্রবেশ করিতেন, এবং অন্য সময় বাহিরে পূর্ব্ববৎ অবস্থান করিতেন। মাঝে মাঝে গুহার ভিতরে গভীর ধ্যানে এমনভাবে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন যে, দিনরাত্রির মধ্যে একবারও গুহার বাহিরে আসিতেন না। কখন কখন একদিন কি দুইদিন অন্তর একবার মাত্র বাহিরে আসিতেন। অনেক সময় সেবকেরা আহার্য্য ও পানীয় সংগ্রহ পূর্ব্বক বাহিরে প্রতীক্ষা করিতেন, তিনি কখন বাহির হইবেন ঠিক নাই। সমাধিভঙ্গে যখন তিনি বাহির হইতেন, তখন খাদ্যাদি কিছু গ্রহণ করিতেন, এবং দর্শনার্থী কেহ উপস্থিত থাকিলে দর্শন দিতেন। তৎপরে কিছুদিন সপ্তাহে মাত্র দুইবার করিয়া বাহিরে আসিতেন। তখনও আহারাদির ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। এইভাবে কয়েকমাস অতিক্রান্ত হইলে তিনি নিয়ম করিলেন যে সদাসর্ব্বদা গুহার

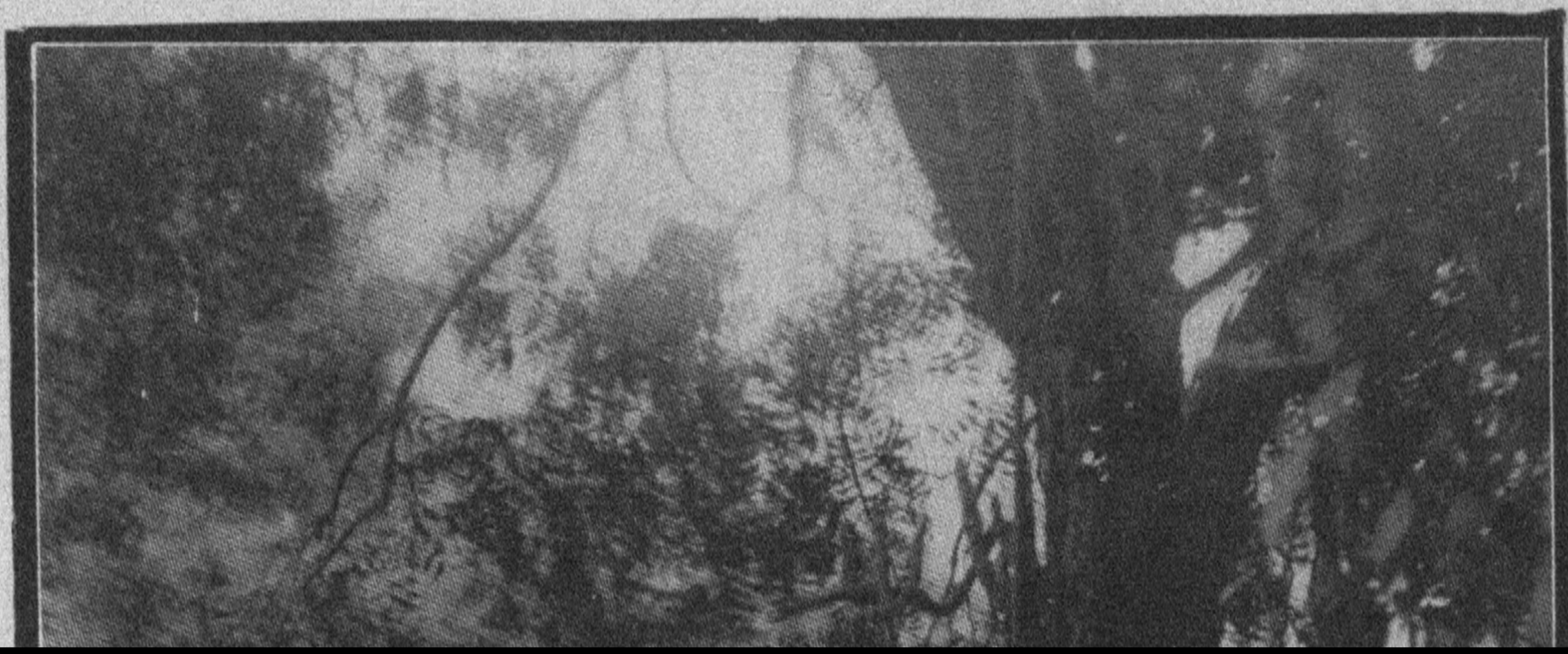

মধ্যেই তিনি সাধনে নিমগ্ন থাকিবেন, সপ্তাহে কেবলমাত্র মঙ্গলবার বৈকালে একবার বাহিরে আসিয়া কয়েক ঘণ্টা অবস্থান করিবেন। সেবকেরা বলেন যে এই নিয়মে তিনি দুই বৎসর সাধন করিয়াছিলেন। সে সময়ে সেবকেরা প্রতিদিন একপোয়া পরিমাণ দুগ্ধ তাঁহার গুহার ভিতরে রাখিয়া আসিতেন। গুহার ভিতরে দুইটি প্রকোষ্ঠ; অন্তঃপ্রকোষ্ঠে তিনি ধ্যানমগ্ন থাকিতেন। সেবকগণেরও তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। তাঁহারা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে গুহার বহিঃপ্রকোষ্ঠে ভিতরের দরজার সম্মুখে দুগ্ধটুকু রাখিয়া দিতেন। ধ্যান যখন একটু শিথিল হইত, তখন তিনি তাহা পান করিতেন। মলমূত্র ত্যাগেরও কোন প্রয়োজন হইত না।

গয়াবাসী অনেকেই এই সময়ে তাঁহাকে অলোকসামান্য মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। মঙ্গলবার অপরাহ্নে তাঁহার দর্শন প্রত্যাশায় বহুসংখ্যক লোক নিজেদের শক্তি অনুসারে ফল, মূল, মিষ্ট প্রভৃতি সেবার উপযোগী দ্রব্য সামগ্রী লইয়া গুহার বাহিরে বেদীর নিকটে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। তিনি সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে গুহা হইতে বহির্গত হইয়া বেদীর উপরে স্বহস্তপ্রোথিত ত্রিশূলের নীচে একটি আসনে উপবেশন করিতেন। কখন কখন কিছু ফল গ্রহণ করিতেন ও তামাক সেবন করিতেন। কথাবার্ত্তা প্রায় কখনও বলিতেন না। তবে, ঈষৎ স্নিগ্ধ মধুর দৃষ্টিতে সমাগত দর্শকবৃন্দের মন প্রাণ ভিজাইয়া দিতেন। কাহারও আনীত কোন জিনিষ একটু স্পর্শ করিলে তাহারা

আপনাদের ভাগ্যকে সহস্র ধন্যবাদ দিয়া কৃতার্থ হইয়া যাইত। অধিকাংশ সময় ঐসব জিনিষের প্রতি একটু গ্রহণসূচক দৃষ্টিপাত করিয়া উপস্থিত সকলের মধ্যে তাহা প্রসাদরূপে বন্টন করিয়া দিতে ইঙ্গিত করিতেন। তাঁহার নয়ন প্রান্ত হইতে তেজ, শান্তি ও করুণা যুগপৎ বিকীর্ণ হইয়া উপস্থিত লোকদিগকে বিমোহিত ও অভিভূত করিয়া ফেলিত। তিনি কোন উপদেশ বা আশ্বাসবাণী মুখে উচ্চারণ না করিলেও, তাঁহার মূর্ত্তিখানিই যেন সকল কর্ম্ম ও কোলাহলের অতীত; সকল দুঃখ ও জ্বালার অতীত, সকল ভেদ ও ভয়ের অতীত, আনন্দময়, শান্তিময়, অমৃতময় কোন রাজ্যের বার্ত্তা বহন করিয়া আনিত, এবং অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য উপস্থিত সকলেরই হৃদয় তাঁহার সান্নিধ্যে সংসারের যাবতীয় দুর্ব্বাসনা ও জ্বালাযন্ত্রণা ভুলিয়া সুশীতল হইয়া যাইত। এতদ্‌ব্যতীত অন্য কোন যোগৈশ্বর্য্য তিনি কখনও প্রকাশ করিতেন না।

কোন লৌকিক কামনা লইয়া যাহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত, তাহারাও তাঁহার লোকাতীত ভাবগম্ভীর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া প্রায়শঃ সে কামনার কথা ভুলিয়া যাইত, কামনার তরঙ্গ অত্যন্ত প্রবল হইয়া মাঝে মাঝে হৃদয়কে আঘাত করিলেও তাহা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিতে সাহস বা প্রবৃত্তি হইত না। যদি কেহ কখন কামনার বেগ ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহার নিকট তাহা নিবেদন করিতে চেষ্টা করিত, তাহা হইলেও তিনি পূর্ব্ববৎ নীরবই থাকিতেন তাঁহার মুখে চোখে কোন

প্রকার ভাবান্তর লক্ষিত হইত না; এমন কি, তাঁহার কানে সে কথা প্রবেশ কবিয়াছে কিনা তাহাও বুঝা যাইত না। কিন্তু তাহাতেও তাহাদের আগমন ও নিবেদন ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া তাহারা মনে করিত না। এইরূপে কয়েক ঘণ্টা বাহিরে অবস্থান করিয়া আবার এক সপ্তাহের জন্য তিনি যোগগুহায় প্রবেশ করিতেন; দর্শকবৃন্দও কেহ কেহ প্রাণের আনন্দে তাঁহার লোকোত্তর-চরিত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে, কেহ কেহ বা নীরবে তাহা সকল হৃদয় দিয়া অনুভব করিতে করিতে, স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইত।

সপ্তাহান্তে নির্গমনের নিয়ম পালন পূর্ব্বক প্রায় দুই বৎসর কাল সাধন করিবার পরে, তিনি পক্ষান্তে একবার মাত্র গুহার বাহিরে আসিতে আরম্ভ করিলেন। তখন তিনি প্রত্যেক অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় বাহিরে আসিতেন। যখন অহর্নিশ ধ্যান-নিবিষ্ট অবস্থায় অতিবাহিত হইত, সে সময়ে দিন ক্ষণ তিথি নক্ষত্র ও কালাকাল বিচারের যে কোন সম্ভাবনাই ছিল না, তাহা সহজেই অনুমেয়। এরূপ অবস্থায় নিয়মিত দিনে বাহিরে আসা বা অন্য কোন নিয়ম রক্ষা করা বিস্ময়কর বোধ হইতে পারে। কিন্তু তীব্র ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন বিশুদ্ধসত্ত্ব মহাত্মাগণ ধ্যানে নিবিষ্ট হইবার প্রাক্‌কালে যদি কোন সংকল্প রাখিয়া দেন, তবে সেই পূর্ব্বসংকল্প অনুসারেই যথাসময়ে আপনা আপনি কাজ হইয়া থাকে; সেই বহুদিন পূর্ব্বের সংকল্পই বহুদিন পরের ক্রিয়ার নিয়ামক কারণ হয়। বাবা গম্ভীরনাথের গুহা প্রবেশের

সময়ে সম্ভবতঃ তদ্রূপ কোন সংকল্প থাকিত, সুতরাং তদনুযায়ী নির্দ্দিষ্ট দিনে তিনি বাহির হইতে পারিতেন। হয়ত তাঁহার শরীররক্ষা ও যোগসাধন সৌকর্য্যের জন্য এরূপ সংকল্পের প্রয়োজনীয়তা ছিল ; হয়ত বা ভবিষ্যতে লোকানুগ্রহের নিমিত্ত যে তাঁহাকে কতক পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিতে হইবে, তজ্জন্য মাঝে মাঝে বহির্জগতের সহিত তাঁহার সম্পর্ক রাখা আবশ্যক ছিল, অথবা হয়ত সেই সাধনাবস্থাতেও তিনি বাহ্যত ঔদাসীন্যের প্রতিমূর্ত্তি হইলেও অন্তরে লোকশিক্ষা ও লোকহিত সাধনে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন না, এবং সেই হেতু ব্যবহারিক জগতের সহিত তিনি সকল সম্বন্ধ ছেদন করিতে ইচ্ছা করিতেন না। যে কোন কারণেই হউক, কার্য্যতঃ দেখা যাইত যে, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট দিনে বাহিরে আসিয়া দর্শনবুভুক্ষু জনগণকে কয়েক ঘণ্টার জন্য সঙ্গদানে কৃতার্থ করিবার নিয়মটি লঙ্ঘিত হইত না।

কয়েক বৎসর পক্ষব্যাপী গুহানিবাসের অভ্যাসের পর তিনি মাসব্যাপী গুহানিবাসের অভ্যাস আরম্ভ করিলেন। অন্যান্য ব্যবস্থা অবশ্য তখনও একরূপই চলিতে লাগিল। গুহায় অবস্থান কালে, দিবারাত্রে আহার এক পোয়া মাত্র দুগ্ধ, মল-মূত্র ত্যাগের অপ্রয়োজনীয়তা, মাসান্তে বাহিরে আসিয়া কয়েক ঘন্টার জন্য বেদীতে উপবেশন, সমাগত জনগণের প্রতি কৃপা-দৃষ্টিদান এবং তাহাদের আনীত ফলাদি হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ পূর্ব্বক উপস্থিত সকলকে প্রসাদবিতরণ,—এই ভাবেই তাঁহার কাল অতিবাহিত হইতে লাগিল।

অবশেষে একবার তিনি গুহায় প্রবেশ করিয়া তিন মাসের মধ্যে আর বাহিরে আসিলেন না। এই তিন মাস নিয়ত অবিচ্ছেদে সমাধি নিরত থাকার পরে যখন তিনি গুহা হইতে বহির্গত হইলেন, তখন তাঁহার বিধিপূর্ব্বক যোগাভ্যাসের শেষ হইল। তাহার পর আর তিনি নিয়ম পূর্ব্বক গুহানিবাসী হন নাই। তখন হইতে অনিয়মে কখন তিনি গুহায় অবস্থান করিতেন, কখনও বা বাহিরে থাকিতেন। অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই সময়ে তিনি মানবজীবনের চরম সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন ; ব্রাহ্মী স্থিতির আদর্শ তাঁহার জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাঁহার ভিতর বাহির এক হইয়া গিয়াছিল। তদবধি তিনি দেহস্থ থাকিয়াও নিত্য নিরন্তর ব্রহ্মভূত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

মহাসিদ্ধি

কাশীধামে ও ঝুঁসিতে কয়েক বৎসর তীব্র সাধনার ফলেই যোগিরাজ গম্ভীরনাথ ব্রহ্মবিৎ হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পরিচিত সাধুদের বিশ্বাস। তখন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা তাঁহার সকল সংশয় তিরোহিত হইয়াছিল, সর্ব্ববিধ বাসনা নির্ম্মূল হইয়াছিল, দেহাত্মাবোধ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল, সংসারের পরপার সম্বন্ধে তাঁহার অপরোক্ষজ্ঞান লাভ হইয়াছিল —এইরূপ অনুমান করিবার হেতু বিদ্যমান আছে। কিন্তু সমাধিতে ব্রহ্মের উপলব্ধিই সাধনার চরম-অবস্থা নয়, এই অবস্থা লাভ করিলেই মানব জীবনের সম্যক্ পরিপূর্ণতা সম্পাদিত হয় না। সংসারের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপে সন্তাপিত মানব তাহা হইতে মুক্ত হইবার উদ্দেশ্যে যে অমৃতের অনুসন্ধানে বহির্গত হয়, ব্রহ্মদর্শন ঘটিলেই সেই অমৃতের আস্বাদন হয় বটে, কিন্তু শুধু তাহাতেই মানব জীবনের চরম-সফলতা লাভ হয় না,—ইহা অপেক্ষাও মানবের উন্নত-তর, পূর্ণ-তর অবস্থা লাভের অধিকার আছে।

মানুষ যে কত বড়, সে যে কত উচ্চ অধিকার লইয়া মানবদেহ গ্রহণ পূর্ব্বক সংসার ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছে,

তাহার হৃদয়-রত্নাকরের মধ্যে যে কত রত্ন লুক্কায়িত আছে ; অজ্ঞানতা বশতঃ তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়াই সে অল্প লইয়া কাড়াকাড়ি মারামারি করে, অল্পের জন্য দাসত্ব ও ভিক্ষুকত্ব স্বীকার করে, অল্প পাইলেই সাময়িক ভাবে নিজেকে কৃতার্থ মনে করে। গুরু ও ভগবানের চরণে যিনি আত্ম-সমর্পণ পূর্ব্বক সুদৃঢ় বিশ্বাস, ভক্তি ও বিচারের সাহায্যে মনোরূপ মন্থন দণ্ডকে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে পরিচালিত করিয়া হৃদয়সমুদ্র মন্থন করেন, তিনি স্বকীয় অতলস্পর্শ হৃদয়-রত্নাকরের অন্তঃস্থল হইতে নিত্য নূতন রত্ন লাভ করিয়া চমৎকৃত হইতে থাকেন ; কিন্তু যতই নূতন নূতন অচিন্তিতপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও আনন্দ হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার উপলব্ধি গোচর হইতে থাকে, তাঁহার আশা ততই আরও বলবতী হয়, আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস ততই প্রবল হয়, স্বকীয় হৃদয়ের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ততই অধিক বিস্ময়াত্মক জ্ঞান লাভ হয়। তখন ঐ সকল ঐশ্বর্য্যকেও অকিঞ্চিৎকর বোধ করিয়া নূতন-তর ও পূর্ণ-তর ঐশ্বর্য্য ও আনন্দ লাভের উদ্দেশ্যে তিনি মন্থন কার্য্যও ক্রমশঃ অধিকতর আগ্রহের সহিত চালাইতে থাকেন।

হৃদয় হইতে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ রূপ অমৃত উত্থিত হইলেও এই মন্থন কার্য্য শেষ হয় না, সমস্ত হৃদয় অমৃতময় হইয়া যাওয়া চাই, সমস্ত দেহেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ সর্ব্বাবস্থায় ব্রহ্মভাবে ভাবিত ও ব্রহ্মরসে রসিত হইয়া থাকা চাই, জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে

একই ব্রহ্মতত্ত্ব সর্ব্বত্র দর্শন করা চাই। সমাধি অবস্থায় ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইলেই, ব্রহ্ম ও আত্মার পারমার্থিক অভেদ অনুভব করিলেই সেই পরিপূর্ণ ব্রহ্মভাব লাভ হইল না, সমাধি অবস্থায় অদ্বৈতসিদ্ধি ও ব্যুত্থান অবস্থায় দ্বৈতদর্শন হইতে থাকিলে, জ্ঞান সম্পূর্ণ পরিপাকপ্রাপ্ত হইল না, ধ্যানাবস্থা ও জাগ্রদবস্থায় দৃষ্টির পার্থক্য থাকিলে জীবনের সম্পূর্ণ ঐক্য সম্পাদিত হইল না এবং আনন্দ অব্যাহত হইল না। যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মভাব সম্পূর্ণরূপে স্বভাবে পরিণত না হয়, যে পর্য্যন্ত সমাধিলব্ধ 'ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা' সর্ব্বাবস্থায় সমান পরিমাণে উজ্জ্বল না থাকে, সে পর্য্যন্তই তীব্র অভ্যাসযোগের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান থাকে।

ব্রহ্মোপলব্ধির পূর্ব্বের সাধনে ও পরের সাধনে বিশেষ পার্থক্য এই যে, পূর্ব্বের সাধনে প্রত্যাহার ও ধারণার অভ্যাস দ্বারা অন্তঃকরণের বিষয়াকারতা দূরীভূত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়, কিন্তু একবার ব্রহ্মের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার লাভ হইলে তৎপর আর বিশেষ চেষ্টা করিয়া চিত্তকে এই অবস্থায় আনয়ন করা দরকার হয় না, ব্রহ্মস্মৃতি প্রবল থাকায় সঙ্কল্প মাত্রেই চিত্ত আপনা আপনি বৃত্তিরহিত হইয়া ব্রহ্মভাবে ভাবিত ও ব্রহ্মাকারে আকারিত হয়। কিন্তু এই সমাধির অবস্থাকেই স্বভাবে পরিণত করিতে হইলে, জাগ্রদবস্থাতে দেহেন্দ্রিয়ের ব্যাপারের মধ্যেও চিত্তকে ব্রহ্মভাবযুক্ত রাখিতে হইলে, সর্ব্বাবস্থায় আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মানন্দ থাকিতে হইলে, বহুদিন

নিত্য নিরন্তর জ্ঞান ও যোগের অন্তরঙ্গ সাধনে নিরত থাকার প্রয়োজন হয়।

মহোপনিষৎ, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি শাস্ত্রে যোগ সাধনার পথটিকে মোটামুটী সাতটি স্তরে বা ভূমিকায় বিভক্ত করা হইয়াছে।

যোগভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা পরিকীর্ত্তিতা।
বিচারণা দ্বিতীয়াস্যাৎ তৃতীয়া তনুমানসা॥
সত্ত্বাপত্তিশ্চতুর্থীস্যাৎ ততোঽসংসক্তিনামিকা।
পদার্থাভাবনী ষষ্ঠী সপ্তমী তূর্য্যগা স্মৃতা॥

(১) শুভেচ্ছা, (২) বিচারণা, (৩) তনুমানসা, (৪) সত্ত্বাপত্তি, (৫) অসংসক্তি, (৬) পদার্থাভাবনী (৭) তুর্য্যগা—এই সাতটি ভূমিকার মধ্যে চতুর্থ ভূমিতেই সাধক ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ব্রহ্মবিৎ হন। প্রথম তিনটি ভূমি ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উত্তরোত্তর উন্নততর সাধন-সোপন, শেষ তিনটি ভূমিতে তীব্রতর ও গভীরতর সমাধি-অভ্যাস দ্বারা জ্ঞানের পরিপাক হয়, ব্রহ্মদর্শন স্বভাবে পরিণত হয়, জীবন্মুক্তির উত্তরোত্তর উন্নততর অবস্থা লাভ ও তজ্জনিত বিশেষ আনন্দের আস্বাদ হয়।

চতুর্থী ভূমিকা জ্ঞানং তিস্রঃ স্যুঃ সাধনং পুরা।
জীবন্মুক্তেরবস্থাস্তু পরাস্তিস্রঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

যখন সাধারণ সদসদ্ বিচারের ফলে ঐহিক ও পারলৌকিক সর্ব্ববিধ ভোগ্য বিষয়ই অনিত্য ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ধারণা হয়, এবং শমদমাদির অভ্যাসের ফলে চিত্ত অনেক

পরিমাণে শুদ্ধ হওয়ায় সংসার হইতে মুক্তিলাভ করাই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া নিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারা যায়, মোক্ষলাভ ব্যতীত আর কিছুতেই সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও অভীপ্সিত আনন্দের সম্ভোগ সম্ভবপর নয় জানিয়া যখন অন্তঃ-করণ আকুল হইয়া মোক্ষেরই পথ খুঁজিতে আরম্ভ করে, তখনই জ্ঞানের প্রথম ভূমি—শুভেচ্ছা বা মুমুক্ষা—লাভ হইল। এই শুভেচ্ছা বা মুমুক্ষা জগতে অল্পসংখ্যক মহাভাগ্য মনুষ্যেরই লাভ হইয়া থাকে। শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—'মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।' সেই শুভেচ্ছা লইয়া জ্ঞান-ভিক্ষু সাধক গুরুর শরণাপন্ন হন। যে জ্ঞানামৃত লাভ করিলে তাঁহার প্রাণের পিপাসা পরিতৃপ্ত হইবে, যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি সেই জ্ঞানামৃত পান করিতে সমর্থ হইবেন, সেই জ্ঞানামৃতের অনুসন্ধানে যে পথে তাঁহাকে চলিতে হইবে, গুরুদেব কৃপা করিয়া তৎসম্বন্ধে তাঁহার অধিকার অনুসারে উপদেশ প্রদান করিতে থাকেন; তখন সাধক ভক্তি বিশ্বাসের সহিত গুরু-উপদেশ গ্রহণ করিয়া এবং গুরুর নির্দ্দিষ্ট পথে জীবন পরিচালিত করিয়া দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির বিশুদ্ধি সম্পাদন পূর্ব্বক, অনুকূল যুক্তি-তর্ক-বিচারের সাহায্যে,—গুরূ-পদিষ্ট তত্ত্ব ও সাধ্যসাধন রহস্য সম্বন্ধে সকল সন্দেহ ও ভ্রান্তি নিরাকরণ করিতে যত্নবান হন,—সদাচার, উপাসনা, গুরুসেবা, বৈরাগ্যাভ্যাস, অধ্যাত্ম-জ্ঞাননিষ্ঠা প্রভৃতি জ্ঞানলাভের অনুকূল সাধনের সহিত গুরুর শরণাপন্ন হইয়া এইরূপ শ্রবণ মননে

নিরত হওয়াই জ্ঞানসাধনার দ্বিতীয় সোপান—ইহার নাম বিচারণা। বিচারণার সাধন দ্বারা গুরূপদিষ্ট বিষয় সমূহ যে পর্য্যন্ত নিজের বুদ্ধিতে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত না হয়, যে পর্য্যন্ত সেই সব তত্ত্ব সম্বন্ধে বুদ্ধিগত সমস্ত সন্দেহ তিরোহিত না হয়, সে পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ভূমি অতিক্রম করা যায় না। বিচারণাসম্ভূত নিঃসংশয় তত্ত্বজ্ঞানকে পরোক্ষ জ্ঞান বলা হয়।

তারপর নিঃসংশয়চিত্তে ঐকান্তিকতার সহিত নিদিধ্যাসনাভ্যাস দ্বারা অন্তঃকরণ রাগদ্বেষ ও অশুভসংস্কার এবং চাঞ্চল্য হইতে মুক্ত হইয়া, সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় বস্তু সাক্ষাৎকার করিবার যোগ্যতা লাভ করে;—এই সাধনাবস্থাই তনুমানসা নামক তৃতীয় ভূমি। তৃতীয় ভূমির সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলেই, অর্থাৎ নিদিধ্যাসনাভ্যাস দ্বারা চিত্ত বৃত্তিরহিত হইয়া ধ্যেয়াকারে আকারিত হইবার সামর্থ্যলাভ করিলেই ধ্যেয়ে ব্রহ্মস্বরূপের অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার হয়, ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্যানুভূতি হয়, জগৎপ্রবাহ স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয়। ব্রহ্ম বা আত্মাকেই এক অদ্বিতীয় সত্য-বস্তু বলিয়া উপলব্ধি হয়। ইহাই চতুর্থ ভূমি এবং সত্ত্বাপত্তি নামে অভিহিত।

“অদ্বৈতে স্থৈর্য্যমায়াতে দ্বৈতে প্রশমমাগতে।
পশ্যন্তি স্বপ্নবল্লোকং চতুর্থীং ভূমিকামিতাঃ॥”

এই চতুর্থ ভূমি লাভ করিলেই যোগী ব্রহ্মবিৎ বলিয়া কথিত হন। তখনই তিনি মুক্তির আস্বাদ করেন। চতুর্থ ভূমিতে

স্থিতিলাভ করিলে আর সংসারবন্ধনের ভয় নাই। আর তাঁহাকে জন্মমৃত্যুর অধীন হইতে হয় না।

কিন্তু তখনও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তিনি বিক্ষেপের হাত সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারেন নাই। ধ্যানাবস্থায় যে আনন্দ তিনি অনুভব করেন, ব্যুত্থান অবস্থায় তিনি তাহা হইতে বঞ্চিত হন। আবার, সে ধ্যানাবস্থাও সকল সময় নিরাবিল থাকে না, আপনা আপনি ধ্যান ভঙ্গ হইয়া যায়। কর্ম্মজগতের সহিত যোগাযোগ থাকিলে তাহার ঘাতপ্রতিঘাতও তাঁহার অন্তঃকরণকে স্পর্শ করে। সুতরাং অন্তঃকরণ সকল অবস্থায় সমাহিত ও ব্রহ্মভাবযুক্ত না থাকিলে, জীবিতকালের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত ব্রহ্মজ্ঞানে ও ব্রহ্মানন্দে ভরপূর থাকা সম্ভব হয় না। এই হেতু চতুর্থ ভূমিতে স্থিতিলাভ করার পরও সাধনা-ভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান থাকে। চতুর্থ ভূমি ও পরবর্ত্তী ভূমিসমূহের মধ্যে শক্তির পরিপাক, জ্ঞানের দৃঢ়তা এবং আনন্দের গভীরতার পার্থক্যও যথেষ্ট আছে। চতুর্থ ভূমিতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় বটে, কিন্তু তাহা সর্ব্বাবস্থায় স্থির থাকে না; ব্রহ্মানন্দেরও সম্ভোগ হয় বটে, কিন্তু তাহা গভীরতার চরম সীমায় পৌঁছে না। ব্রহ্মজ্যোতি তখনো মাধুর্য্যে পর্য্যবসিত হয় না। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ভূমিকা সমূহে ক্রমশঃ যোগশক্তি, ব্রহ্মানুভূতি ও চিদানন্দ পূর্ণ ও পূর্ণতররূপে বিকশিত হইয়া সাধককে যোগশাস্ত্রোক্ত সহজাবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে। সপ্তম ভূমিতে জ্ঞান ও আনন্দ চরম সীমায় পৌঁছে, বীর্য্য ও

ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যে পরিণত হয়, অন্তর বাহির সব চিদানন্দময় হয়। তখনই মহাসিদ্ধি।

'অগম্যা বচসাং শান্তা সা সীমা যোগভূমিষু।'

—সেই অবস্থা বাক্য ও চিন্তার অতীত সম্যক্ প্রশান্তিময় এবং তাহাই যোগের চরম সীমা। চতুর্থ ভূমি হইতে পঞ্চম ভূমিতে আরোহণ করিতেই বহুদিন তীব্র অভ্যাসযোগের প্রয়োজন হয়। পঞ্চম ভূমিতে আরূঢ় যোগীকে ব্রহ্মবিদ্‌বর বলা হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তম ভূমিতে আরূঢ় যোগী যথাক্রমে—ব্রহ্মবিদ্ বরীয়ান্ ও ব্রহ্মবিদ্ বরিষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হন। এসব ভূমির বিশেষ লক্ষণ জানিতে হইলে যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি গ্রন্থ আলোচ্য।

বাবা গম্ভীরনাথ ঐকান্তিক মুমুক্ষারূপ প্রথম ভূমিতে আরূঢ় হইয়াই গোরক্ষপুরে গুরুসন্নিধানে আসিয়াছিলেন। গোরক্ষ-নাথ মন্দিরে গুরুসন্নিধানে থাকিয়া অল্পকালের মধ্যেই তিনি দেহান্দ্রিয়মনবুদ্ধির পরিশুদ্ধি সাধন পূর্ব্বক তত্ত্ববিচাররূপ দ্বিতীয় ভূমিতে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তৃতীয় ভূমির নিদিধ্যাসন-অভ্যাসের উদ্দেশ্যে তিনি গোরক্ষপুর পরিত্যাগ করেন। কাশীধামে ও ঝুঁসিতে কয়েক বৎসর নিত্য নিরন্তর ভক্তিবিশ্বাসের সহিত যোগ ও জ্ঞানের নিবিড় সাধন করিয়াই তিনি তৃতীয় ভূমিতে সিদ্ধিলাভ ও চতুর্থ ভূমিতে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি চতুর্থ ভূমিতে অবস্থিত থাকিবার চেষ্টা লইয়াই নর্ম্মদা পরিক্রমা ও তীর্থ পর্য্যটন করেন।

সাধারণ দৃষ্টিতে তখনই তিনি সিদ্ধ পুরুষ, কিন্তু মহাসিদ্ধ নহেন। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলেও ব্রহ্মবিদ্‌বর, ব্রহ্মবিদ্‌বরীয়ান্ ও ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ঠ হইতে তখনো তাঁহার বাকী ছিল। তখনো তাঁহার সম্যক্ নাথত্ব লাভ হয় নাই, তুরীয়াতীত অবধূত অবস্থায় অচলা স্থিতি লাভ হয় নাই। তদুদ্দেশ্যেই গয়াতে স্থির আসনে কয়েক বৎসর তাঁহাকে তীব্র অভ্যাসযোগে নিরত থাকিতে হইয়াছিল। সম্ভবতঃ পর্য্যটনকালের অভিজ্ঞতা হইতেই এই-রূপ অভ্যাসযোগের প্রয়োজনীয়তা তাঁহার বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল।

বার তের বৎসর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অবিরাম জ্ঞান ও যোগের নিবিড়তম অন্তরঙ্গ সাধনের ফলে বাবা গম্ভীরনাথ সিদ্ধ জীবনের চরম অবস্থা লাভ করেন, জ্ঞান ও যোগের সর্ব্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হন। তখন তিনি মহাসিদ্ধ, মহাজ্ঞানী, মহাপ্রেমিক, তুরীয়াতীত অবধূত। তখন পিণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের সমরসতার নিরাবিল অনুভূতিতে তিনি পরমানন্দময় সহজ অবস্থায় বিরাজমান। তখন তাঁহার সব শক্তি, সব জ্ঞান, সব যোগৈশ্বর্য্য নিস্তরঙ্গ মাধুর্য্য সমুদ্রে নিমজ্জিত। তাঁহার দেহ ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সব যেন চিদানন্দময়, সব অমৃতরসে ভরপূর। তিনি যেন যোগীশ্বর শিবেরই একটি সচল মূর্ত্তি। তাঁহার জীবনে যেন সর্ব্বশূন্যতা ও সর্ব্বপূর্ণতার অপূর্ব্ব সমাবেশ।

"অন্তঃশূন্যো বহিঃশূন্যঃ শূন্যকুম্ভ ইবাম্বরে।
অন্তঃপূর্ণো বহিঃপূর্ণঃ পূর্ণকুম্ভ ইবার্ণবে॥"

এই মহাসিদ্ধ যুক্তযোগীর চেতনার একদিকে যেমন সর্ব্বভেদবৈষম্য বিবর্জ্জিত সত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই, দ্রষ্টা-দৃশ্যেরও ভেদ নাই, অন্তর-বাহিরেরও পার্থক্য নাই. শুধু একরস চৈতন্য ; পক্ষান্তরে

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥

যোগযুক্তাত্মা পুরুষ আপনাকে সকলের মধ্যে ও সকলকে আপনার মধ্যে দর্শন করেন, এবং সর্ব্বত্র সমদর্শী হন। সুতরাং তিনি নিমীলিতনেত্রে যেরূপ 'ভিতর-বাহির'-বর্জ্জিত ব্রহ্মদর্শন করেন, জাগ্রদাবস্থায় উন্মীলিতনেত্রেও সেইরূপ ভিতরে এবং বাহিরে ব্রহ্মদর্শন করেন।

তিনি লোকদৃষ্টিতে দেহযুক্তভাবে পরিবর্ত্তনশীল জগতে বিচরণ করিলেও তত্ত্বজ্ঞানে জগৎ অতিক্রম করিয়া সর্ব্বদা ব্রহ্মেই অবস্থান করেন।

"ইহৈব তৈ র্জিতঃ সর্গো যেযাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥"

যাঁহাদের মন সাম্যে স্থিতিলাভ করিয়াছে, তাঁহারা এই সংসারে বিচরণ করিয়াও সংসারকে জয় করিয়া অবস্থান করেন। সাম্য বলিতে ব্রহ্মভাবই বুঝায়, যেহেতু ব্রহ্মই সম ও নির্দ্দোষ ; সুতরাং তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত। যাঁহারা সর্ব্বত্র ব্রহ্মই দর্শন করেন, তাঁহাদেরই মন সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রহ্ম সর্ব্ববিধ দোষবর্জ্জিত। সুতরাং মন সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে

জগতে কোন দোষই লক্ষিত হয় না ; যাহা কিছু অনুভূত হয়, সমস্তই আনন্দময়। আনন্দই যেন বিচিত্রমূর্ত্তিতে জগদ্রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। সুতরাং সমদর্শীর দৃষ্টিতে সংসারে বৈচিত্র্য থাকিলেও কোন বৈষম্য থাকে না, সুখ দুঃখের কোনরূপ ঘাতপ্রতিঘাতও থাকে না। অতএব সমদর্শী মহাপুরুষগণ সংসারে থাকিয়াও আনন্দময় ও জ্ঞানময় ব্রহ্মেই সর্ব্বদা বিহার করেন। এই হেতু তাঁহাদিগকে ব্রহ্মবিহারী বলা হইয়া থাকে। তিনি দর্শন করেন যে,—

ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুবস্তাদ্ ব্রহ্ম পশ্চাদ্ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্দ্ধ্বং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥

(মুণ্ডকোপনিষৎ)

'অমৃতস্বরূপ এই ব্রহ্মই সম্মুখে, ব্রহ্মই পশ্চাতে, ব্রহ্মই দক্ষিণে, ব্রহ্মই উত্তরে, ব্রহ্মই ঊর্দ্ধে, ব্রহ্মই নিম্নে ; বরেণ্যতম এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই এই বিশ্বরূপে আত্মবিস্তার করিয়া বিরাজমান।'

'অহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্টাদ্ অহং পশ্চাদ্ অহং পুরস্তাদ্ অহং দক্ষিণতোঽহমুত্তরতঃ অহমেদং সর্ব্বমিতি।......স বা এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্ আত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড্ ভবতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।' (ছান্দোগ্যোপনিষৎ)।

'আমিই নিম্নে, আমিই ঊর্দ্ধে, আমিই পশ্চাতে, আমিই সম্মুখে, আমিই দক্ষিণে, আমিই উত্তরে, আমিই এই সব।... তিনি এইরূপ দর্শন করিয়া, এইরূপ মনন করিয়া, এইরূপ

পবিজ্ঞাত হইয়া, আত্মবতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ ও স্বরাট্ হন ; সকল লোকে তাঁহার স্বেচ্ছানুরূপ অব্যাহত আচরণ হইয়া থাকে (অর্থাৎ তাঁহার ঈশ্বরত্ব লাভ হয়)।

তিনি দেহধারী হইয়াও দেহাভিমানেব সম্পূর্ণ অভাব বশতঃ দেহসম্পর্কশূন্য হইয়াই বিরাজিত থাকেন, তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুই থাকে না। 'অশরীরং বাবসন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ—আশরীর (শরীরাভিমান শূন্য) হইয়া বিবাজিত থাকেন বলিয়া প্রিয়ভাব বা অপ্রিয়ভাব তাঁহাকে স্পর্শ করে না— (ছান্দোগ্যোপনিষৎ)। গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—

'ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিবসম্মূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥'

'ব্রহ্মবিদ্ প্রিয়লাভে হর্ষযুক্ত হন না, অপ্রিয় সংযোগেও উদ্বেগপ্রাপ্ত হন না , তিনি স্থিরবুদ্ধি ও অসংমূঢ হইয়া ব্রহ্মেই অবস্থান কবেন।'

যে মুক্তপুরুষ কেবলমাত্র জ্ঞানেই সর্ব্বত্র ব্রহ্মাত্মভাব অনুভব করিয়া সমদর্শী ও নির্ব্বিকার হইয়াছেন 'তাঁহাবও জীবনে সম্পূর্ণতার কিঞ্চিৎ অভাব আছে বলিতে হয , মানুষের জাগতিক জীবন যতদূব পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে, তাহা তিনি লাভ করিয়াছেন বলা যায় না। তিনি তত্ত্বজ্ঞানে দৃঢপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, পরম সত্যের অপরোক্ষ অনুভূতি দ্বারা নিজে সকল জ্বালা হইতে চিরমুক্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার প্রাপ্তব্য, ত্যক্তব্য, কর্ত্তব্য বা জ্ঞাতব্য আর কিছুই নাই, তিনি

নিজে পরমানন্দময় হইয়া গিয়াছেন, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই বটে। কিন্তু কোন কোন শাস্ত্রের ও মহাপুরুষের সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রহ্মতত্ত্বে মনবুদ্ধি বিলীন করিয়া রাখিলেই এবং তত্ত্বনিষ্ঠ বুদ্ধিতে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' জানিলেই জীবনের চরম সার্থকতা লাভ হইল না। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগব্যাখ্যান্তে যুক্তযোগীর অন্যান্য সকল লক্ষণ বর্ণনা করিয়া সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন,—

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥

—যে যোগী বিশ্বের সকল প্রাণীর সুখদুঃখ নিজের বলিয়া অনুভব করিয়া সকলকে নিজের সহিত সমান দর্শন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠতম যোগী, ইহাই আমার স্থিরসিদ্ধান্ত।

শ্রীভগবান্ দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে, শ্রেষ্ঠতম যোগী কেবলমাত্র ব্রহ্মবুদ্ধিতেই সর্ব্বত্র সমদর্শী হন না, তিনি কেবলমাত্র সকল জীবের পারমার্থিক ঐক্য দর্শন করিয়া ব্যবহারবর্জ্জিত ও সমাধিস্থ হইয়া অবস্থান করাই মানবজীবনের চরম সার্থকতা মনে করেন না, ব্যবহারিক ভাবেও তিনি সমদর্শী হন, সকল জীবের ব্যবহারিক সুখদুঃখ নিজের হৃদয়ে অনুভব করিয়া তিনি সকলের সহিত সমপ্রাণ হন। বিশ্বপ্রাণের সহিত তাঁহার প্রাণের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, বিশ্বপ্রাণের প্রত্যেক স্পন্দন যেন তিনি নিজের প্রাণে অনুভব করেন। একই বিশ্বপ্রাণের বিচিত্র রকম স্পন্দন বিভিন্ন জীবের প্রাণে সুখদুঃখাদিরূপে স্পন্দিত

হইতেছে, বিভিন্ন জীবের প্রাণে অনুভূত সুখদুঃখ একই প্রাণসমুদ্রের বিভিন্ন তরঙ্গভঙ্গী মাত্র। যিনি বিশ্বপ্রাণকেই নিজের প্রাণ বলিয়া অনুভব করেন, তাঁহার ব্যক্তিগত কোন সুখদুঃখ থাকে না, তিনি নিজের জন্য কোন বিষয় লাভ করিতে বা কোন বিষয় ত্যাগ করিতে সমুৎসুক হন না ; কিন্তু সকল জীবের সুখদুঃখই তাঁহার সুখদুঃখ, সকল জীবের সুখদুঃখ ভোগের মধ্য দিয়াই যেন তাঁহার ভোগ হইতেছে। সেই হেতু নিজের কোন আকাঙ্খা না থাকিলেও পরের কল্যাণের জন্য উৎসুক হন, পরের সুখে সুখী ও পরের দুঃখে দুঃখী হন। তাঁহার শত্রু-মিত্র নাই, আত্মীয়-অনাত্মীয় নাই, দূর-নিকট নাই, সকলেই তাঁহার দৃষ্টিতে সমান, এবং সকলেরই সুখদুঃখ তিনি নিজের বলিয়া অনুভব করেন, এবং সর্ব্বভূতহিতে রত হইয়া সকলেরই কল্যাণের জন্য যত্নবান্ হন। তিনি প্রেমে ভরপূর থাকেন, তাঁহার অহৈতুকী ভালবাসা বিশ্বব্যাপী হয়। ভগবান্ বশিষ্ঠও রামচন্দ্রকে জীবনে সেই আদর্শ প্রতিফলিত করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন,—

মানসীর্ব্বাসনাঃ পূর্ব্বং ত্যক্ত্বা বিষয় বাসনাঃ।
মৈত্র্যাদি বাসনা রাম গৃহাণামলবাসনাঃ॥

'হে রাম! বাহ্য ও আন্তর সকল বিষয়ের বাসনা—ঐহিক ও পারলৌকিক, স্থূল ও সূক্ষ্ম, সকল প্রকার ভোগের বাসনা,—লোক বাসনা, শাস্ত্র বাসনা ও দেহ বাসনা,—অহংকার বল-দর্পাদি আসুর-সম্পদরূপ বাসনা—ইত্যাদি সর্ব্ববিধ অবিদ্যা-

মূলক বাসনা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়া মৈত্রী প্রভৃতি নির্ম্মল বাসনা গ্রহণ কর।'

শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহে সম্যক্‌সিদ্ধ যুক্তযোগী মহাপুরুষের যে সকল লক্ষণ বর্ণিত আছে, তাহারই একটি ঘনীভূত জীবন্ত বিগ্রহ হইয়া যোগীরাজ গম্ভীরনাথ কপীলধারার সাধনান্তে প্রকটিত হইলেন। সমসাময়িক মহাপুরুষগণ বাবা গম্ভীরনাথের অলোক-সামান্য আধ্যাত্মিক অবস্থায় পরিচয় লোকসমাজে প্রচার করিতেন, তাঁহাকে জ্ঞানে, প্রেমে, শক্তিতে ও আনন্দে চরম উৎকর্ষে উপনীত বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে জ্ঞাপন করিতেন। কোন বিশিষ্ট মহাপুরুষের আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে সাধারণ-বুদ্ধিবিশিষ্ট মনুষ্যের নিকট তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষগণই প্রকৃষ্ট প্রমাণ—তাঁহাদের বাক্যই আপ্তবাক্য।

অনেক মহাপুরুষ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ভাষায় বাবা গম্ভীর-নাথকে সম্যক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। বাবাজী যখন সিদ্ধাবস্থায় কপীলধারায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখনই বরাবর পাহাড়ে গোস্বামী মহাশয় তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি তাঁহার শিষ্যদের নিকট বলিতেন—"বাবা বড় প্রেমিক এবং খুব শক্তিসম্পন্ন মহাত্মা; হিমালয়ের নীচে এরূপ আর দেখা যায় না। পাহাড়ে কত বাঘ, সাপ, হিংস্র জন্তু রহিয়াছে; বাবার শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া কেহই ইঁহার অনিষ্ট করে না।" গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী লিখিয়াছেন,—"বাবা গম্ভীরনাথজীর

সম্বন্ধে গোঁসাই বলিয়াছেন 'হিমালয়ের নীচে আর এখন এরূপ শক্তিশালী মহাপুরুষ নাই। ইনি ঐশ্বর্য্যভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়া এখন মাধুর্য্যে ডুবিয়া গিয়াছেন। ইনি পলকে সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয় করিতে সমর্থ।" গোস্বামী মহাশয়ের অন্যতম শিষ্য শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ ঠাকুরতা লিখিয়াছেন—"ঠাকুর যখন সুকিয়া ষ্ট্রীটে রাখাল বাবুর বাড়ীতে ছিলেন, তখন একদিন বলিয়াছিলেন,—'অভিমন্যু—অভিমান। সপ্তরথী তাহাকে নষ্ট করেন। আমি প্রতিদিন এই সাতজনকে স্মরণ করি এবং তাঁহারা দয়া করিয়া প্রকাশিত হন। (১) গয়ার নাথজি (বাবা গম্ভীরনাথ), (২) অযোধ্যার মাধোদাস, (৩) নবদ্বীপের চৈতন্যদাস বাবাজী, (৪) ত্রৈলঙ্গ স্বামী, (৫) মেছুয়া বাজারের সন্ন্যাসী, (৬) দার্জ্জিলিঙের লামা সন্ন্যাসী (৭) পরমহংসজী (মানস সরোবরের) *। প্রথিতনামা মহাপুরুষ স্বামী সচ্চিদানন্দ বলিতেন,—'উন্ হি ত সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর হ্যায়।' তিনি একবার একটি যুবককে বাবা গম্ভীরনাথের শিষ্য জানিয়া তাহাকে দৃঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন, 'তুম্ ত আসল পাকড়্ লিয়া'। নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ রামদাস কাঠিয়াবাবা তাঁহাকে 'নিত্য যুক্ত যোগী' বলিয়া সম্মান করিতেন। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের স্বনামধন্য মহাত্মা ভোলানন্দ গিরি তাঁহাকে নিরতিশয় ভক্তি করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেন। অসাধারণ যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন

---

* মহাত্মা বাবা গম্ভীরনাথ পৃষ্ঠা ৫, ৯, ৩১।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস তাঁহার শিষ্যদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন যে, হিমালয়ে জ্ঞানগঞ্জে তাঁহার দীক্ষার পর তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে বাবা গম্ভীরনাথজীর নিকট লইয়া যান এবং প্রণাম করিতে বলেন। সম্যক্‌সিদ্ধ যোগি মহাজনদের তিনি অন্যতম ছিলেন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রামাণিক মহাপুরুষ নানা ভাবে বাবা গম্ভীরনাথের অলোকসামান্য ব্রহ্মজ্ঞান, জীব-প্রেম ও যৌগৈশ্বর্য্যের কথা লোকসমাজে ঘোষণা করিয়াছেন।

সমসাময়িক এই সব মহাপুরুষদের দিব্যানুভূতিমূলক সাক্ষ্যই যোগিরাজ গম্ভীরনাথের যোগসিদ্ধি জ্ঞানসিদ্ধি, ও প্রেমসিদ্ধি সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া আমরা মনে করি। তথাপি যতটুকু সম্ভব, বিচারশক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহার জীবনটিকে সাধ্যানুসারে আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিবার জন্য প্রযত্নশীল হওয়া আমাদের পক্ষে অসঙ্গত নহে। যুক্ত-যোগী স্থিতপ্রজ্ঞ গুণাতীত পুরুষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আমরা পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারি না; উপনিষৎ, গীতা, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি প্রামাণিক শাস্ত্রে সম্যক্‌-সিদ্ধ মহাত্মার জ্ঞান প্রেম, ও শক্তির কথা যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে তিনি সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন কিনা, তৎ সম্বন্ধে আপ্তবাক্য স্বীকার করা ভিন্ন আমাদের গত্যন্তর নাই; কিন্তু শ্রেষ্ঠতম জীবন্মুক্তের বাহ্যলক্ষণ—তাঁহার বৃত্তি, হাবভাব, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি—সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা ঐ সব শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বাহ্যিক পর্য্যবেক্ষণ দ্বারাও কতকটা আমরা মিলাইয়া দেখিতে পারি।

মহোপনিষদে জীবন্মুক্তের লক্ষণ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

মৌনবান্ নিরহংভাবো নির্মানো মুক্তমৎসরঃ।
যঃ করোতি গতোদ্বেগঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
সর্ব্বত্র বিগতস্নেহো যঃ সাক্ষিবদবস্থিতঃ।
নিরিচ্ছো বর্ত্ততে কার্য্যে স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
যেন ধর্ম্মমধর্ম্মং চ মনোমননমীহিতম্।
সর্ব্বমন্তঃ পরিত্যক্তং স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
আপতৎসু যথাকালং সুখদুঃখেম্বনারতঃ।
ন হৃষ্যতি গ্লায়তি যঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
হর্ষামর্ষভয়ক্রোধকামকার্পণ্য দৃষ্টিভিঃ।
ন পরামৃশ্যতে যোঽন্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
ঈপ্সিতানীপ্সিতে ন স্তো যস্যান্তর্ব্বর্ত্তিদৃষ্টিষু।
সুষুপ্তবদ্ যশ্চরতি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
অধ্যাত্মরতিরাসীনঃ পূর্ণঃ পাবন মানসঃ।
প্রাপ্তানুত্তমবিশ্রান্তির্নকিঞ্চিদিহ বাঞ্ছতি।
যো জীবতি গতস্নেহঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
রাগদ্বেষৌ সুখং দুঃখং ধর্ম্মাধর্ম্মৌ ফলাফলে।
যঃ করোত্য নপেক্ষ্যৈব স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
কট্বম্ল লবণং তিক্তমমৃষ্টং মৃষ্টমেব চ।
সমমেব চ যো ভুঙ্‌ক্তে স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥
জরামরণমাপচ্চ রাজ্যং দারিদ্র্যমেব চ।
রম্যমিত্যেব যো ভুঙ্‌ক্তে স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥

উদ্বেগানন্দরহিতঃ সময়া স্বচ্ছয়া ধিয়া ॥
ন শোচতি ন চোদেতি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥
জন্মস্থিতিবিনাশেষু সোদয়ান্তময়েষু চ।
সমমেব মনো যস্য স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥
ন কিঞ্চন দ্বেষ্টি তথা ন কিঞ্চিদপি কাঙ্ক্ষতি।
ভুঙ্‌ক্তে যঃ প্রকৃতান্ ভোগান্ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥
শান্তসংসার কলনঃ কলাবানপি নিষ্কলঃ।
যঃ সচিত্তোঽপি নিশ্চিত্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥
যঃ সমস্তার্থজালেষু ব্যবহার্য্যপি নিস্পৃহঃ।
পরার্থেম্বিব পূর্ণাত্মা স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ইত্যাদি ·

'যিনি মৌনবান্, অহংভাববর্জ্জিত, অভিমানশূন্য ও মাৎসর্য্যবিহীন এবং যিনি উদ্বেগরহিত হইয়া অবস্থান করেন, তিনি জীবন্মুক্ত। যিনি সর্ব্বত্র মমতাশূন্য হইয়া সাক্ষীর ন্যায় অবস্থান করেন, নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া উপস্থিত কার্য্য সম্পাদন করেন, সকল ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, সঙ্কল্প, চিন্তা ও চেষ্টা যাঁহার চিত্ত হইতে বিদায় লইয়াছে, তিনি জীবন্মুক্ত। যদৃচ্ছাক্রমে যে কোন সময়ে যে কোন সুখ বা দুঃখের কারণ উপস্থিত হইলে যিনি উদাসীন ভাবে তাহা গ্রহণ করেন, হৃষ্টও হন না, বিষন্নও হন না, যাঁহার চিত্ত হর্ষ বিষাদ ভয় ক্রোধ বা দৈন্য দ্বারা কখনও সংস্পৃষ্ট হয় না, যাঁহার ঈপ্সিত বা অনীপ্সিত কিছুই নাই, যাঁহার দৃষ্টি সর্ব্বদাই অন্তর্মুখীন, যিনি ব্যবহার ক্ষেত্রে সুষুপ্তের মত আচরণ করেন, তিনি জীবন্মুক্ত। যিনি সর্ব্বদা আত্মরতি

হইয়া অবস্থান করেন, যিনি স্বয়ং পূর্ণ, ইচ্ছা যাঁহার কল্যাণময়ী, অনুত্তম আনন্দ স্বরূপে বিশ্রাম লাভ করায় যাঁহার আকাঙ্ক্ষণীয় কিছুই নাই, যিনি দেহাদি সর্ব্ববিষয়ে বিগতস্নেহ হইয়া জীবন ধারণ করিয়া আছেন, তিনি জীবন্মুক্ত। ব্যবহারিক জগতে কিছুরই অপেক্ষা না করিয়া, কেবলমাত্র লোক শিক্ষার জন্য যিনি কখন কখন রাগদ্বেষ, সুখদুঃখ, ধর্ম্মাধর্ম্ম ও ফলাফলের অভিনয় করিয়া থাকেন, তিনি জীবন্মুক্ত। কটু, তিক্ত, মিষ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন রস এবং জরা, মৃত্যু, বিপদ্, সম্পদ্, দারিদ্র্য প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থা যিনি সমানভাবে রম্য বলিয়াই ভোগ করেন, যাঁহার সাম্যাবস্থিত স্বচ্ছ অন্তঃকরণে উদ্বেগ নাই, আনন্দ নাই, শোক নাই, ঔৎফুল্ল্য নাই, জন্ম, স্থিতি ও বিনাশে যাঁহার মানসিক অবস্থার কোন বিকার হয় না, যাঁহার হেয় বা উপাদেয় কিছুই নাই, যাহা যখন আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাই যাঁহার উপভোগ্য, সেই মহাপুরুষই জীবন্মুক্ত। যাঁহার নিকট সংসার প্রবাহ থাকিতেও নাই, যিনি কলাবান্ হইয়াও নিষ্কল, সচিত্ত হইয়াও নিশ্চিত্ত, নানা বিষয়ের অধিকারী হইলেও যিনি নিস্পৃহ ও নিঃসঙ্গ বলিয়া বস্তুতঃ ব্যবহার বর্জ্জিত, সেই পরিপূর্ণাত্মা মহাপুরুষই জীবন্মুক্ত। ইত্যাদি।

শ্রীভগবান্ গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ, ষষ্ঠাধ্যায়ে যুক্তযোগীর লক্ষণ, দ্বাদশাধ্যায়ে ভক্তের লক্ষণ, চতুর্দ্দশাধ্যায়ে গুণাতীতের লক্ষণ সুস্পষ্ট ভাষায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যাঁহারা কখনও বাবা গম্ভীরনাথের পুত সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন, অল্প সময়ের জন্যও তাঁহার স্থিতি ও গতি লক্ষ্য করিয়াছেন, একটু মনোযোগের সহিত তাঁহার হাব ভাব, চলন, উপবেশন, বাক্যালাপ ও কার্য্যালাপ এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ের দৃষ্টি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়াছেন যে এই সব লক্ষণ যেন জীবন্ত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাদের নয়নের সম্মুখে সমুপস্থিত। প্রত্যেকটি লক্ষণ অতি পরিস্ফুটরূপে বাবা গম্ভীরনাথের দিব্য জীবনে অভিব্যক্ত দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি একাকী থাকিতেন বা বহুলোকপরিবৃত থাকিতেন, নির্জ্জন পর্ব্বতে বা বনে থাকিতেন অথবা কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে থাকিতেন, তাঁহার সমীপবর্ত্তী জনসঙ্ঘ ভক্তিযুক্ত চিত্তে তাঁহার উপদেশের প্রতীক্ষায় থাকিত, অথবা হিংসা দ্বেষযুক্ত চিত্তে পরস্পরের সহিত বিবাদ বিসংবাদে নিযুক্ত থাকিত, তিনি সেবক বেষ্টিত হইয়া ভোগসম্পৎপরিপূর্ণ স্থানে অবস্থান করিতেন কিংবা সেবকবিহীন হইয়া হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ স্থানে বিচরণ করিতেন, তাঁহাকে যখন যেখানে যে অবস্থাতেই দেখা যাইত না কেন, কোন অবস্থাতেই তাঁহার সৌম্য প্রশান্ত গম্ভীর মূর্ত্তির কোন বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইত না, কোন অবস্থাতেই তাঁহার নিশ্চিন্ত প্রসন্ন আত্মসমাহিত ভাবের কোনরূপ বিকার লক্ষিত হইত না, কোন অবস্থাতেই বাহ্যিক ব্যাপারের কোন প্রতিক্রিয়া তাঁহার চিত্তে হইতেছে বলিয়া বোধ হইত না। সর্ব্বাবস্থাতেই তিনি যেন কোন ঊর্দ্ধতন

লোকে অবস্থান করিতেন, যেখানে নিরানন্দের লেশ নাই, ভয় ভাবনা ও চাঞ্চল্যের প্রবেশাধিকার নাই। যে সব বিষয় ও ব্যাপার সাধারণ লোকের নিকট অত্যন্ত বাস্তব, তাহাই যেন তাঁহার সম্মুখে অবাস্তব স্বপ্নের মত ভাসিতেছে। তাঁহার ভাব দেখিয়া স্বভাবতঃই মনে হইত যে, তিনি এমন কিছু লাভ করিয়াছেন,—

'যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥'

তাঁহার মূর্ত্তি কিয়ৎকাল নিরীক্ষণ করিলেই ধারণা হইত, তিনি যেন নিজের চিদ্‌ঘনপরমানন্দ স্বরূপে অচলপ্রতিষ্ঠ থাকিয়া বিশ্বজগতে সেই পরমানন্দেরই লীলা-বিলাস আস্বাদন করিতেছেন। যোগীশ্বর জ্ঞানীশ্বর ত্যাগীশ্বর শিবসুন্দর যেন নবমূর্ত্তিতে প্রকাশিত।

একদিকে যেমন ঔদাসীন্যের ও প্রশান্ততার চরম সীমায় বিরাজমান, অন্যদিকে তেমনি অগাধ প্রেমের ঘনীভূত মূর্ত্তি। একদিকে যেমন অহংভাব পরিশূন্য অন্যদিকে তেমনি সর্ব্বব্যাপক 'অহং', জীবমাত্রই তাঁহার নিতান্ত আপনজন। মহোপনিষদে ত্রিবিধ অহংকারের উল্লেখ আছে।

'অহং সর্ব্বমিদং বিশ্বং পরমাত্মাহমচ্যুতঃ।
নান্যদস্তীতি সংবিত্ত্যা পরমা সা হ্যহংকৃতিঃ॥
সর্ব্বস্মাদ্ ব্যতিরিক্তোঽহং বালাগ্রাদপ্যহং তনু।
ইতি যাঃ সংবিদো ব্রহ্মন্ দ্বিতীয়াহংকৃতিঃ শুভা॥

পাণিপাদাদিমাত্রোঽয়মহমিত্যেষ নিশ্চয়ঃ।
অহংকার স্তৃতীয়োঽসৌ লৌকিকস্তুচ্ছ এব সঃ॥'

'এই সমগ্র বিশ্বই আমি, আমি সর্ব্বভূতান্তর্য্যামী পরমাত্মা, সকলেই আমার সত্তা হইতে অভিন্ন,—এইরূপ অহংজ্ঞানই শ্রেষ্ঠতম অহংকার। আমি সকল পদার্থ হইতে ব্যতিরিক্ত এবং সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্ম চৈতন্য স্বরূপ—এইরূপ অহংকার মধ্যম। লৌকিক ও তুচ্ছ অহংকার নিকৃষ্ট।'

বাবা গম্ভীরনাথ লৌকিক অহংকার হইতে বহুদিন পূর্ব্বেই মুক্ত হইয়াছিলেন। 'নেতি নেতি'-বিচাররূপ ব্যতিরেকী সাধনা ও নিদিধ্যাসন-অভ্যাস দ্বারা তিনি সর্ব্বাতিরিক্ত চিৎস্বরূপ 'অহং' এর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। তৎপর অন্বয়ী সাধনা দ্বারা তিনি সর্ব্বাত্মভাবরূপ পরমা অহংকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবপ্রেম—সর্ব্বজীবহিতে রতি—এই পরমা অহংকৃতিরই অভিব্যক্তি। তাঁহার প্রেমের অচিন্ত্যপ্রভাবে ব্যাঘ্রসর্পাদি হিংস্রজন্তুও জিঘাংসাবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার সন্নিধানে বাস করিত। তিনি সকল প্রাণীকে অভয়প্রদান করিয়াই নিজে নির্ভয় হইয়াছিলেন। তিনি কোন প্রাণীকেই উদ্বেগ প্রদান করিতেন না, তাঁহাকেও কেহ উদ্বেগ প্রদান করিতে পারিত না। তিনি যে পরবর্ত্তী জীবনে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এবং বহু নরনারীকে দীক্ষা প্রদান পূর্ব্বক তাহাদের তাপিত প্রাণ শীতল করিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার প্রেমময় স্বভাবেরই অভিব্যক্তি।

অষ্টম অধ্যায়

ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য

যোগীরাজ গম্ভীরনাথ নিত্যনির্ব্বিকার আত্মসমাহিত ভাব, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন ও সর্ব্বজীবে অকুণ্ঠ প্রেমের সহিত পূর্ণ-যোগৈশ্বর্য্যেও সুপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন বলিয়া তত্ত্বদর্শী মহাত্মাগণ বিশ্বাস করেন। সাধনায় তিনি মুখ্যতঃ যোগমার্গই অবলম্বন করিয়াছিলেন। গুরুর নিকট হইতে মন্ত্রযোগ, হঠযোগ, লয়যোগ ও রাজযোগেরই দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগ তাঁহার পূর্ণাঙ্গ যোগ সাধনারই অঙ্গীভূত ছিল। যোগের সকল অঙ্গে সিদ্ধিলাভ না করিয়া তিনি সাধনায় ক্ষান্ত হন নাই। হঠযোগের নিগূঢ় সাধনার ভিতর দিয়াই তিনি রাজযোগের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, হঠযোগের ভিতরেই রাজযোগ ও জ্ঞানযোগে সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিবার উপযোগী অতি নিগূঢ় সাধন-রহস্য বিদ্যমান আছে; কিন্তু সেই সাধনার অধিকারী অতি বিরল দৃষ্ট হয়। তিনি নিজের সম্বন্ধে স্পষ্ট-রূপে অবশ্য কখন কোন কথাই বলেন নাই। কিন্তু কোন কোন তত্ত্বদর্শী মহাত্মা এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, বাবা গম্ভীরনাথ যোগসাধনায় সম্যক্ সিদ্ধিলাভ করিয়া অণিমাদি

যোগৈশ্বর্য্যসমূহ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন, বিশ্বপ্রকৃতির উপর সম্যক্ প্রভুত্ব লাভ করিয়াছেন, ঈশ্বরত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং জ্ঞান দ্বারা সব শক্তি ও ঐশ্বর্য্য হজম করিয়া সর্ব্বতোভাবে মাধুর্য্যমণ্ডিত হইয়াছেন। তিনি যোগীশ্বর শিবেরই ন্যায় মহাশক্তির অধীশ্বর হইয়াও ভোলানাথ রূপে বিরাজিত।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার শিষ্যদের নিকট বলিতেন যে "বাবা গম্ভীরনাথ পলকে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতে সমর্থ। ঐশ্বর্য্যভাবে সিদ্ধিলাভ করিয়া এখন মাধুর্য্যে ডুবিয়া গিয়াছেন।" কোন কোন মহাত্মা তাঁহাকে 'সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এরূপ মন্তব্যের তাৎপর্য্য এই যে, তিনি যোগৈশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত, এবং ঈশ্বরত্বকেও পূর্ণজ্ঞান দ্বারা সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মায় বিলীন করিয়া স্বরূপানন্দে বিভোর ও মধুরভাবে ভরপুর। এ বিষয়েরও কোনরূপ সাক্ষ্য-প্রদান করিবার অধিকার আমাদের মত স্থূলদর্শী জীবদের নাই ও থাকিতে পারে না। সম্যক্-সিদ্ধ মহাযোগিগণও সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ক্ষমতা বা ঈশ্বরত্ব লাভ করেন কিনা, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ অসম্ভব, কারণ কোনও যুগে কোন মহাপুরুষ এরূপ ক্ষমতার পরিচয় কার্য্যতঃ প্রদর্শন করেন নাই। এরূপ ঈশ্বরত্বের পরিচয় স্থূলদর্শীদের দৃষ্টির সমীপে কার্য্যতঃ উপস্থিত করা যে অসম্ভব, কেবল সাধনসিদ্ধ যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন জীব কেন;

স্বয়ং নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বর অবতীর্ণ হইয়াও যে এরূপ পরিচয় উপস্থিত করিতে পারেন না, ইহা বিচারশীল ব্যক্তিগণ একটু বিচার করিলেই বুঝিতে পারেন। সুতরাং জ্ঞান ও যোগের পরম পরাকাষ্ঠায় উপনীত সাধক ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঈশ্বরত্বাসৎ অতিক্রম পূর্ব্বক সচ্চিৎ প্রেমানন্দ ঘন মধুর স্বরূপে স্থিতিলাভ করেন, ইহার অর্থ কি, তাহা শাস্ত্রদৃষ্টিতে ও দার্শনিক বিচারেই হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক।

এ বিষয়ে শাস্ত্রব্যাখ্যাতা আচার্য্যদিগের মধ্যেও আপাত-দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ মতভেদ দৃষ্ট হয়। কোন কোন আচার্য্যের অভিমত এই যে, সম্যক্ সিদ্ধ মহাপুরুষের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ও অণিমা-লঘিমাদি ঐশ্বর্য্য অধিগত হইতে পারে বটে, কিন্তু জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী শক্তি একমাত্র নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বরেই নিত্য বিদ্যমান, তাহা কোন জীবের হইতে পারে না। জীব জ্ঞানে মায়াতীত হইতে পারেন, কিন্তু শক্তিতে মায়াধীশ হইতে পারেন না। এই একমাত্র বিষয়েই মুক্ত জীব ও পরমেশ্বরের পার্থক্য থাকে।

ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে 'জগদ্‌ব্যাপারবর্জ্জম' সূত্রে—(৪।৪।১৭) মহর্ষি বেদব্যাস এই মত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া ভাষ্যকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আচার্য্যপ্রবর শঙ্কর এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন, "জগদুৎপত্ত্যাদি ব্যাপারং বর্জ্জয়িত্বা অন্যদণিমাদ্যাত্মকং ঐশ্বর্য্যং মুক্তানাং ভবিতুমর্হতি, জগদ্‌ব্যাপারস্তু নিত্যসিদ্ধস্যৈব ঈশ্বরস্য।"—জগতের উৎপত্তি,

স্থিতি ও প্রলয় ব্যতীত অন্য সকল অণিমাদি ঐশ্বর্য্য মুক্তপুরুষদের হইয়া থাকে, জগদ্ব্যাপারের ক্ষমতা একমাত্র নিত্যসিদ্ধ ঈশ্বরেরই আছে। তাঁহার যুক্তি সংক্ষেপতঃ এইরূপ। শ্রুতিতে অনাদিসিদ্ধ ঈশ্বরই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা জগৎকারণ বলিয়া পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা তাঁহার সমান কেহই হইতে পারে না, এবং তাঁহার সঙ্কল্প অনুসারেই জগদ্ব্যাপার চিরকাল সুশৃঙ্খল ভাবে নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছে। কোন যোগসিদ্ধ মুক্তপুরুষ তাঁহার সমান যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিয়া তাঁহার সমকক্ষ হইলে, তিনি ঈশ্বর-সঙ্কল্পের প্রতিকূলে আপনার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া জগদ্ব্যাপার ওলট্পালট্ করিবারও চেষ্টা করিতে পারেন, এবং সমান শক্তিসম্পন্ন দুই বা ততোধিক ইচ্ছার সংঘর্ষে জগদ্ব্যাপার বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িবার কথা। যোগশক্তিধর মহাপুরুষগণও এক একজন এক এক প্রকার ইচ্ছা করিয়া এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করিয়া জগতে ভীষণ সংঘর্ষ ও বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিতে পারেন। একজন হয়ত ইচ্ছা করিবেন যে, জগৎ যেমন চলিতেছে তেমনি চলুক, অন্য একজন হয়ত ইচ্ছা করিবেন যে, এখন প্রলয় আরম্ভ হউক, আবার তৃতীয় একজন হয়ত ইচ্ছা করিবেন যে, এখনই জগৎকে নূতন করিয়া সৃষ্টি করা হউক। তখন জগদ্ব্যাপার কিরূপ হইবে, তাহা অভাবনীয়। অনাদিকাল হইতে জগদ্ব্যাপার যে একই নিয়মে সুশৃঙ্খলভাবে

নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্যাপারের চিরন্তন বিধান যে কখনও উল্লঙ্ঘিত হইতেছে না, ইহাতেই প্রতিপন্ন হয় যে, তাহা একই ইচ্ছার অধীন, একই বিশ্ববিধাতার ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত, তাহার উপর হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা আর কাহারও হয় না। সুতরাং যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণ যত ঐশ্বর্য্যই লাভ করুন না কেন, তাঁহারা ঈশ্বরেচ্ছার অধীনই থাকেন, ঈশ্বরেচ্ছার অধীন থাকিয়াই তাঁহারা নিজেদের যোগ-লব্ধ ঐশ্বর্য্যের ব্যবহার ও সম্ভোগ করিতে পারেন, তাঁহারা তত্ত্বদৃষ্টিতে ঈশ্বরেচ্ছা বুঝিয়া তদনুকূলে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করেন বলিয়াই তাঁহাদের ইচ্ছা অব্যাহত হয় এবং সেই হেতুই ইচ্ছার বিফলতা জনিত দুঃখ কখনও তাঁহারা অনুভব করেন না। অতএব এই মতে মুক্তজীবও শক্তি হিসাবে ঈশ্বরের তুলনায় ক্ষুদ্র। জীবন্মুক্ত পুরুষ তত্ত্বজ্ঞানে ও পরমানন্দসম্ভোগে ঈশ্বরের সমান হইতে পারেন এবং পরমার্থ দৃষ্টিতে ঈশ্বর ও জগৎ হইতে অভিন্ন হইয়া মায়াতীত আনন্দময় রাজ্যে বিরাজ করেন বটে, কিন্তু তিনি শক্তিতে ঈশ্বরের সমান হইতে পারেন না, জগদ্ব্যাপারের উপর আধিপত্য করিতে পারেন না।

যোগশাস্ত্রের মতে যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ সর্ব্বশক্তিমত্তা বা ঈশ্বরত্বও লাভ করিতে পারেন, তখন সমস্ত ভূতপ্রকৃতি তাঁহার বশীভূত হয় এবং তিনি জগদ্ব্যাপারের উপর আধিপত্য লাভ করেন। যোগসূত্রে বিভূতিপাদের ৪৪ সূত্রের ভাষ্যে ব্যাসদেব লিখিয়াছেন, "পঞ্চভূতস্বরূপাণি জিত্বা ভূতজয়ী ভবতি, তজ্জয়াদ্

বৎসানুসারিণ্য ইব গাবঃ অস্য সঙ্কল্পানুবিধায়িন্যো ভূতপ্রকৃতয়ো ভবন্তি”-(৩।৪৪)—তিনি পঞ্চভূতের স্বরূপ জয় করিয়া ভূতজয়ী হন, এবং বৎসানুসারিণী গাভীর ন্যায়, ভূতপ্রকৃতি সকল তাঁহার সঙ্কল্পের অনুবর্ত্তী হয়। পরবর্ত্তী সূত্রে মহর্ষি পতঞ্জলি বলিতেছেন “ততোঽণিমাদি-প্রাদুর্ভাবঃ কায়সম্পৎ তদ্ধর্ম্মানভিঘাতশ্চ”-(৩।৪৫)—ভূতজয় হইতে তাঁহার অণিমাদি ঐশ্বর্য্যের প্রাদুর্ভাব হয়, কায়সম্পৎলাভ হয় এবং কায়ধর্ম্মের অনভিঘাতও সিদ্ধ হয়। অণিমা—তিনি ইচ্ছা করিলে নিজেকে পরমাণুতে পরিণত করিতে পারেন এবং কাহারও লোমকূপের ভিতর দিয়াও শরীরের ভিতর প্রবেশ করিতে পারেন। লঘিমা—তিনি ইচ্ছামাত্র অত্যন্ত লঘু বা হাল্‌কা হইয়া বাতাসের অগ্রে গমন করিতে পারেন। মহিমা—তিনি সঙ্কল্প মাত্র ক্ষুদ্র দেহেই পর্ব্বতের ন্যায় ভারী হইয়া অথবা বিশাল দেহ সম্পন্ন হইয়া অবস্থান পারেন। প্রাপ্তি—তিনি যে কোন স্থানের যে কোন বস্তু পাইতে ইচ্ছা করেন, সঙ্কল্পমাত্রই তাহা তিনি প্রাপ্ত হইতে পারেন। প্রাকাম্য—তাঁহার ইচ্ছা অব্যাহত হয়। বশিত্ব—সমস্ত ভূত ও ভৌতিক পদার্থ তাঁহার বশীভূত হয়, তিনি তাহাদিগকে নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারেন এবং তিনি নিজে অন্যসকলের অবশ্য হন। ঈশিতৃত্ব—সমস্ত ভূত ও ভৌতিক পদার্থের উৎপত্তি, বিনাশ ও স্থিতির উপর তিনি প্রভুত্ব করিতে পারেন (তেষাং প্রভবাপ্যয়ব্যুহানং ঈষ্টে—ভাষ্য), অর্থাৎ—তিনি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতে সমর্থ হন। যত্র

কামাবসায়িত্ব—তিনি সত্যসঙ্কল্প হন; তিনি যেরূপ সঙ্কল্প করেন, ভূত ও ভৌতিক পদার্থ সকল সেইরূপ অবস্থান করে, তাঁহার সঙ্কল্পানুসারে তাহাদের স্বভাব ও ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। কায়সম্পৎ—তাঁহার শরীরে আশ্চর্য্য রূপলাবণ্য ও বল প্রকাশ পায়। তাঁহার পাঞ্চভৌতিক দেহও দিব্যদেহে পরিণত হয় ও ষড়্ধর্ম্ম হইতে মুক্ত হয়। কায়ধর্ম্মের অনভিঘাত—তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জল, অগ্নি, অস্ত্র, বিষ, ব্যাধিবীজ প্রভৃতি তাঁহার শরীরের উপর কোন ক্রিয়া করিতে পারে না।

এতদ্ভিন্ন বিভিন্নপ্রকার যোগাঙ্গের সিদ্ধিতে বিভিন্ন প্রকার ঐশ্বর্য্য লাভের কথা যোগশাস্ত্রে আছে। এগুলি মুমুক্ষু সাধকের অভীষ্ট নয়; তবে মানুষ যে স্বীয় অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তির উদ্বোধন ও যথাবিহিত অনুশীলন দ্বারা সাধারণ বুদ্ধির অকল্পনীয় ক্ষমতা সকল লাভ করিতে পারে, এবং ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়া জগদ্ব্যাপারের উপর আধিপত্য পর্য্যন্ত করিতে পারে, যোগশাস্ত্র ও যোগসাধকগণ তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন।

শঙ্কর প্রভৃতি আচার্য্যগণ সিদ্ধপুরুষের জগদ্ব্যাপারের উপর আধিপত্য লাভ করার বিরুদ্ধে যে সব আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন, যোগভাষ্যকার ব্যাসদেব পূর্ব্বেই সে আপত্তি উত্থাপন করিয়া তাহার মীমাংসা করিয়াছিলেন। তিনি উল্লিখিত সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—“ন চ শক্তোঽপি পদার্থ-বিপর্য্যাসং করোতি। কস্মাৎ? অন্যস্য যত্র-কামাবসায়িনঃ

পূর্ব্বসিদ্ধস্য তথাভূতেষু সংকল্পাদিতি॥” যোগসিদ্ধ ভূতজয়ী মহাপুরুষ ভূত ও ভৌতিক পদার্থ সকলের উৎপত্তি, স্বভাব, ক্রিয়া, বিনাশ প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তন করিয়া দিতেও সমর্থ বটে, কিন্তু তিনি তাহা করিতে কখনই ইচ্ছা করেন না। কেন না পূর্ব্বসিদ্ধ সত্যসঙ্কল্প পরমেশ্বরের সঙ্কল্পানুসারেই সকল পদার্থের উৎপত্তি, স্বভাব, ক্রিয়া, ধ্বংস প্রভৃতি নিয়মিত হইতেছে। সম্যক্‌সিদ্ধ যোগিরাজ মহাপুরুষদের সঙ্কল্প এক প্রকারই হইয়া থাকে, পরস্পরের বিরোধী হয় না, সুতরাং কখনো সিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী হইতেই পারে না।

একটু বিচার করিয়া দেখিলে বেদান্তমতে ও যোগমতে এই বিষয়ে যে বিশেষ কোন পার্থক্য আছে, তাহা মনে হয় না। যোগসিদ্ধ মুক্তপুরুষ যে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। বেদান্তসূত্র ৪।৪।৮ এবং ৪।৪।৯ সূত্রে সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁহাকে সত্যসংকল্প ও অনন্যাধিপতি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূত্রে ব্যাসদেব ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, সত্য সঙ্কল্পত্বাদি শক্তি জীবের ভিতরে সর্ব্বদাই আছে, কিন্তু বদ্ধাবস্থায় অবিদ্যাবশতঃ বা তাহার কর্ম্মানুরূপ পরমেশ্বর সঙ্কল্প বশতঃ সেই শক্তি তিরোহিত থাকে এবং তাহাতেই জীবের বন্ধন ও মোক্ষ হইয়া থাকে। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, “স স্বরাট্‌ ভবতি, তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি”—তিনি স্বরাট্‌ হন্‌ ও সকল

লোকে তাঁহার কামচার (ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার, ইচ্ছার অনভিঘাত, ঈশ্বরত্ব) সিদ্ধ হয়। স্বয়ং পরমেশ্বরে যে সকল গুণ, শক্তি ও ঐশ্বর্য্য নিত্য-বর্ত্তমান থাকায় তিনি নিত্য স্থষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্ত্তা হইয়া বিদ্যমান আছেন, সাধনবলে মুক্তজীব সেই সকল গুণ, শক্তি ও ঐশ্বর্য্যলাভ করেন বলিয়া শাস্ত্রসকল কীর্ত্তন করিতেছেন। বস্তুতঃ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারিণী শক্তি অষ্টৈশ্বর্য্যেরই অন্তর্ভুক্ত।

ঈশ্বরের বিধানের প্রতিকূলে কেহ স্বীয় শক্তিকে সফল করিয়া দেখাইতে পারিলেই, তাহার সেই শক্তি আছে বলিয়া যদি স্বীকার করিতে হয়, এবং তদভাবে যদি তাহার শক্তি অস্বীকার করিতে হয়, তবে কোন জীবের কোনরূপ শক্তি আছে, ইহা বলাই অসম্ভব হয়। কারণ পরমেশ্বর কেবল-মাত্র সমষ্টিজগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা নহেন, তিনি ব্যষ্টি-জগতেরও সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় ব্যাপারই তাঁহার সঙ্কল্পানুযায়ী বিধান অনুসারে সংঘটিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, সকলের সকল কর্ম্ম ও কর্ম্মফলই তাঁহার ইচ্ছানুসারে হইতেছে, তাঁহার বিধানের প্রতিকূলে কোন প্রাণীর পক্ষে কোন সামান্য কার্য্য সম্পাদন করাও অসম্ভব। কেনোপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে, দেবতাগণ যখন অসুর-দিগকে পরাভূত করিয়া আপনাদিগকেই বিজেতা ভাবিয়া অভিমান করিতেছিলেন, তখন হৈমবতী উমা (ভাগবতী বিদ্যাশক্তি) তাঁহাদিগকে জ্ঞানদান করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের

নিকটে আবিভূ তা হইয়া কার্য্যতঃ বুঝাইয়া দিলেন যে, ঐশ্বরিক শক্তি ব্যতীত অগ্নিদেব একটি তৃণও দহন করিতে পারেন না, পবনদেব একটি তৃণও স্থানচ্যুত করিতে পারেন না, কোন দেবতাই কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হন না। যে ভাবে আমরা বলিতে পারি যে, কোন ব্যক্তির এক মণ জিনিষ উত্তোলন করিবার বা এক যোজন পথ পদব্রজে গমন করিবার শক্তি আছে, অথবা কোন ব্যক্তির বাষ্পীয় যান বা শতঘ্নী অস্ত্র নির্ম্মাণ করিবার শক্তি আছে, কিংবা কাহারও বেদান্ত বিদ্যা বা পদার্থ বিদ্যা শিক্ষা দিবার শক্তি আছে, সেই ভাবেই আমরা ইহা বলিতে পারি যে, যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের শক্তি আছে। আপেক্ষিক সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ক্ষমতা অল্পাধিক সকল জীবেরই আছে, প্রত্যেকেই কোন না কোন পদার্থ উৎপাদন করিতে পারে, কোন না কোন পদার্থ ধ্বংস করিতে পারে, এবং কোন না কোন পদার্থ পালন করিতে পারে। এই ক্ষমতা যোগসিদ্ধ মুক্তপুরুষে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এ সকল ক্ষমতাই জীবের ভিতরে ঐশ্বরিক শক্তির বিকাশ এবং এ সব ক্ষমতার প্রয়োগও ঈশ্বরের বিধানেই হইয়া থাকে। এ সব শক্তি ও ব্যবহারের কথা ব্যবহারিক জগতেরই বিষয় এবং ব্যবহারিক জগতের যাবতীয় ব্যাপারই ঈশ্বরেচ্ছা-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

কোন ব্যক্তি কোন শক্তি বা ঐশ্বর্য্য বহুল পরিমাণে লাভ করিয়াছেন—তত্ত্ববিচারে একথার তাৎপর্য্য এই যে ঈশ্বরেরই

সেই শক্তি বা ঐশ্বর্য্য বহুল পরিমাণে তাঁহার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি ঈশ্বরকেই সেই পরিমাণে নিজের সেই শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের ভিতর দিয়া উপলব্ধি করিয়াছেন। যিনি ধনে, মানে, বীর্য্যে, শৌর্য্যে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে—তপস্যায় বা তিতিক্ষায়, যে কোন শক্তিতে বা ঐশ্বর্য্যে অপর সাধারণ হইতে কতকটা বৈশিষ্ট্য লাভ করেন, জানিতে হইবে যে, তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরত্বের কিছু বিশেষ বিকাশ হইয়াছে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥"

যিনি শক্তি বা ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সত্যজ্ঞান লাভ করেন, তিনি জ্ঞানে এই তথ্য প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিতে পারেন, এবং তাঁহার চিত্তে সেই শক্তি-লাভজনিত কোন অভিমান উদিত হয় না। কিন্তু যিনি কোন বিশেষ শক্তি বা ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া তৎসঙ্গে যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন না, তিনি সেই শক্তি বা ঐশ্বর্য্য নিজের মনে করিয়া অভিমানে মত্ত হন, এবং তাঁহার মধ্যে যাঁহার প্রকাশ হইতেছে, সেই পরমেশ্বর তাঁহার জ্ঞানের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকেন। তিনিও অবশ্য তাঁহার সেই শক্তি বা ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরেচ্ছার প্রতিকূলে ব্যবহার করিতে পারেন না, তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার ভিতর দিয়া সেই শক্তি বা ঐশ্বর্য্যের ঈশ্বরেচ্ছানুযায়ী ব্যবহারই হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে ঈশ্বরেচ্ছানুযায়ী ফলই প্রসূত হইয়া থাকে। তাঁহার

অজ্ঞানতাবশতঃ সেই ফল কখন তাঁহার ইষ্ট বলিয়া বোধ হয়, কখনও তাঁহার অনিষ্ট বলিয়া বোধ হয়, এবং তদনুরূপ সুখ-দুঃখানুভবও তাহার হইয়া থাকে। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অনিষ্ট বলিয়া কিছু নাই, সুতরাং তাঁহার কর্ম্মের অসিদ্ধিও কখনও হইতে পারে না, কাজেই দুঃখ বা তাপও তাঁহার হয় না।

যোগসিদ্ধ মুক্তপুরুষের ভিতরে ঈশ্বরের শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হয়। যেমন তিনি জ্ঞানে, প্রেমে ও আনন্দে ঈশ্বরের সহিত সাম্য লাভ করেন, ঈশ্বরের ন্যায় সর্ব্বাত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হন, ন্যায় কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা এবং ভোক্তা হইয়াও অভোক্তা হন, সেইরূপ তিনি শক্তি এবং ঐশ্বর্য্যেও ঈশ্বরের সহিত সমান হইয়া থাকেন, ঈশ্বরের সহিত সমান ভাবেই সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া থাকেন। কিন্তু তাহাতে তিনি ঈশ্বরের 'সরিক' বা প্রতিদ্বন্দ্বী হন না, একজন স্বতন্ত্র বিশিষ্ট-সংকল্প-বিকল্প-যুক্ত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী রূপে আবির্ভূত হন না, নূতন ভাবে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতে প্রবৃত্ত হন না, ঈশ্বরেচ্ছায় প্রতিকূলে স্বীয় শক্তি ও ঐশ্বর্য্য প্রয়োগ করিয়া সনাতন বিশ্ববিধানের মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিবার কোন কল্পনাই তাঁহার মুক্ত চিত্তে উদিত হয় না। কারণ, ঈশ্বরত তাঁহার বাহিরে নহেন, ঈশ্বর যে তাঁহার ভিতরে। অজ্ঞ ব্যক্তিই ঈশ্বরকে নিজের বাহিরে অবস্থিত অচিন্ত্য-জ্ঞানৈশ্বর্য্য-শক্তি-সমন্বিত একজন পৃথক বিরাট পুরুষ মনে করেন এবং নিজেকে সার্দ্ধ-ত্রিহস্ত-পরিমিত শরীরের মধ্যে আবদ্ধ, বিশাল

ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র এক অংশে অবস্থিত, দেশকাল অবস্থার অধীন একটি ক্ষুদ্র প্রাণী বলিয়া বোধ করেন। জ্ঞানী পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন অশেষ-প্রেম-মহার্ণব, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী পরমেশ্বরকে আপনার মধ্যেই অনুভব করিয়া থাকেন, আপনাকে তাঁহার সহিত অভিন্ন উপলব্ধি করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষু ভাগবতোত্তমঃ॥

—সর্ব্বভূতে যিনি আপনার ভগবদ্ভাব (ভগবত্তার প্রকাশ) দর্শন করেন এবং সর্ব্বভূত আপনাতে ও ভগবানে দর্শন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত। সুতরাং নিজের ভিতরের ভগবত্তারই বিকাশ সাধন করিয়া ভক্ত জীব-জগৎ-সমন্বিত সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আপনার ভিতরে দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহার আত্মার ভিতরে অন্তর্নিহিত যে ঐশ্বরিক জ্ঞান, শক্তি, প্রেম ও আনন্দ গুপ্তভাবে অনাদিকাল হইতেই বিদ্যমান রহিয়াছেন, সাধন দ্বারা তিনি তাহারই পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করিয়াছেন। তাঁহার সাধনলব্ধ জ্ঞান, প্রেম, আনন্দ, শক্তি ও ঐশ্বর্য্য বস্তুতঃ নিত্যসিদ্ধ পরমেশ্বরেরই জ্ঞান, প্রেম, আনন্দ, শক্তি ও ঐশ্বর্য্য। তাঁহার ইচ্ছার ভিতর দিয়া ঈশ্বরেচ্ছারই প্রকাশ হয়, তাঁহার ব্যবহারিক জীবনে অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরের ইচ্ছার সহিত সম্পূর্ণরূপে একীভূত স্বকীয় ইচ্ছা অনুসারেই তাঁহার শক্তি ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতির প্রয়োগ ও সম্ভোগ হয়, ঈশ্বর তাঁহার স্ব-রূপে

প্রকাশিত বলিয়া ঈশ্বর-তন্ত্র হইয়াই তিনি স্ব-তন্ত্র বা স্বাধীন, এবং স্ব-তন্ত্র বা স্বাধীন হইয়াই তিনি ঈশ্বর-তন্ত্র বা ঈশ্বরাধীন। বস্তুতঃ তিনি ঈশ্বরের সকল গুণ, ঐশ্বর্য্য ও শক্তি লাভ করিয়া ঈশ্বরেরই একটি বিশেষ বিগ্রহরূপে জগতে বিচরণ করেন। পরিপূর্ণ-মানবত্বের মধ্যেই ঈশ্বরত্বেরও পরিপূর্ণ বিকাশ হয়। এরূপ ঈশ্বরত্ব লাভ হইলে ঈশ্বরেরই ন্যায় মানব সত্যসংকল্প, সর্ব্বকর্ম্মা, কামচারী, মহাভোগী ও মহাত্যাগী হইয়াও সংকল্প-বিহীন, কর্ম্মবিহীন, কামবিহীন, ভোগবিহীন ও ত্যাগবিহীন হইয়া অবস্থান করেন। তখন তাঁহার শক্তি ব্রাহ্মীস্থিতিতে পর্য্যবসিত হয়, ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যে রূপায়িত হয়।

এক অদ্বিতীয় নিত্যসিদ্ধ নিত্যমুক্ত অশেষ-কল্যাণ-গুণাকর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডাধিপতি যোগীশ্বর ভগবান্ আপনার অগণিত বিকাশের ভিতর দিয়া অনন্তভাবে আপনার স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান, প্রেম, শক্তি ও ঐশ্বর্য্য উপলব্ধি ও সম্ভোগ করিবার উদ্দেশ্যেই আপনি বহু হইয়া, সেই বহুর মধ্যে আপনার ভগবত্তার সঙ্কোচন পূর্ব্বক আপনাকে অবিদ্যাগ্রস্ত অসংখ্য জীবরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন, এবং তাহাদের কর্ম্ম, ভোগ ও স্বরূপাভিব্যক্তির উপযুক্ত ক্ষেত্র ও উপকরণ সহযোগে এই জগদ্রূপেও আত্ম-প্রকট করিয়াছেন। তিনি বিশ্ববিধানটি এমন ভাবে প্রণয়ন করিয়াছেন এবং তদ্দারা জীবজগতের যাবতীয় ব্যাপার এমন সুশৃঙ্খলরূপে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, যাহাতে প্রত্যেক জীব অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন হেয়তম অবস্থা হইতে নানাবিধ অবস্থার ভিতর

দিয়া অজ্ঞাতসারেও ক্রমশঃ ভগবত্তার পথেই—জ্ঞান, প্রেম, শক্তি, আনন্দ ও ঐশ্বর্য্যের ক্রমবিকাশ দ্বারা আপনার অন্তর্নিহিত ভগবত্তা উপলব্ধি করিবার পথেই অগ্রসর হইতেছে। প্রত্যেক জীবের ভিতরে ভগবান্ই বস্তুতঃ সাধক এবং তাঁহার স্বরূপভূত ভগবত্তার পরিপূর্ণ উপলব্ধিই সাধ্য। মানুষের ভিতরেই এই সাধনা বিচারপূর্ব্বক ও ইচ্ছাপূর্ব্বক হয়। মুক্তপুরুষের ভিতরে এই সাধনা সম্যক্-সিদ্ধিতে পর্য্যবসিত হয়। সম্যকসিদ্ধ মুক্ত-পুরুষের জীবনে ভগবত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ, সেখানে জীবের ভিতরে ভগবানের পরিপূর্ণ আত্মোপলব্ধি, পরিপূর্ণ সম্ভোগ। সুতরাং সম্যক-সিদ্ধ মুক্তপুরুষের সৃষ্টিতেই ভগবানের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার চরম সার্থকতা, সেইখানেই ভগবান্ জীবের ভিতরে আপনাকে পরিপূর্ণরূপে প্রকটিত করিয়া নিজকে নিজে পরি-পূর্ণরূপে সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য প্রদর্শন করিতেছেন। সেখানেই ভগবানের 'বহু হওয়া' সম্যক্রূপে সার্থক হইতেছে। ইহা সৃষ্টিতত্ত্বের একটি নিগূঢ় রহস্য।

অতএব সম্যক্-সিদ্ধ মহাপুরুষকে যখন সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতে সমর্থ বলিয়া বর্ণন করা হয়, তখন ইহাই নির্দ্দেশ করা হয় যে, তাঁহার ভিতরে ঐশ্বরিক শক্তি ও ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ-বিকাশ সাধিত হইয়াছে, তিনি মনুষ্যদেহেই ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তিনি মায়াধীশ ভগবানের সহিত আপনার একত্ব সম্যক্রূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি ভগবানের জীবসৃষ্টির চরম সার্থকতার নিদর্শন স্বরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত

আছেন। ইহা দ্বারা তাঁহাকে ভগবানের 'সরিক' বা প্রতিদ্বন্দ্বী বলা হয় না, জ্ঞানে ও শক্তিতে ভগবানের সহিত তাঁহার অভিন্নতাই খ্যাপন করা হয়। জীব পরিপূর্ণতায় পৌঁছিলে, আপন সাধন জীবনের চরম সার্থকতায় উপনীত হইলে, তিনি যে এরূপ শক্তি ও ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, মহর্ষি জৈমিনিরও তাহাই সিদ্ধান্ত বলিয়া মহর্ষি বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রের ৪।৪।৫ সূত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং কোন কোন ঋষির ইহাতে আপত্তি থাকিলেও, তাঁহার নিজের মতের সহিত এই সিদ্ধান্তের কোন বিরোধ নাই বলিয়া তিনি ৪।৪।৭ সূত্রে প্রকাশ করিয়াছেন।

যোগিরাজ গম্ভীরনাথ মানব জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিয়া এইরূপ ঈশ্বরত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন বলিয়া কোন কোন তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ কীর্ত্তন করিয়াছেন, এবং তদ্বিষয়ে আমাদের কিছু বলিবার যে অধিকার নাই, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। মহাপুরুষদিগের আধ্যাত্মিক অবস্থা, অন্য মহাপুরুষদের সাক্ষ্য অনুসারেই যে বুঝিতে হইবে, তাহাও নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাঁহার সেই অসীম শক্তিকে বশীভূত রাখিবার—নিজের ভিতরে গুপ্ত রাখিবার—শক্তি। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, তিনি তাঁহার ঈশ্বরত্বকে, তাঁহার সব যোগৈশ্বর্য্যকে, কিরূপ মাধুর্য্যে রূপায়িত করিয়াছিলেন।

এরূপ অনেক শক্তিশালী মহাপুরুষ দৃষ্ট হন, যাঁহারা

প্রচুর শক্তি লাভ করিয়া সেই শক্তি দ্বারাই চালিত হইতে থাকেন। স্বকীয় অলৌকিক শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে নিজের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিবার শক্তি অনেক শক্তিধর মহাপুরুষের থাকে না, শক্তির খেলা যেন আপনা-আপনি তাঁহাদের মধ্য দিয়া প্রকাশ হইয়া পড়ে। একটি মদমত্ত হস্তী কোন ক্ষুদ্র জলাশয়ের মধ্যে অবতরণ করিলে যেমন সেই জলাশয়কে তোলপাড় করিয়া লয়, সেইরূপ অল্পাধিকারী যোগী কোন বিশেষ যোগবিদ্যার অনুশীলন দ্বারা কোন বিশেষ আলৌকিক শক্তি লাভ করিলে, সেই শক্তিই তাঁহাকে চঞ্চল ও বহির্মুখ করিয়া ফেলে। যাঁহারা বিশেষ বিশেষ যোগাঙ্গের অনুশীলন করিয়া বিশেষ বিশেষ শক্তি ও বিভূতি লাভ করেন, অথচ জ্ঞান সাধনার অভাব বশতঃ তত্ত্বদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত থাকেন, তাঁহাদের অহংভাব বিনষ্ট না হওয়ায় এবং ঈশ্বরেচ্ছার সহিত তাঁহাদের ইচ্ছার সজ্ঞানে মিলন সাধিত না হওয়ায়, তাঁহারা সেই সব শক্তি ও বিভূতিতে আসক্ত হইয়া পড়েন, এবং বহির্জগতে বিশেষ বিশেষ ফল লাভের আশায় তাহা প্রয়োগ করিয়া কখন কখন বিষয়ী লোকের স্বভাবই প্রাপ্ত হন। এ সকল ব্যাপারও অবশ্য ঈশ্বরের বিধান অনুসারেই সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের অধিকারের অল্পতা প্রকাশ পায়, এবং তাঁহারা যে তাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বরত্বের ক্রমবিকাশের পথে লক্ষ্য হইতে দূরে অবস্থিত, তাহাই প্রমাণিত হয়।

সাধক লক্ষ্যের যত নিকটবর্ত্তী হন, তাঁহার মধ্যে ভগবত্তা

যত বিকাশপ্রাপ্ত হয়, ততই তিনি তত্ত্বদৃষ্টিলাভ করেন, ততই পরম মঙ্গলময় বিশ্ববিধাতার জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছার সহিত তাঁহার জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছার মিলন হয়, তাঁহার অহংভাব ততই বিশ্বাত্মার অহংএর মধ্যে বিলীন হইয়া যায়, ততই তাঁহার তপোলব্ধ অলৌকিক শক্তি ও বিভূতি বাহিরে কোন উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়োগ করিতে তিনি অনিচ্ছুক হন। যাঁহার অধিকার যত উচ্চ, তিনি স্বকীয় শক্তি ও বিভূতি নিজের ভিতরে তত অধিক পরিমাণে গুপ্ত রাখিতে সমর্থ হন। নিজের যোগলব্ধ অলৌকিক ঐশ্বর্য্য থাকিলেও, তাহা প্রকাশ হইতে না দিয়া নিজের ভিতরে বশীভূত করিয়া রাখিবার শক্তি সব চেয়ে বড় শক্তি, এবং সেই শক্তি অত্যুচ্চ অধিকারসম্পন্ন পরমার্থদর্শী নিত্যযুক্ত যোগীরই থাকে। বাবা গম্ভীরনাথের ভিতরে সেই শক্তি পূর্ণমাত্রায় লক্ষিত হইত। তিনি কখনও লৌকিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অলৌকিক শক্তি প্রকাশ করিতেন না। তাঁহার সাধারণ কার্য্য বা বাক্যালাপের ভিতরে কখনও কোন অলৌকিকত্বের গন্ধ পাওয়া গেলে, তৎ-সম্বন্ধে যদি কেহ কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, দু'এক কথায় সহজ জ্ঞানের ভাষায় তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন। যোগীরাজ মহাসিদ্ধি লাভান্তে সর্ব্বদা সহজ অবস্থাতেই থাকিতেন। সহজ অবস্থাই মাধুর্য্যের অবস্থা। মহাসিদ্ধ গম্ভীরনাথ ঐশ্বর্য্যে সিদ্ধিলাভ করিয়া মাধুর্য্যে ডুবিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই যেন অপ্রাকৃত মাধুর্য্যে সর্ব্বদা অভিসিঞ্চিত ছিল।

বাবা গম্ভীরনাথের ব্যবহারিক জীবন পর্য্যবেক্ষণ করিলে কেবলমাত্র দুই প্রকার অলৌকিক শক্তির বিশিষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইত। প্রথমতঃ, সকল প্রকার অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্যে সর্ব্বদা ব্রহ্মভাবে সমাহিত থাকিবার শক্তি,—"নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্" হইয়া অবস্থান করিবার শক্তি; দ্বিতীয়তঃ, প্রেমের শক্তি—ভূতানুকম্পার শক্তি। সামান্য সামান্য ব্যাপারে তাঁহার অলৌকিক শক্তির সামান্য সামান্য পরিচয় যিনি যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ভগবদ্‌ভাব ভাবিত মহাপুরুষের জীবপ্রেমের শক্তিতেই তাঁহার ভিতর হইতে তাহা টানিয়া বাহির করিয়াছে, ভগবান্ তাঁহার ভিতর দিয়া জীবের প্রতি কৃপা বিতরণ করিবার জন্যই তাঁহার জীবনে ততটুকু অলৌকিক শক্তির বহির্বিকাশ করিয়াছেন।

গয়ায় সুনিয়ত তীব্র অভ্যাস যোগ সমাপনের পর হইতে যোগিরাজ গম্ভীরনাথ জ্ঞানে, বৈরাগ্যে, প্রেমে, শক্তিতে, মাধুর্য্যে, আচার-ব্যবহারে—সর্ব্বপ্রকার পরিপূর্ণতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং অনুসন্ধিৎসু মনুষ্যদিগের সম্মুখে মানব জীবনের একটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর আদর্শ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন।

নবম অধ্যায়

ব্রাহ্মীস্থিতির আদর্শ

যোগসিদ্ধ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা যায়। এক শ্রেণী বৈরাগ্যপ্রধান, অন্য শ্রেণী প্রেম-প্রধান। যাঁহাদের চিত্তে পূর্ব্ব হইতে বৈরাগ্যের সংস্কারই অত্যন্ত প্রবল থাকে, তাঁহারা তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের পরে ব্যবহারিক জগতের সহিত আর কোন বিশেষ সম্পর্ক রাখেন না, সদা সর্ব্বদা নিঃসঙ্গ অবস্থায় সমাধিতে ব্রহ্মানন্দ উপভোগে নিরত থাকেন। যত দিন প্রারব্ধবশে তাঁহাদের দেহ রক্ষিত হয়, তত দিন তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানে, ব্রহ্মধ্যানে, ব্রহ্মানন্দরস পানেই ডুবিয়া থাকেন, জগতের কোন খোঁজ খবর রাখেন না। জগৎ তাঁহাদের নিকট কেবলমাত্র পারমার্থিক দৃষ্টিতেই মিথ্যা নয়, ব্যবহারিক হিসাবেও তুচ্ছ ও হেয়। সুতরাং তাঁহাদের দেহে যতদিন প্রাণ থাকে, ততদিন নিত্য নিরন্তর আত্মসমাহিতভাবে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিয়াই তাঁহারা কাল অতিবাহিত করেন। ইহাই তাঁহাদের ব্যাবহারিক জীবনে একমাত্র কার্য্য হয়। তৎপর কালক্রমে প্রারব্ধক্ষয়ে দেহপাত হইলে তাঁহারা বিদেহমুক্ত হন—ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন।

যাঁহাদের চিত্তে প্রেমের সংস্কার প্রবল, অবিদ্যাগ্রস্ত

সংসারতাপ-পীড়িত জীব সমূহের দুঃখ দর্শনে যাঁহাদের হৃদয় করুণায় বিগলিত হয়, আত্মৌপম্য দৃষ্টিতে পরের সুখ দুঃখ নিজের বলিয়া অনুভব করা যাঁহাদের স্বভাব, সমাধি অবস্থা হইতে ব্যুত্থান অবস্থাতে অবতরণ করিলেই যাঁহাদের অন্তঃকরণ জীবের দুঃখ সম্বন্ধে সজাগ হয়, সেই জীবপ্রেমিক মহাপুরুষগণ তত্ত্বসাক্ষাৎকারের পরে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মভাব লইয়া আবার লোক সমাজে আত্মপ্রকাশ করেন, ব্যবহারিক জগতের সহিত আবার ব্যবহারিক সম্বন্ধ স্থাপন করেন, লোক সকলকে নিজেদের পবিত্র সঙ্গলাভের সুবিধা প্রদান করিয়া অনুগৃহীত করেন, মানব-সমাজের সম্মুখে দুঃখ-দৈন্যাদিশূন্য পরিপূর্ণ-মানব-চরিত্রের আদর্শ উপস্থাপিত করিয়া পরম কল্যাণের পথ প্রদর্শন করেন। জীব-প্রেমই তাঁহাদের ব্যক্তিত্বকে কথঞ্চিৎ ঘনীভূত করিয়া রাখে—সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মে বিলীন হইতে দেয় না। তাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানে আপনাদিগকে সর্ব্বকর্ম্মবিমুক্ত জানিয়াও জীবহিতের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে যথাবিহিত কর্ম্ম করেন, তাঁহারা সর্ব্বক্লেশ পরিমুক্ত হইয়াও জীবের ক্লেশ নির্ব্বিকার ও সুপ্রসন্ন চিত্তে নিজেদের স্কন্ধে বহন করিতে প্রস্তুত হন, তাঁহাদের মন সাম্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও জীবজগতের ব্যবহারিক বৈচিত্র্য অঙ্গীকার করিয়া লইয়া 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় চ' দেশ-কালপাত্রানুযায়ী ব্যবহার করেন, এবং অন্যকেও নিজের ও পরের কল্যাণোদ্দেশ্যে তদ্রূপ ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেন। জীবহিতই তাঁহাদের ব্যাবহারিক জীবনের নিয়ামক। কোন

বিষয়ে তাঁহাদের অভিমান নাই, কোন কর্ম্মের সিদ্ধিতে বা অসিদ্ধিতে তাঁহাদের কোনরূপ বিকার নাই, নিন্দা-প্রশংসা কি মান-অপমানে তাঁহাদের চিত্তে কোন দাগ লাগে না; অথচ বিষয় হইতে, কর্ম্ম হইতে, নিন্দা-প্রশংসাদির স্থল হইতে, তাঁহারা দূরেও পলায়ন করেন না। জীবের কল্যাণের জন্যই তাঁহাদের জীবন। তজ্জন্য কখন কখন সামাজিক ও রাষ্ট্রিক কর্ম্মকোলাহলের সঙ্গেও যোগদান করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না। মানুষ যে কত বড়, মানুষের অধিকার যে কত উচ্চ, মানুষ স্বকীয় জ্ঞান, শক্তি, প্রেম প্রভৃতির যথোচিত অনুশীলন দ্বারা যে কতদূর পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারে, সংসারের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও মানুষ যে কি ভাবে সকলপ্রকার মলিনতা, সংকীর্ণতা, ভয় দুঃখ, প্রভৃতি দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া অবস্থান করিতে পারে, সকল কর্ম্ম করিয়াও মানুষ যে কি ভাবে সর্ব্ব-কর্ম্মাতীত ও সর্ব্ববন্ধনবিহীন হইয়া পরিপূর্ণ আনন্দময় রাজ্যে বিচরণ করিতে পারে তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া মানুষকে আত্মগৌরব সম্বন্ধে সজাগ ও আত্মানুশীলনে প্রবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যেই ভগবদ্‌বিধানে লোকসমাজের ভিতরে এইরূপ লোকোত্তর মহাপুরুষগণ জীবন যাপন করিয়া থাকেন।

যোগিরাজ গম্ভীরনাথ শেষোক্ত শ্রেণীর মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি সিদ্ধিলাভের পর নিত্যনিরন্তর গুহাহিত হইয়া চিত্তবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক নিস্তরঙ্গ ব্রহ্মানন্দসম্ভোগে ডুবিয়া থাকিতে পারিতেন, কিন্তু জীবপ্রেম তাঁহাকে গুহা হইতে টানিয়া বাহির

করিল। তিনি সংসার ও সমাধির মাঝখানে অবস্থিত থাকিয়া ব্রাহ্মীস্থিতির আদর্শ লোকসমাজে শিক্ষা দিবার জন্য আত্মপ্রকাশ করিলেন। তিনি লোকসঙ্গ ও লৌকিক ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন না করিয়া আত্মসমাহিত অবস্থায় স্বপ্নাবিষ্টবৎ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। বেদান্ত ও যোগশাস্ত্রের পরিভাষা গ্রহণ করিলে বলিতে হয় যে, তিনি অধিকাংশ সময় পঞ্চম ভূমিতে অবস্থান করিয়া ব্যবহার চালাইতেন, কখন কখন চতুর্থ ভূমিতেও অবতরণ করিতেন। ষষ্ঠ ও সপ্তম ভূমিতে ব্যবহার সম্ভব হয় না। যখন লোকসঙ্গ না থাকিত, তখন চিত্তবৃত্তি নিরোধ পূর্ব্বক সমাধিমগ্ন হইয়া ষষ্ঠ ও সপ্তম ভূমিতে আরূঢ় হইয়া বিশেষ আনন্দ সম্ভোগ করিতেন।

যে সব জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ বাহিরে আসিয়া লৌকিক ব্যবহারে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদেরও সকলের আচরণ এক প্রকার পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহাদের ব্যবহারে দেখা যায় যে, কেহ কেহ জ্ঞানরসিক, কেহ কেহ ধ্যানরসিক, কেহ কেহ ভাবপ্রবণ; কেহ কেহ কর্ম্মপ্রিয়। কোন কোন মহাত্মা প্রেমে বিগলিত হইয়া নৃত্য গীত হাস্য ও ক্রন্দন করিয়া থাকেন,—'হসত্যথ রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদ্বন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ'। কোন কোন মহাত্মা স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াও জড় উন্মত্ত বা পিশাচের মত বিচরণ করেন। কোন কোন মহাত্মা প্রশান্ত গম্ভীর মহাকাশের ন্যায় অবস্থান করেন। কেহ কেহ বিচারপথ অবলম্বন করিয়া শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে জিজ্ঞাসুদিগকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ

করেন। কেহ কেহ বা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিচারশক্তি দ্বারা বিরুদ্ধ-মতাবলম্বীদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বীয় মতের প্রতিষ্ঠা করেন। কোন কোন মহাপুরুষ সাধ্যসাধন বিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করেন। কোন কোন মহাপুরুষ ধর্ম্মার্থীদিগকে শিষ্যত্বে গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ও তৎসূত্রে সমাজকে ধর্ম্ম ও কল্যাণের পথে প্রবর্ত্তিত করেন। কোন কোন মহাত্মা লোকসমাজের সম্পর্কে আসিয়াও সদাসর্ব্বদা অন্তর্মুখ ও ধ্যানপরায়ণ থাকিয়া নিজের এই পরম কল্যাণকর আচরণ দ্বারাই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য শিক্ষা দান করেন। কাহারও কাহারও লোকশিক্ষার ক্ষেত্র অতি বিস্তৃত হয়, কেহ কেহ অল্প পরিসরের মধ্যে লোকসংগ্রহের কার্য্য করেন। কোন কোন মহাত্মার মেজাজ একটু রুক্ষ হইতে দেখা যায়, তাঁহারা যাহাদের প্রতি কৃপা করেন, তাহাদের প্রতিও অনেক সময় রুক্ষ ব্যবহার করেন; কোন কোন মহাত্মা সকলের প্রতিই অতি মধুর প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করেন—কাহারও মনে কখনও কোনরূপ আঘাত প্রদান করেন না। কাহারও ব্যবহারের মধ্যে কথঞ্চিৎ রাজস বা তামস ভাবোচিত কার্য্যও লক্ষিত হয়, কাহারও ব্যবহার আবার বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবে পরিপূর্ণ।

যে সব মহাপুরুষ শাস্ত্রে ও লোকসমাজে জীবন্মুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন, যাঁহারা স্বকীয় আত্মার ব্রহ্মস্বরূপত্ব ও সর্ব্বাত্মকত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়া সকল ভেদ অতিক্রম

করিয়াছেন, তাঁহাদের ব্যবহারিক জীবনে এইরূপ পার্থক্য কেন দৃষ্ট হয়, সে বিষয়ে নিশ্চিত উত্তর পাওয়া কঠিন।

শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রণালী অনুসরণ করিয়া আমরা এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, ধ্যানযোগে আত্মসমাহিত হইবার পূর্ব্বে যে সাধকের চিত্তে যে জাতীয় সংস্কার প্রবল থাকে, তদনুসারেই জীবন্মুক্ত অবস্থায় তাঁহার ব্যবহারিক জীবনের ভাব ও বৃত্তি নিয়মিত হয়, এবং যেরূপ সম্প্রদায় ও মতের অনুসরণে সাধন ভজন করিয়া তিনি সিদ্ধিলাভ করেন, সিদ্ধাবস্থায় তাঁহার উপদিষ্ট তত্ত্ব এবং সাধনপ্রণালীও প্রায়শঃ তদনুযায়ীই হইয়া থাকে। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মজনিত সংস্কার ও অদৃষ্ট এবং বর্ত্তমান জীবনে দেশ, কাল, জাতি, বর্ণ, সমাজ, সম্প্রদায়, শিক্ষা, দীক্ষা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রকারভেদে সাধকদিগের রুচি, বুদ্ধি ও অভ্যাস বিশেষ বিশেষ আকারে গঠিত হইয়া থাকে। তীব্র পুরুষকারের সহিত অন্তরঙ্গ সাধনে নিমজ্জিত হইলে সেই সব সঙ্কীর্ণ রুচি, বুদ্ধি ও সংস্কার প্রসুপ্ত হইয়া অন্তঃকরণে সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে, তাহাতে তাঁহাদের তত্ত্বসাক্ষাৎকারের কোন বাধা হয় না। তাঁহাদের তত্ত্বান্বেষিণী বুদ্ধি এই সকল অনাত্মভাবকে শ্রবণ, মনন, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি প্রভাবে অতিক্রম করিয়া পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকে। যতদিন চিত্তকে নিত্যনিরন্তর তত্ত্বে রাখা যায়, ততদিন এই সব সংস্কার ও প্রবৃত্তি জাগ্রত হইতে ও স্থূলভাবে আত্মপ্রকাশ করিতে অবসর প্রাপ্ত হয় না।

মৌন ভঙ্গ করিতে পারিত না। কেহ না বুঝিয়া বার বার তদ্রূপ কোন প্রশ্ন করিলে, তিনি ধীর গম্ভীরস্বরে বলিতেন,— "ইহ্ ব্যর্থ প্রশ্ন হ্যায়।" তাঁহার প্রত্যেকটি উপদেশ সূত্রাকারে এক একটি সিদ্ধান্ত বাক্য। এক একটি উপদেশ বাক্য লইয়া যতই চিন্তা ও আলোচনা করা যায়, ততই তাহার ভিতর হইতে জীবন-নিয়মের উপযোগী অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হয়। প্রশ্ন ও উত্তর জটিল হইলে মাঝে মাঝে তিনি ছোট ছোট গল্প দ্বারাও উপদিষ্ট বিষয় পরিষ্কার করিয়া দিতেন।

সাধন জীবন শেষ হইবার পরেও অনেক বৎসর তিনি কাহাকেও শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতে রাজী হন নাই। নারদ-পরিব্রাজক উপনিষদে মুমুক্ষু উপদিষ্ট হইয়াছেন,—

"ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্ বহূন্।
ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ॥"

—বহু শিষ্য করিবে না, বহু গ্রন্থও অভ্যাস করিবে না, শাস্ত্র ব্যাখ্যাতেও নিযুক্ত হইবে না, নূতন কর্ম্মও আরম্ভ করিবে না। সাধনাবস্থায় ত তিনি এ নিয়ম পূর্ণমাত্রায়ই প্রতিপালন করিয়াছেন। তাহাই এরূপভাবে তাঁহার স্বভাবে পরিণত হইয়াছিল যে, সিদ্ধাবস্থাতেও তিনি তাহার অন্যথা করিতেন না।

তিনি আচরণে সনাতন ধর্ম্মের বিধি মানিয়া চলিতেন। বিধি-নিষেধের অতীত অবস্থায় বিরাজিত থাকিয়াও লোক-চক্ষুর সম্মুখে—লৌকিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে—তিনি শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধের প্রতি কখনও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতেন না।

তিনি যখন যেখানেই যাইতেন, যেখানেই থাকিতেন, তাঁহার ভাবের ও বৃত্তির কোন পরিবর্ত্তন ঘটিত না। প্রায় সর্ব্বদাই স্থিরাসনে উপবিষ্ট থাকিতেন, দৃষ্টি সর্ব্বদাই অন্তর্নিবদ্ধ থাকিত। যখন বিচরণ করিতে, কার্য্য করিতে বা উপদেশ দিতে হইত, তাহাও যেন তাঁহার অর্দ্ধসুপ্ত অবস্থায় আপনা আপনি সম্পন্ন হইয়া যাইতেছে বোধ হইত। তিনি পরবর্ত্তীকালে শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন যে,—"কি হইয়াছে, কি হইতেছে বা কি হইবে, কোন কিছু হবে কি না হবে—এ সব বিষয়ে 'খেয়াল' করিবে না, বাহ্যিক কর্ম্ম ও সাধনভজন সকলই কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে সম্পাদন করিয়া যাইবে মাত্র।" তাঁহার নিজের ব্যবহারিক জীবনে এই ভাব পরিস্ফুট ছিল। বাহিরের কোন প্রকার অবস্থা-বিপর্য্যয়ে তাঁহার ভিতরের অবস্থার কোন বিপর্য্যয় ঘটিত না। সুখ-দুঃখে, শীত-গ্রীষ্মে, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে, লাভ-লোকসানে কেবলমাত্র তাঁহার আন্তর ভাবেরই যে কোন বৈলক্ষণ্য হইত না, তাহা নহে, তাঁহার বাহ্যিক ভাবেরও কোন বিকার লক্ষিত হইত না, তাঁহার মুখে চোখে কথায় বা কার্য্যে কোন প্রকার ভাবান্তর প্রকাশ পাইত না। তাঁহাকে যখন যেখানে যে অবস্থাতেই দর্শন করা যাইত, দেখিলে স্বতঃই মনে হইত যে তিনি যেন সর্ব্বদাই কোন্ ধ্যানলোকে, কোন্ সুদূর চির-প্রশান্তির রাজ্যে নিরাবিল আনন্দে বিহার করিতেছেন, কেবলমাত্র ইহলোকের আকর্ষণে, প্রেমের টানে, জীব-

হিতাকাঙ্ক্ষার প্রেরণায়, মাঝে মাঝে এখানে অবতরণ করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়া যাইতেছেন। বোধ হইত যেন, এই জগতের সহিত সম্বন্ধবিহীন হইয়া সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দ সরোবরে রাজহংসের ন্যায় নির্ম্মুক্তভাবে বিচরণ করিতেছেন, এই বিশ্বের প্রাণহিল্লোলে তাঁহার প্রাণবায়ু আপনা আপনি ঈষৎ স্পন্দিত হইতেছে, এবং জড়ের ঘাতপ্রতিঘাতে তাঁহার দেহ কিঞ্চিৎ ক্রিয়াশীল হইতেছে।

তাঁহার বাহিরের ক্রিয়া কি ভাবে সম্পাদিত হইত, দু' একটি সামান্য দৃষ্টান্তে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া যাইতে পারে। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার ধূমপানের অভ্যাস ছিল। তাঁহার সিদ্ধাবস্থায় এই ধূমপান একটি দর্শনীয় ব্যাপার হইয়াছিল। তিনি অন্তর্নিহিতদৃষ্টি হইয়া নিজের ভাবে মগ্ন আছেন, সেবক তাঁহার চক্ষু কিঞ্চিৎ উন্মীলিত দেখিয়া তামাক সাজিয়া তাঁহার আসনের সম্মুখে রাখিয়া গেল; চোখ কতকটা খোলা, কিন্তু সে খোলা চক্ষুতে দৃষ্টি কোথায়? দৃষ্টি যে আত্মনিবদ্ধ। তামাকের কলিকা তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল না। কলিকাটি যেন কিয়ৎকাল তাঁহার স্পর্শানুগ্রহ লাভের আশায় সতৃষ্ণভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার আশা বৃথা হইল, অবশেষে হতাশ হইয়া সে শীতলত্ব প্রাপ্ত হইল। সেবকেরও ত তৃপ্তি নাই, সে তাঁহাকে তামাক সেবন করাইতে না পারিলে সেবার ত্রুটী রহিয়া গেল মনে করে। সে আর এক কলিকা সাজিয়া সমস্ত ঠিক্‌ঠাক্ করিয়া তাঁহার হাতের

ভিতর পুরিয়া দিল। হাত অভ্যাসবশে কলিকাটি ধারণ করিল বটে, কিন্তু যিনি তামাক সেবন করিবেন, তিনি কোথায়? হাত ও মুখের দূরত্ব যে ঘুচাইয়া দিবে, সেই মন কোথায়? তাঁহার অন্তঃকরণের কার্য্য চলিতেছে কিনা সন্দেহ, চলিলেও এ জগতে নয়। কলিকা হাতে আছে, আগুন আবার নিবিয়া গেল, তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি নীরব নিস্পন্দভাবে যেমন ছিলেন, তেমনি রহিলেন। সেবক হাত হইতে কলিকাটি নামাইয়া লইল, সেদিকে খেয়াল নাই। কিন্তু তাঁহাকে ধূমপান করাইতেই হইবে। সেবক আর এক ছিলিম সাজিল, নিজেই কোন রকমে তাঁহার দৃষ্টি বাহিরে আকর্ষণ করিল এবং কলিকাটি হাতে দিল। তিনি স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় একবার সেদিকে তাকাইলেন, অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় হাত মুখের নিকটে নিয়া তামাকে এক টান দিলেন। টান দিয়াই আবার ধ্যানস্থ। মুখের সন্নিকটে কলিকাটি হস্তবদ্ধ থাকিয়া অল্প অল্প ধূম উদ্‌গিরণ করিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশরীর স্থির, নিস্পন্দ। সেবক কিছুক্ষণ পরে কলিকাটি লইয়া গেল। এইরূপে ক্রমান্বয়ে তিন চারি ছিলিম তামাক দিয়া তাঁহার বহুকাল সঞ্চিত ধূমপানের অভ্যাসটি বজায় রাখা হইত।

সাধনাবস্থার পরে তিনি যখন যেখানে অবস্থান করিতেন, তাঁহার সঙ্গে প্রায়ই অনেক সাধু বাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেক সময় বহির্মুখ, পরচ্ছিদ্রান্বেষী, কর্কশ-স্বভাব, কলহপ্রিয়, সাধুবেশধারী লোকও আসিয়া জুটিত। তাহারা

মাঝে মাঝে নানা বাহ্য বিষয়ের আলোচনা করিত, অনাবশ্যক পরচর্চ্চায় সময় নষ্ট করিত, তর্ক বিতর্কে উন্মত্ত হইয়া কখন কখন কলহ, মারামারি, এমন কি রক্তপাত পর্য্যন্ত করিয়া ফেলিত। মহাপুরুষের সঙ্গের প্রভাব অতিক্রম করিয়াও তাহাদের স্বভাবের কলুষতা আত্মপ্রকাশ করিত। বাবা গম্ভীরনাথ এই সব অবস্থার মধ্যেও নির্ব্বিকার চিত্তে 'যথা পূর্ব্বং তথা পরং' ধ্যানাবিষ্টভাবে অবস্থান করিতেন। কাহাকেও কিছু বলিতেন না, কোনরূপ শক্তি প্রকাশও করিতেন না, তাহাদের সঙ্গ বর্জ্জনও করিতেন না। প্রবল প্রারব্ধ কিয়ৎ পরিমাণ ভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না, প্রবল চিত্তবৃত্তি কার্য্যে কতকটা প্রকাশিত না হইলে শান্ত হয় না, হৃদয়ে প্রজ্বলিত অশুভ ভাবের দাবানল কতক পরিমাণে শিখা ও ধূমরূপে আত্মপ্রকাশ না করিয়া ও কতক পরিমাণে ধ্বংসলীলা সমাধা না করিয়া নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত হয় না;—হয়ত এই নীতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তিনি তাহাদের ভিতরের তামস ভাব কতক পরিমাণে বাহিরে আসিতে দিতেন; সম্ভবতঃ ইহাতে পরিণামে তাহাদের কল্যাণই হইত এবং ইহার মধ্য দিয়াই মহাপুরুষের সঙ্গের প্রভাব তাহাদের উপর কার্য্য করিত। যাহা হউক, কার্য্যতঃ দেখা যাইত যে তাঁহার নিকটে একটা নিতান্ত অশোভন ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, অথচ তিনি উদাসীন, নীরব, নিস্পন্দ, জড়ের ন্যায় অবস্থিত। তাহাদের তামস ভাব কতকটা বাহির হইয়া গেলে, স্বাভাবিক নিয়মে তাহাদের চিত্ত

কতকটা শান্ত হইয়া আসিত, তখন অনেক সময় উভয় পক্ষই মীমাংসার জন্য সমীপবর্ত্তী প্রশান্তমূর্ত্তি মৌনবান্ ধ্যানলোক-বিহারী মহাপুরুষের শরণাপন্ন হইত। যতক্ষণ পর্য্যন্ত উত্তেজিত ভাবে তাহারা নিজ নিজ পক্ষের বক্তব্য বলিতে থাকিত, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি তেমনি সমাহিত ভাবেই অবস্থান করিতেন, মুখে চোখে কোন ভাবান্তর নাই, কোন কথা তাঁহার নিকট পৌঁছিতেছে কিনা, তাহাও বুঝা শক্ত। যখন তাহাদের সব কথা বলা শেষ হইয়া গেল, বলিতে বলিতেই যখন উত্তেজনাও অনেকটা উপশমিত হইল, সেই অনুপম গম্ভীরমুর্ত্তির নিকট হৃদয় লজ্জাবনত হইয়া পড়িল, তখন তিনি একবার হয়ত বলিলেন 'আচ্ছা নেহি' অথবা 'সাধু লোগোঁকা য়ৈসা কাম আচ্ছা নেহি', কিংবা এই জাতীয় আর এক আধটা কথায় বা ইঙ্গিতে তাহাদের বিবাদের বিষয়টি সম্বন্ধে একটি মীমাংসার পথ প্রদর্শন করিয়া দিলেন। তৎপরেই আবার ধ্যানস্থ। এই সামান্য ইঙ্গিতেই অধিকাংশ স্থলে তাহাদের কলহের মীমাংসা হইয়া যাইত, এবং পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট ভাব বিনষ্ট হইত। অবস্থানুসারে অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থাও করিতেন।

এইরূপে সমাধি ও সংসারের মধ্যস্থলে অবস্থান পূর্ব্বক বাবা গম্ভীরনাথ লৌকিক জগতে প্রেম-পূর্ণ ব্যবহার চালাইতে এবং লোকসমাজকে পরিপূর্ণতা লাভের পথে সাহায্য করিতে ব্রতী হইলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী জীবন এই ভাবেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া অগ্রসর হইতে লাগিল।

দশম অধ্যায়।

সাধনান্তে সহজ জীবন।

সাধনান্তে কপিলধারাতেই ব্রহ্মানন্দে বিভোর যোগিরাজ গম্ভীরনাথ প্রায় ৯।১০ বৎসর অবস্থান করেন। মাঝে মাঝে স্বীয় আশ্রম ছাড়িয়া নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য গুহাদিতে গিয়া সমাধিমগ্ন হইতেন। কখন কখন বিশেষ পুণ্য যোগাদি উপলক্ষে শাস্ত্র ও সমাজের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনার্থে তিনি তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইতেন। ১২৯০ বঙ্গাব্দে ভক্তপ্রবর বিজয়-কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার প্রথম দর্শন লাভ করেন। উত্তরকালে যে সমাধি-নিমজ্জনশীল যোগিরাজ তাঁহার সমাধির অতলগর্ভ হইতে কতক পরিমাণে উত্থিত হইয়া লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে আত্মপ্রকট করিবেন, এবং বঙ্গদেশীয় বহুসংখ্যক ধর্ম্মপিপাসু নরনারী যে তাঁহাকে গুরুপদে বরণ পূর্ব্বক তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন, ধর্ম্মাচার্য্য গোস্বামী মহাশয়ের নিকট তাঁহার আত্মপ্রকাশের ভিতর দিয়াই এ ব্যাপারের সূত্রপাত হইয়াছিল।

ব্রহ্মনিষ্ঠ সাধক বিজয়কৃষ্ণ মহাযোগী গম্ভীরনাথের আধ্যাত্মিক মহিমা উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি একান্তভাবে আকৃষ্ট হন, এবং বাবা গম্ভীরনাথও এরূপ প্রেমিক ভক্ত ও

উচ্চাধিকারী সাধকের প্রতি বিশেষ স্নেহশীল হন। তদবধি অনেক সময় গোস্বামী মহাশয় বাবাজীর নিকট যাতায়াত করিতেন। তিনি প্রাণের টানে কখনও সংগোপনে গভীর নিশীথে কখনও বা দিবাভাগে বাবাজীর সঙ্গলাভের জন্য ছুটিয়া যাইতেন। উভয়ের মধ্যে একটি গভীর প্রেমের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

গোস্বামী মহাশয় সদ্‌গুরুর কৃপা প্রাপ্ত হইয়া উচ্চাঙ্গের সাধনা দ্বারা সত্যগৃহে প্রবেশলাভ করিবার পূর্ব্বেই একজন অত্যুন্নত সাধক ও ধর্ম্মাচার্য্য বলিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। বহুসংখ্যক সুশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তি তাঁহার ভক্তি ও প্রেম দর্শনে মুগ্ধ হইয়া এবং তাঁহার উপদেশের গভীরতায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ লাভ করিবার জন্য যাতায়াত করিতেন। সদ্‌গুরুর কৃপালাভের পর তিনি অনেক ধর্ম্মপিপাসুকে দীক্ষাপ্রদান করেন। তিনি নিজের শিষ্যদের নিকট বাবা গম্ভীর-নাথের মহিমা কীর্ত্তন করিতেন, এবং তাহাদিগকে তাঁহার সঙ্গ করিতে উপদেশ দিতেন। অনেককে তিনি নিজে একাধিক বার বাবাজীর নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। গোস্বামী মহাশয় ও তাঁহার শিষ্যদের নিকটই বাঙ্গালীসমাজ বাবা গম্ভীরনাথের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হয়। গোস্বামী মহাশয় তাঁহার অনেক শিষ্যের নিকট বলিয়াছেন যে 'বাবা গম্ভীরনাথের ন্যায় মহাত্মা হিমালয়ের নীচে আর দেখা যায় না।' গোস্বামী মহাশয়ের

বিশিষ্ট সেবক ও শিষ্য শ্রদ্ধা-ভাজন শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার কয়েকজন শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা ও বাবাজীর কয়েকজন শিষ্যের সাক্ষ্য সংগ্রহ করিয়া বাবাজীর সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে বাবজীর গয়ায় অবস্থান কালের ও তৎপরবর্ত্তী সময়ের কিছু কিছু ঘটনা অবগত হওয়া যায়।

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নবকুমার বিশ্বাস মহাশয় বলিয়াছেন,—"যেবার আমি আকাশগঙ্গা পাহাড়ে গোঁসাইজীর নিকট দীক্ষা পাই, সেবার গোঁসাই একদিন বলিলেন, 'চলুন, বাবা গম্ভীরনাথকে দর্শন করিয়া আসি।' গোঁসাইজীর সহিত আমি ও বর্দ্ধমানের বাবাজী স্বামী দেবপ্রতিপালক চলিলাম। আমরা আশ্রমে গেলে গম্ভীরনাথজী খবর পাইয়া আমাদিগকে দর্শন দিলেন। গোঁসাইয়ের সহিত দুই একটী কথা হইবার পর, গোঁসাই বলিলেন 'বাবা, দয়া করিয়া কিছু ধর্ম্মোপদেশ দিন।' বাবা বলিলেন 'আমি কিছুই জানি না। তবে যদি ইচ্ছা হয়, আমি যাহা করি, আমার ভজন গৃহে গিয়া ইঁহারা দর্শন করিয়া আসিতে পারেন।' পুনরায় বাবাকে অনুরোধ করিলাম 'বাবা, কিছু ধর্ম্মোপদেশ দিন।' বাবা তদুত্তরে বলিলেন 'হাম্ সাচ্ বল্‌তা, হাম্ কুছ্ নেই জান্‌তা'।"*

* মহাত্মা বাবা গম্ভীরনাথজী—১ পৃষ্ঠা।

কেনোপনিষদে উক্ত হইয়াছে,—

"যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নূনং ত্বং বেত্থ ব্রহ্মণো রূপম্।

**যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।"

—যদি মনে কর যে তুমি ব্রহ্মকে উত্তমরূপে বিদিত হইয়াছ, তবে বস্তুতঃ তুমি তাঁহার স্বরূপ অল্পই জানিয়াছ। যিনি জানেন যে ব্রহ্ম তাঁহার জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহেন, তাঁহার জানাই বস্তুতঃ ঠিক, এবং যিনি মনে করেন যে 'আমি ব্রহ্মকে জানি,' তিনি বস্তুতঃ কিছুই জানেন না।

কর্ত্তৃত্বাভিমান এবং ভোক্তৃত্বাভিমান অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর যে এই জ্ঞাতৃত্বাভিমান, তাহা হইতেও মুক্তিলাভ করা আবশ্যক, নচেৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। অহংকার বিনষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত অবাঙ্মনসগোচর ও সর্ব্বজ্ঞানাশ্রয় ব্রহ্ম উপলব্ধি গোচর হন না। ব্রহ্মসমাহিতচিত্ত অহং-লেশ-শূন্য যোগিরাজ গম্ভীরনাথ বোধ হয় উপনিষদুক্ত এই ভাবের অনুভূতি হইতেই বলিয়াছিলেন 'হাম্ সাচ্ বল্‌তা, হাম্ কুছ্ নেহি জান্‌তা।' উপদেশ-প্রার্থিগণ সুশিক্ষিত (বা শিক্ষাভিমানী) বাঙ্গালী তাঁহারা ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মোপদেষ্টাগণের নিকট হইতে অনেক ধর্ম্মোপদেশ শিখিয়াছেন এবং নিজেরাও অনেক ধর্ম্মোপদেশ দিতে পারেন। সুতরাং অন্য ধর্ম্মোপদেশ অপেক্ষা বাবাজীর এই বিনয়মণ্ডিত বাক্যটুকু সম্ভবতঃ তাঁহাদিগের নিকট অধিকতর শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল; তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হইলে ভাব কিরূপ

হয়, তাহার পরিচয় পাইয়া সম্ভবতঃ তাঁহাদের জ্ঞানাভিমান চূর্ণ হইয়াছিল, এবং অভিমান বর্জ্জনই যে ধর্ম্মের ভিত্তি, তাহা তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন।

বিশ্বাস মহাশয় আরো বলিয়াছেন যে "অতঃপর বাবা আমাদের প্রত্যেককে এক এক খানা 'বজরংকা রোট' (এক রকম খাজা বিশেষ) এবং দশ বারটী উৎকৃষ্ট গুজরাটী এলাচী খাইতে দিলেন। আমরা ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আশ্রমে ফিরিলাম। আশ্রমে ফিরিলে গোঁসাইজী এক সময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেখুন, বাবা গম্ভীরনাথজী যে এলাচী দিয়াছিলেন, তাহার কি কিছু আছে?' আমি বলিলাম, 'না—নাই, সব খেয়ে ফেলেছি'। গোঁসাই বলিলেন 'মহাপুরুষের দান যত্নে রেখে দিয়ে মাঝে মাঝে খেতে হয়'।"*

বাবাজী অতি সুন্দর সেতার বাজাইতে পারিতেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বেই তিনি সেতার বাজান অভ্যাস করিয়াছিলেন। সেতারের সঙ্গীত তাঁহার অতিপ্রিয় ছিল। সহজাবস্থায় প্রায়ই সঙ্গে একটি সেতার থাকিত। কখন কখন পর্য্যটনের সময়ও তিনি একটি সেতার সঙ্গে লইয়া যাইতেন। কপিলধারায় কখন কখন গভীররাত্রে সেতারের মনোহর সঙ্গীত শোনা যাইত। সেতারে সুর দিয়া তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন। অঙ্গুলি আপনা আপনি তারের উপর দিয়া সঞ্চালিত হইতে থাকিত। সেই সুরের ভজন যে শুনিয়াছে, সেই মুগ্ধ

* মহাত্মা বাবা গম্ভীরনাথজী—৪ পৃষ্ঠা।

হইয়াছে। গোঁসাইজী বলিয়াছেন যে, তিনি যখন আকাশগঙ্গা পাহাড়ে থাকিতেন, তখন অনেক সময় গভীররাত্রে বাবা গম্ভীরনাথের সেতারের ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করা মাত্র তিনি আত্মহারা হইয়া বাবাজীর নিকট ছুটিয়া যাইতেন। গোঁসাইজীর ভক্ত-শিষ্য বিশ্বাস মহাশয় বলিয়াছেন, 'আকাশ-গঙ্গার আশ্রমে আমরা শয়ন করিয়া আছি; সমস্ত নিস্তব্ধ, নীরব, জ্যোৎস্নার রাত্রি। মাঝে মাঝে শুনিতে পাইতাম, কে পাহাড়ের শৃঙ্গে একটা দুইটার সময় সেতার বাজাইয়া ভজন করিতেছেন। গোঁসাই আমাদিগকে বলিতেন "ঐ শুনুন, বাবা গম্ভীরনাথ কি মিষ্ট ভজন করিতেছেন।" কোন কোন দিন ঐ ভজন শুনিয়া, তিনি একাকী নিশীথ সময়ে ছুটিয়া চলিয়া যাইতেন। দুই এক ঘন্টা পরে ফিরিয়া আসিতেন। একদিন ঠাকুর বলিলেন "বাবা বড় প্রেমিক, এবং খুব শক্তিসম্পন্ন মহাত্মা, হিমালয়ের নীচে এরূপ আর দেখা যায় না। পাহাড়ে কত বাঘ, সাপ, হিংস্রজন্তু রহিয়াছে; বাবার শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া কেহই ইঁহার অনিষ্ট করে না। বাবা এইরূপ নিশীথ সময়ে সেতার বাজাইয়া ভজন করিতে করিতে পাহাড়ের এক শৃঙ্গ হইতে অপর শৃঙ্গে চলিয়া যাইতেন।" *

গোস্বামীদেবের অন্যতম শিষ্য শ্রদ্ধাস্পদ মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয় লিখিয়াছেন,—"শ্বাপদ-সঙ্কুল গয়ার পাহাড়ে কপিলধারার শৃঙ্গে বসিয়া গম্ভীরনাথজী গভীর রাত্রে সেতার

* মহাত্মা বাবা গম্ভীরনাথজী—৪ পৃষ্ঠা।

বাজাইয়া ভজন করিতেন ; আর আকাশগঙ্গার পাহাড় হইতে গোঁসাইজী সঙ্গিগণকে ফেলিয়া বন-জঙ্গল কাঁটা-কাঁকর অগ্রাহ্য করিয়া উন্মত্ত মনে ছুটিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন। এ কিসের প্রেম! কিসের টান! কোন্ প্রেমে ইঁহারা বাঁধা পড়িয়াছেন? এ বন্ধনের সূত্র কোথায়? কোন্ মালাকার মাঝখানে আসিয়া দুইটী হৃদয় এমন করিয়া বাঁধিয়াছেন? এই পুণ্যকাহিনী শুনিলেও জীবের ধর্ম্ম হয়, পলকের জন্য হৃদয় বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়। টাকা নয়, কড়ি নয়, মান-মর্য্যাদার বা রক্ত-মাংসের সম্পর্ক নাই ; কিসের সম্পর্ক মানুষকে এতদূর উন্মত্ত করে? যিনি ভগবানকে ভালবাসেন, ভক্ত তাঁহার প্রাণের প্রাণ হইবেনই হইবেন ; আর যাঁহারা ভক্তকে ভালবাসেন না, ভগবানের প্রতি তাঁহাদের প্রেম কখনও সম্ভবে না। এই যে ভক্তে ভক্তে কোলাকুলি, ইহার মধ্যেই ভগবানের সাক্ষাৎ প্রকাশ।" * ব্রহ্মজ্ঞানে ও যোগৈশ্বর্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের এই সুমধুর ভজনাস্বাদন এক অপূর্ব্ব লীলাবিলাস।

বাবাজীর কপিলধারায় অবস্থান কালে সেস্থান হইতে অল্প দূরবর্ত্তী বরাবর পাহাড়ে নাথ সম্প্রদায়ের আরও দুই জন সাধক অবস্থান করিতেন। বাবাজী নিজে বলিয়াছেন যে তাঁহারা দুই ভাই, উভয়েই অওঘর, এবং উভয়েই অধ্যাত্ম-রাজ্যে খুব উন্নত সোপানে অধিরূঢ় ছিলেন। বাবাজীর জীবিতাবস্থাতেই তাঁহাদের উভয়ের দেহান্ত ঘটে। বাবাজীর

* মহাত্মা বাবা গম্ভীরনাথজী—২৯ পৃষ্ঠা।

সহিত তাঁহাদের বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ছিল। তাঁহারা মাঝে মাঝে কপিলধারায় আসিয়া বাবাজীর সহিত মিলিত হইতেন এবং বাবাজীও কখন কখন বরাবর পাহাড়ে গিয়া তাঁহাদের সহিত যুক্ত হইতেন। ধনিয়া পাহাড়ে মহাত্মা বাবা ঠাকুর-দাসজীও তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি নানকপন্থী উদাসী-সম্প্রদায় ভুক্ত। তিনিও কয়েক বৎসর পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই চারিজন মহাপুরুষ কখন কখন এক গুহায় বসিয়া সমাধিতে ডুবিয়া থাকিতেন।

তাঁহার লৌকিক ব্যবহারে কয়েকটি নিয়ম লক্ষিত হইত। তিনি ব্যবহার ক্ষেত্রে কখন যোগৈশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেন না। যেরূপ শক্তি বা জ্ঞানের প্রকাশ সাধারণ লোকে অলৌকিক মনে করে, তাহা তিনি যেন সযত্নেই গোপন রাখিতেন। সন্ন্যাসের আদর্শ শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে, তিনি কোন গৃহস্থের বাড়ীতে গমন করিতেন না। রাজ দর্শন এবং রাজা বা জমিদারের দান গ্রহণ তিনি এড়াইয়া চলিতেন। সাধারণতঃ শ্রদ্ধাবান্ দরিদ্র ব্যক্তিদেরই সেবা তিনি সাদরে গ্রহণ করিতেন। আশ্রমে অবস্থিতি কালে আশ্রমের নিয়ম পালন, অতিথি সেবা প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। এ বিষয়ে তিনি গৃহস্থদেরও আদর্শ ছিলেন। আশ্রম সংক্রান্ত কোন কর্ত্তব্য উপস্থিত হইলে অথবা কোন অতিথি আশ্রমে সমাগত হইলে তিনি তাঁহার সহজ সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া সেবকদিগকে প্রয়োজনানুরূপ আদেশ প্রদান করিতেন।

কখন যে তিনি ইহা লক্ষ্য করিতেন, তাহা বুঝা যাইত না। তিনি তাঁহার স্বাভাবিক ধ্যানস্থ অবস্থায় স্বীয় আসনে উপবিষ্ট, দুই চারিজন সাধু বা ভক্ত নিকটে বসিয়া আছেন; হঠাৎ চক্ষু ঈষদুন্মীলিত করিয়া একটি বা দুইটী কথায় কাহাকেও কোন নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া আবার আত্মস্থ হইতেন।

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুত বরদা-কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এল্ গয়ায় ওকালতি করিতেন এবং বাবাজীর সঙ্গ করিবার জন্য প্রায়ই তাঁহার নিকট গমন করিতেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"বাবা অসীম ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহার যথেষ্ট যোগৈশ্বর্য্য থাকিলেও তাহার কোন পরিচয় দিতেন না। নিজকে অত্যন্ত গোপনে রাখিতেন। তাঁহার চলন দেখিয়া কেহই মনে করিতে পারিত না যে, তিনি এত বড় যোগৈশ্বর্য্যশালী মহাপুরুষ ছিলেন।"

একবার তাঁহার একজন গৃহস্থ শিষ্য ও ভক্ত প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া এবং কায়মনে পরিশ্রম করিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। উক্ত শিষ্য বহু বৎসর যাবৎ শুনিয়া আসিতেছেন যে গুরুদেবের অপরিসীম যোগৈশ্বর্য্য আছে, অথচ সাধারণতঃ যোগৈশ্বর্য্য বলিতে যাহা বুঝা যায়, একদিনও গুরুদেব তাঁহার বা অন্য কাহারও নিকট তৎসম্বন্ধে কোন বিশেষ পরিচয় প্রদান করেন নাই। তাঁহার মনে একটি তীব্র আকাঙ্ক্ষা জন্মিল যে গুরুদেবের কিঞ্চিৎ যোগৈশ্বর্য্য দর্শন করেন। এক দিন অবসর বুঝিয়া তিনি গুরুদেবের নিকট

বিনীত ভাবে অথচ সন্তানোচিত আবদারের সহিত স্বীয় প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। বাবাজী শিষ্যের মানসিক ভাব বুঝিয়া তাঁহার প্রার্থনার উত্তরে মৃদুগম্ভীর স্বরে কেবলমাত্র একটি আখ্যায়িকা বিবৃত করিলেন। যোগিগুরু গোরক্ষনাথ যখন যোগসাধনায় নিমগ্ন ছিলেন, সেই সময় এক ব্রাহ্মণ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইয়া বহু বৎসর যাবৎ প্রতিদিন তাঁহাকে পায়সান্ন ভোজন করাইয়াছিলেন। গোরক্ষনাথজী ব্রাহ্মণের সেবায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। সেই ব্রাহ্মণের বাসনা জন্মিয়াছিল যে, নাথজীর কিছু যোগৈশ্বর্য্য দর্শন করেন। নাথজীকে সেবায় সন্তুষ্ট জানিয়া তিনি স্বীয় কৌতূহলের বশে একদিন আপনার মনোগত প্রার্থনা প্রকাশ্যে জ্ঞাপন করিলেন। যোগিগুরু সেবক-বৎসল গোরক্ষনাথজী সেবকের অভিমান চূর্ণ করিয়া তাঁহাকে সেবাপরাধ হইতে মুক্ত করিবার জন্য, প্রথমাবধি যত পায়সান্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বমন পূর্ব্বক দুগ্ধ ও তণ্ডুল পৃথক্ পৃথক্ রাখিয়া দিলেন। আখ্যায়িকাটী শুনিতে শুনিতে গুরুদেবের প্রচ্ছন্ন, অথচ সুতীক্ষ্ণ ভর্ৎসনা ও শাসন বুঝিতে পারিয়া শিষ্য লজ্জায় ও আত্মগ্লানিতে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। সেবা করিয়া তাহার বিনিময়ে কিছু প্রার্থনা করিলে যে কিরূপ ভয়ঙ্কর অপরাধ হয়, তাহা তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল। যদিও বিনিময়ের কথা মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মনে উদিত হয় নাই, এবং সেবা দ্বারা তাঁহার কোন বিশেষ দাবী জন্মিয়াছে, সজ্ঞানে এরূপ বিচার করিয়াও তিনি প্রার্থনা জানান নাই,

তথাপি প্রচ্ছন্নভাবে এরূপ অভিমান তাঁহার মনের অন্তরালে থাকা অসম্ভব নয়। তিনি গুরুদেবকে নিজের কৈফিয়ৎ জানাইয়া, তাঁহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। বাবাজী অবশ্য তাঁহাকে পূর্ব্বেই ক্ষমা করিয়াছিলেন, কেবল শিষ্যকে শিক্ষা দিবার জন্যই উক্ত উপদেশপূর্ণ আখ্যায়িকা বর্ণন করিলেন। তৎপরে দুই একটি স্নেহমাখা মধুর বাক্যে শিষ্যকে সান্ত্বনা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন যে, তুমি ইচ্ছা করিয়া অবশ্যই সেবার প্রতিদানে বা সেবাজনিত বিশেষ অধিকারের অভিমানে এই প্রার্থনা কর নাই; তবে ভবিষ্যতেও কখন এরূপ বুদ্ধি না হয়, তজ্জন্যই সাবধান করা হইল; যোগৈশ্বর্য্য দর্শনের বাসনাও মনে পোষণ করা উচিত নয়।

শ্রদ্ধেয় বরদাবাবু লিখিয়াছেন "একদিন আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, তাঁহার সেতার বাজনা শুনি; প্রাতে উঠিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, দেখি, তিনি খাটুলীর উপর বসিয়া একটি সেতার আনাইলেন ও বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। অতি দক্ষ বাদকের মত এমনই সুন্দর বাজাইলেন যে, আমি মুগ্ধ ও আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। তিনি আমার মনের কথা বুঝিয়া যে আমায় বাসনা পূর্ণ করিলেন, তজ্জন্য আমি কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাসায় ফিরিলাম। এই প্রসঙ্গে আর একদিনের একটি ঘটনা বিবৃত করিতেছি। আমি শুনিয়াছিলাম বাবা বড় ভাল চা প্রস্তুত করেন। একদিন

প্রত্যূষে বাবার নিকটে চা খাইবার জন্য উপস্থিত হইয়া আসন গ্রহণ করিলাম, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিলাম না। আশ্রমে চা হইত না; কিন্তু আমি বসিবার পরই বাবা জল গরম করিয়া চা প্রস্তুত করিতে বলিলেন, এবং প্রস্তুত হইলে জনৈক সেবককে বলিলেন—'বাবুকো লা দেও'। সেবক পিতলের গ্লাসে চা আনিলে বাবা বলিলেন—'নেহি,—লে যাও,—পাথল্‌কা গ্লাস্‌মে লা দেও।' এই কথাটি এই জন্য বলিলাম যে মহাপুরুষগণ অতি সাধারণ গৃহী লোকদিগেরও মর্য্যাদা যে কি ভাবে রক্ষা করেন, তাহা দেখিবার ও শিখিবার জিনিষ। চা পানের পর তিনি সেবক দ্বারা স্থান পরিষ্কার করাইলেন—আমাকে হাত ধুইতে ও উঠিতে দিলেন না।"*

অতিথিসেবা, ভক্তের আকাঙ্ক্ষা পূরণ প্রভৃতি উপলক্ষে এরূপ ছোট খাট ব্যাপার অনেকেই দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এসব ব্যাপারও এমন স্বাভাবিকভাবে তিনি সম্পাদন করিতেন, যাহাতে একথা মনেই করা যাইত না যে ইচ্ছাপূর্ব্বক তিনি বিন্দুমাত্রও যোগশক্তির ব্যবহার করিতেছেন। একজন উচ্চ-কুলোদ্ভব ও উচ্চশিক্ষিত বিশিষ্ট ব্যক্তি যখন কোন কল্যাণকর উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আত্মপরিচয় গোপন করিয়া নিম্ন জাতীয় অশিক্ষিত গ্রাম্যলোকদের সহিত ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব স্থাপন পূর্ব্বক সমানভাবে মিলিত হইতে চেষ্টা করেন, তখন স্বেচ্ছায় ও সবিচারে তাহাদেরই মত সহজ সরল গ্রাম্য-ভাষায় কথাবার্ত্তা

* মহাত্মা বাবা গম্ভীরনাথজী—১৭ পৃষ্ঠা।

বলিতে ও গ্রাম্যভাবে আচার ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেও, যেমন মাঝে মাঝে তাঁহার আলাপ আলোচনা ও আচার-ব্যবহারের মধ্যে অলক্ষিতে ও অনিচ্ছায় তাঁহার উচ্চ বংশ ও উচ্চ শিক্ষার অনুযায়ী সুসংস্কৃত ভাষা ও ভাব আপনা আপনি ব্যক্ত হইয়া পড়ে, এবং তিনি যেমন তদবস্থায় স্বরূপ প্রকাশ-দ্বারা তাহাদের নিকট হইতে দূরে সরিয়া পড়িবার আশঙ্কায় সময়ানুরূপ কথা ও কার্য্য দ্বারা তাহা আবার ঢাকিয়া ফেলিতে যত্নবান্ হন ; তেমনই একজন সর্ব্বদর্শী, সত্যসংকল্প, যোগৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন, ব্রহ্মলোকবিহারী মহাপুরুষ যখন সাধারণ অবিদ্যাগ্রস্ত স্থূলবুদ্ধি মনুষ্যদের প্রতি প্রেমে ও করুণায় বিগলিত হইয়া তাহাদিগকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের সহিত সমান ব্যবহারক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি আপনার সর্ব্বদর্শিত্ব, সত্যসংকল্পত্ব প্রভৃতি গুণ ও শক্তি সম্পূর্ণরূপে গোপন করিয়া চলিলেও মাঝে মাঝে অলক্ষিতে ও অনিচ্ছায় এসব সম্পদের আভাস সামান্য সামান্য আকারে আপনা আপনিই তাঁহার বাক্যালাপ ও কার্য্য-কলাপের মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়া পড়ে, এবং কেহ তৎসম্বন্ধে কোন কৌতূহল প্রকাশ করিলে, পাছে তাঁহাকে দেবতার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কেবলমাত্র পূজা দিয়া তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া পড়ে ও পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হয়, এই ভয়ে তিনি তাহাদের বুদ্ধি-গ্রাহ্য লৌকিক ভাষা ও ভাব আশ্রয় করিয়া পুনরায় তাহা সংগোপন করিতে যত্নবান্ হইয়া থাকেন। শ্রীশ্রীযোগিরাজ

গম্ভীরনাথের ব্যবহারিক জীবন দেখিয়া সাধারণ দৃষ্টিতে এরূপই অনুমান হইত।

আদর্শ-সন্ন্যাসী বাবা গম্ভীরনাথ সংসারীর গৃহে গমন করিতে সর্ব্বদা কুণ্ঠিত ছিলেন, ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার অনুগত-ভক্ত সেবক মাধোলাল—যিনি তাঁহাকে যোগ-গুহা নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন ও অশেষ প্রকারে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, তাঁহাকে অন্ততঃ একবার মাত্র নিজ বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বসতবাটীতে যাইতে তিনি কিছুতেই স্বীকৃত হন নাই। তাঁহার বাগানবাটীতে তিনি কয়েকবার কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি যখন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কোন কোন শিষ্য ও ভক্ত নিজ নিজ গৃহ পবিত্র করিবার ও নিজেরা ধন্য হইবার মানসে তাঁহার পদার্পণ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দয়ার এবং প্রেমের অবতার হইলেও এ প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই।

তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে একবার তিনি উদয়পুর গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ৮।১০ জন সাধু ছিলেন। সেখানে এক নির্জ্জন ময়দানে ধূনী জ্বালাইয়া তাঁহারা কয়েকদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সেস্থানে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া সাধুদের নিকট শোনা গিয়াছে। একদিন সেখানে প্রবল বৃষ্টি হয়, অনেক স্থান জল প্লাবিত হইল।

কিন্তু তিনি তাঁহার সঙ্গী সাধুগণের সহিত যে ময়দানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেখানে বৃষ্টিপাত হইল না। ইহা মহাপুরুষের অলৌকিক প্রভাবেরই ফল বলিয়া সেখানকার জনসাধারণের ধারণা জন্মিল। ক্রমে লোকমুখে প্রচারিত হইতে লাগিল যে, এক অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ কয়েকজন সহচর সঙ্গে ময়দানে বাস করিতেছেন এবং তাঁহার শক্তিতে অসম্ভব ও সম্ভব হয়। অনেক লোক দর্শনার্থী হইয়া আসিতে লাগিল। উদয়পুরের রাজার নিকট সে সংবাদ পৌছিল। ভক্তি প্রযুক্তই হউক, কি কৌতূহল বশতঃই হউক, কিংবা কোন স্বার্থের প্ররোচনাতেই হউক, তিনি মহাপুরুষের দর্শনপ্রার্থী হইলেন। তাঁহাকে রাজবাটীতে আনয়ন করিবার অনেক চেষ্টা হইল, কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তিনি স্বীয় আসন হইতে নড়িলেন না। তাঁহার স্বাভাবিক সমাহিতভাবে তিনি বসিয়া রহিলেন। তাঁহার তেজোমণ্ডিত আকৃতি ও অলৌকিক অদৃষ্টপূর্ব্ব নিত্যযুক্ত ব্রহ্মসমাহিত ভাব দর্শন করিয়া তাঁহার প্রতি সকলের শ্রদ্ধাভক্তি অবশ্য বহু পরিমাণেই বর্দ্ধিত হইল। রাজা এসব বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া নিজেই সাধু সেবার উপযোগী প্রচুর উপঢৌকন সহ মহাপুরুষের দর্শন লাভের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসীর পক্ষে রাজদর্শন বিহিত নয়, এইহেতু সন্ন্যাসের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার মানসে যোগিরাজ গম্ভীরনাথ, রাজা আসিতেছেন জানিয়াই সেখান হইতে আসন উঠাইয়া প্রস্থান করেন। তিনি যখন কাশ্মীরে গমন

করিতেছিলেন, তখন কাশ্মীরের রাজাকেও একবার এইরূপে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন বলিয়া শোনা গিয়াছে।

যোগিরাজ গম্ভীরনাথ একবার মাত্র স্বেচ্ছায় এক গৃহস্থের বাড়ী গমন করিয়াছিলেন এবং কিছু শক্তিও প্রকাশ করিয়াছিলেন। গয়াতে তাঁহার প্রথম নিষ্কাম সেবক আক্কুর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আক্কু ও তাহার সমস্ত পরিবার শুধু সাধু-সেবার দ্বারা জীবন ধন্য করিবার মানসে প্রাণের টানে বাবাজীর সেবা করিয়া আসিতেছিল। তাহাদের অর্থাদি সম্বল কিছুই ছিল না। আক্কু ও তাহাব ভাই মুন্নির কায়িক পরিশ্রমের উপর সমস্ত পরিবারের ভরণ-পোষণ নির্ভর করিত। এই আক্কু একবার মৃতপ্রায় হয়। জীবনের লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইলে তাহাকে শ্মশানে লইয়া যাওয়ারই আয়োজন হইল। কিন্তু যাঁহার সেবায় সে সমস্ত জীবন ঢালিয়া দিয়াছে, শ্মশান যাত্রার পূর্ব্বে তাঁহাকে একবার সংবাদ না দিয়া কিরূপে তাহাকে সংসার হইতে বিদায় দেওয়া যাইতে পারে। মুন্নি শোকে আচ্ছন্ন হইয়া দৌড়িয়া বাবার নিকট গমন পূর্ব্বক আক্কুর মৃত্যু সংবাদ নিবেদন করিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, এবং কাতরপ্রাণে তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিল। সেবক-পরিবারের এই নিদারুণ দুরবস্থার সময় নির্ব্বিকার মহাপুরুষ নিশ্চল রহিলেন না। শ্মশান যাত্রা নিষেধ করিয়া মুন্নিকে পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং কিছুক্ষণ পরে আক্কুর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আক্কুর মৃতদেহের সমীপবর্ত্তী

হইয়া তিনি তাহা স্পর্শ করিলেন এবং তাহার মুখে একটু জল প্রদান করিলেন ;—আক্কুর চেতনা সঞ্চার হইল। তৎপরে আক্কুর জন্য খিচুড়ী পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া তিনি নিজ আসনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন ; অল্পক্ষণের মধ্যেই আক্কু সুস্থ হইল। ভক্ত সেবকের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও করুণায় আপ্লুত হইয়া তিনি তাঁহার ব্যবহারিক জীবনের দুইটি বিশেষ নিয়ম উল্লঙ্ঘন কবিলেন। তিনি যেন নিজেকে আক্কু পরিবারের নিকট অপরিশোধ্য ঋণজালে আবদ্ধ মনে করিতেন। তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে সর্ব্বদাই এই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন পাওয়া যাইত। বাবাজীর প্রকটাবস্থাতেই আক্কুর মৃত্যু হয়। গোরক্ষপুর মন্দিরের ভার গ্রহণ করার পর তিনি সারাজীবন আক্কুর পুত্র নান্নুকে বার্ষিক ১০৲ টাকা করিয়া দিতেন, বস্ত্র কম্বলাদি দিতেন, গোরক্ষপুর যাতায়াতের খরচ দিতেন এবং অন্যান্য বহু প্রকারে সাহার্য্য করিতেন। অতিথিসেবা, আশ্রমের নিয়ম পালন, উপকারীর প্রত্যুপকার প্রভৃতি বিষয়ে তিনি গৃহস্থের আদর্শ ছিলেন। যদিও তাঁহার ব্যবহারিক জীবন ঘটনাবহুল ছিল না, তথাপি তাহারই মধ্যে স্বীয় ব্যবহারদ্বারা তিনি গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী সকল শ্রেণীর লোকের জন্য আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন।

গয়ার পাহাড়ে লোকজনের সমাগম হইলে মাঝে মাঝে সেখানে চোর ও দুষ্ট লোকের উপদ্রব হইত। সে বিষয়ে দুইটী ঘটনা আমরা শুনিয়াছি। বাবা গোকুলনাথজী বলিয়াছেন যে,

একদিন মধ্যরাত্রে একদল দুর্ব্বৃত্ত আসিয়া আশ্রমের উপর ঢিল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে। গোকুলনাথজী তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং আশ্রম-কুটীরের বহির্ভাগে কম্বল গায়ে দিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার গায়ে একটা ঢিল পড়ায় তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বাবা নৃপৎনাথ তাহা শুনিয়া বাহিরে আসিলেন। যোগিরাজও গণ্ডগোল শুনিয়া আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাহিরে আগমন করিলেন। ব্যাপার দর্শন করিয়া সর্ব্ব-জীব-প্রেমিক নির্ব্বিকার মহাপুরুষ দুর্ব্বৃত্তদিগের সমীপবর্ত্তী হইলেন ও বলিলেন,—"তোমরা ঢিল নিক্ষেপ কর কেন? এখানে যাহা কিছু আছে, ইচ্ছা হইলে তোমরা লইয়া যাইতে পার।" গুরুজীর আদেশে সেবক নৃপৎনাথ আশ্রম-কুটীর খুলিয়া দিলেন। চোরেরা নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া, সামান্য বাসন-পত্র, চাল ডাল, কম্বল প্রভৃতি যা কিছু ছিল, ইচ্ছামত লইয়া যাইতে লাগিল। যাওয়ার মময় তাহারা করুণানিলয় মহাপুরুষকে প্রণাম করিয়া আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিল। বাবা গম্ভীরনাথ সকরুণ স্বরে বলিলেন যে, "তোমরা অভাবগ্রস্ত, আবার ১০।১৫ দিন পরে এখানে আসিও, আজ যাহা মিলিয়াছে তখনও তাহাই মিলিবে, লোকের উপর বৃথা উপদ্রব করিও না।" দুর্ব্বৃত্তগণ এইরূপ সকরুণ ব্যবহার ও উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া লজ্জাবনত মস্তকে জিনিষপত্র সহ প্রস্থান করিল। পরদিন প্রাতে মাধোলাল আসিয়া আবার বাসন-পত্র, চাল ডাল, লোটা কম্বল আনিয়া দিলেন। তখন হইতে ঐ সব লোক

শান্ত ভাব ধারণ করিয়া মাঝে মাঝে আশ্রমে আসিত এবং দয়ার আধার গম্ভীরনাথও তাহাদিগকে অভাবগ্রস্ত দেখিয়া এবং সম্ভবতঃ তাহাদের চরিত্রের উপর সাধুতার প্রভাব বিস্তার করিবার উদ্দেশ্যে, আশ্রম হইতে তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদান করিতেন। মাধোলাল আবার নূতন বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। মাধোলালের এরূপ খরচ হইতেছে দেখিয়া বাবাজী একদিন গয়া পরিত্যাগের প্রস্তাব করিলেন। মহাপুরুষ-সেবক মাধোলাল এ পরীক্ষায় সহজেই উত্তীর্ণ হইলেন। তিনি বলিলেন "বাবাজী, এই সকল গরীব বেচারীরা কত নিবে ?"

একদিন বাবাজীর আশ্রমের নিকট চোর আসিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে আরো কয়েকজন আগন্তুক সাধু ছিলেন। তখন চোরদিগের আশা পূর্ণ করিবার উপযুক্ত কোন দ্রব্য সামগ্রী বাবাজীর নিকটে ছিল না। তিনি তাঁহার একমাত্র কাল কম্বলটী তাহাদিগকে প্রদান করিয়া বলিলেন যে, তোমাদের ব্যবহারের উপযোগী আর কিছুই সম্প্রতি আমাদের নিকট নাই, এই কম্বলটী লইয়া যাও। চোরেরা কি যেন কি ভাবিয়া মহাপুরুষের কম্বলটী গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইল। যাত্রা নিস্ফল মনে করিয়া তাহারা চলিয়া যাইতেই, কোন একজন সাধু বলিয়া উঠিলেন যে, ভাগ্যে আমাদের টাকা কয়েকটা বাঁচিয়া গেল। বাবাজী তাঁহাদের কাছে টাকা আছে জানিয়াই আদেশ করিলেন, "এখনই দৌড়িয়া গিয়া টাকাগুলি চোর-দিগকে দিয়া আইস।" সাধুগণ আদেশ অমান্য করিতে

অসমর্থ হইয়া অগত্যা চোরদিগের নিকটে গিয়া টাকাগুলি সমর্পণ করিলেন। চোরেরা এরূপভাবে টাকা পাইয়া অবাক্ হইয়া প্রস্থান করিল।

বাবা শুদ্ধনাথের মুখে শুনিয়াছি যে গয়ায় শুন্নুলাল ধাড়ী-ওয়ালা নামে এক গয়ালী পাগল ছিল। সে গয়ার সর্ব্বত্র রাস্তায় ঘাটে পাহাড়ে পর্ব্বতে ছুটাছুটী করিয়া নানা প্রকার পাগলামী করিত এবং লোকের উপর অত্যাচার করিত। কপিলধারা প্রভৃতি স্থানে গিয়া অনেক সময় সে সাধুদের উপরও উপদ্রব করিত। তাহার প্রতি বাবাজীর বিশেষ কৃপাদৃষ্টি পতিত হইল। একদিন সে আশ্রমে আসিয়া সাধুদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। বাবাজী তাহাকে ধরিয়া সজোরে দুই গালে দুই চড় মারিলেন। তাহার পাগলামী কেবলমাত্র সেই দিনের জন্যই যে নিবৃত্ত হইল, তাহা নয়, সে সম্পূর্ণই প্রকৃতিস্থ হইয়া গেল ; তাহার উন্মাদ রোগেরই নিবৃত্তি হইল। তৎপর কয়েক বৎসর শুন্নুলাল সুস্থভাবে তাহার গদীর কাজকর্ম্ম করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছে।

শুদ্ধনাথজী এবং আরও অপর কয়েকজন সাধু ও ভদ্র-লোকের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, বাবাজীর কপিলধারায় অবস্থিতি কালে একটি ব্যাঘ্র মাঝে মাঝে তাঁহার নিকটে আসিত এবং কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক চলিয়া যাইত। সাধারণতঃ লোকজনের অনুপস্থিতি সময়েই সে আসিত। একদিন তাঁহার নিকট কয়েকজন ভদ্রলোক বসিয়া-

ছিলেন, এবং কয়েকজন সাধুও উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় ব্যাঘ্রটী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া স্বভাবতঃই সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং ভীত চকিত ও হতবুদ্ধি হইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইলেন। বাবাজী প্রশান্তভাবে হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে পলায়ন করিতে নিষেধ করিলেন, এবং স্বাভাবিক মৃদুগম্ভীর স্বরে বলিলেন যে "ইনি একজন সাধু, ব্যাঘ্রবেশে আসিয়াছেন, কাহারও কোন অনিষ্ট করিবেন না, কোন ভয় নাই, আপনারা স্থিরভাবে বসুন।" লোক সকল চমৎকৃত চিত্তে বসিয়া রহিলেন। ব্যাঘ্রটীও অনতিদূরে উপবেশন করিল, এবং কিয়ৎকাল শান্তভাবে স্থিরনেত্রে বাবাজীকে দর্শন করিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। এতদ্‌ভিন্ন অন্যান্য সময়েও বাবাজীর সঙ্গে মাঝে মাঝে ব্যাঘ্র থাকিতে দেখা যাইত, এবং তিনি ব্যাঘ্র পুষিতেন বলিয়া মনে হইত। গোরক্ষপুরেও মন্দিরেব চিড়িয়াখানায় একটি ব্যাঘ্র ছিল এবং সে বাবাজীর পোষা ছিল বলিয়া বোধ হইত। তাহার আহারাদির রীতিমত ব্যবস্থা ছিল। কোন কোন দিন ব্যাঘ্রটী পিঞ্জর হইতে বাহির হইয়া পড়িত। বাবাজীর নিকট সংবাদ পৌছিলে, তিনি ব্যাঘ্রের সমীপবর্ত্তী হইয়া মৃদুভাবে বলিতেন যে, তুমি বাহির হইয়া আসাতে সাধুগণ ভয়ে ছুটাছুটী করিতেছে, তুমি তোমার স্থানে যাও, কোন গোলমাল বাধাইও না। এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি ব্যাঘ্রের কাণে ধরিয়া পুনরায় পিঞ্জরের মধ্যে পুরিয়া দিতেন, ব্যাঘ্রটীও অবনত মস্তকে তাঁহার

আদেশ প্রতিপালন করিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বাবাজীর মহাসমাধির মুহূর্ত্তেই সেই ব্যাঘ্রটীও দেহত্যাগ করে।

যোগিরাজ গম্ভীরনাথ প্রেম ও অহিংসার উচ্চতম ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া, সব হিংস্র জন্তু তাঁহার নিকটে হিংস্রভাব পরিত্যাগ করিত, এবং তাঁহার প্রেমে সকলেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিত। রেশমসূতা তৈয়ার করিতে অসংখ্য গুটীপোকার জীবন নাশ করা হয় বলিয়া তিনি রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন; অথচ লোকে রেশমী বস্ত্র দান করিত, এই হেতু তাহাদের মনে আঘাত লাগিবে ভয়ে তিনি প্রত্যাখ্যানও করিতেন না, এবং তাহা ব্যবহার না করার কারণও প্রকাশ করিতেন না। তিনি গোরক্ষপুরে একদিন কথা প্রসঙ্গে তাঁহার ঐকান্তিক সেবক ও শিষ্য শ্রীযুত বরদা কান্ত বসুর নিকট এই কারণটী ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার কুটীরের নিকটে সর্প আছে জানিলে তিনি তাহার জন্য দুগ্ধ রাখিয়া দিতেন। কখন কখন তিনি নিজ হাতে ইন্দুর সকলকে রুটী খাওয়াইতেন। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শী মহাপুরুষ ব্যবহারিক জীবনেও সর্ব্বপ্রকার জীবের সেবা করিতেন। কিন্তু ইহা তিনি এমন ভাবে করিতেন যেন অন্য কোন লোকে তাহার মধ্যে কোন অসাধারণত্ব টের না পায়। ইহাই তাঁহার সহজ জীবন ছিল।

একাদশ অধ্যায়

তীর্থ পর্য্যটন

পর্য্যটন সাধকগণের সাধনের অঙ্গ বিশেষ, এবং সেই হেতু বাবা গম্ভীরনাথ সাধনাবস্থায় অনেক স্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। সিদ্ধাবস্থায়ও প্রেমপ্রধান মহাপুরুষগণ বিনা প্রয়োজনে বা লোকহিত প্রয়োজনে নানা স্থানে বিচরণ করিয়া তীর্থের মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত করেন, লোকসকলকে মানব-জীবনের আদর্শ প্রদর্শন করেন, এবং নানাবিধ ভাবে জীবের কল্যাণ সাধন করেন। তাঁহারা "তীর্থী কুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদা ভৃতা"। নিত্যমুক্ত যোগী বাবা গম্ভীরনাথও বহুতীর্থে গমন করিয়া স্বীয় আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে তাহাদের তীর্থত্ব বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তাঁহার চিত্ত নিত্য নিরন্তর ব্রহ্মে সমাহিত থাকিত। তিনি যেখানে গমন করিতেন, সেখানেই তাঁহার ভিতর হইতে আধ্যাত্মিক কিরণ বিকীর্ণ হইয়া সমস্ত আবহাওয়া যেন ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিয়া দিত। তিনি যে যে তীর্থে গমন করিয়াছিলেন, সময় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক তাহাদের ধারাবাহিক বর্ণনা প্রদান করা সম্ভবপর নহে। কথা প্রসঙ্গে বিভিন্ন সাধুর নিকট হইতে যে সকল তীর্থ যাত্রার বিবরণ জানা গিয়াছে, তৎসম্বন্ধে কিছু কিছু উল্লেখ করা যাইতে পারে। সিদ্ধাবস্থায় তিনি যে সব স্থানে গমনাগমন করিতেন,

সে সব স্থানে প্রায়ই তাঁহার সহিত সাধুর জমায়েৎ থাকিত। কখন ৮।১০ জন, কখন ২০।২৫ জন, কখন কখন বা ১০০।১৫০ জন সাধুও তাঁহার সহিত থাকিতেন। তাঁহার আশ্রয়ে তাঁহাদের আহার বাসস্থান প্রভৃতির বিশেষ কোন অসুবিধা হইত না।

তাঁহার নর্ম্মদা পরিক্রমা এবং উদয়পুর ও কাশ্মীর গমনের উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। তিনি স্নানাদির যোগ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, কাশী, গঙ্গাসাগর প্রভৃতি তীর্থে গমন করিতেন। বদ্‌রী কেদার, দ্বারকা, রামেশ্বর ও পুরী, এই চারিধামে তিমি পর্য্যটন করিয়াছিলেন। হিন্দুদের নিকট চারিধাম যেমন প্রসিদ্ধ তীর্থ, তেমনি চারিটি প্রসিদ্ধ সরোবর আছে,—নারায়ণ সবোবর, রাওয়াল সর, মানস সরোবর ও পম্পা সরোবর। নারায়ণ সরোবর কচ্ছদেশে। রাওয়াল সরোবর উত্তরাখণ্ডের পার্ব্বত্য প্রদেশে, জ্বালামুখী তীর্থ হইতে ৬৪ মাইল পূর্ব্বে ; এখানে জলে ভাসমান পর্ব্বতখণ্ডের উপর শিবমন্দির বিদ্যমান আছে। পম্পা সরোবর দাক্ষিণাত্যে। মানস সরোবরের কথা সকলেই অবগত আছেন। বাবা গম্ভীরনাথ এই চারি সরোবরেই গমন করিয়াছিলেন। এসব তীর্থযাত্রায় বাবা নৃপৎনাথ তাঁহার সঙ্গী ছিলেন। জ্বালামুখী পাঞ্জাবের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ। সেখান হইতে পদব্রজে ১২ দিনে তাঁহারা রাওয়াল সরোবরে গিয়াছিলেন। রাওয়াল সরোবর হইতে দুর্গম পার্ব্বত্য পথ দিয়া উত্তর দিকে

বহুদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা মনোমহেশ গমন করিয়াছিলেন। বাবাজী নেপাল রাজ্যের ভিতর দিয়া পশুপতিনাথ, মুক্তিনাথ, দামোদরকুণ্ড, (গণ্ডকী নদীর উৎপত্তি স্থান, এখানেই শালগ্রাম শিলার জন্ম হয়) প্রভৃতি তীর্থ দর্শন পূর্ব্বক উৎকট বরফাবৃত পার্ব্বত্য পথে কৈলাস ও মানস সরোবরে গমন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে কৈলাস ও মানস সরোবরের মধ্যপথে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি যখন মানস সরোবর হইতে কৈলাসের দিকে যান, গোঁসাই তখন কৈলাস হইতে মানস সরোবরের দিকে যাইতেছেন। বাবাজীর শিষ্যদ্বয় শান্তিনাথ ও নিবৃত্তিনাথ যখন ১৯১৬ খৃঃ অঃ তাঁহার অনুমতি লইয়া কৈলাস ও মানস সরোবর দর্শনে গমন করেন, তখন তিনি তাঁহাদিগকে সেদিকে যাইবার দুইটী রাস্তার বিস্তৃত বিবরণ এবং পথে যেসব তীর্থস্থান দর্শন করিয়া যাইতে হইবে, তাহাদের বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন। এসব উৎকট শীতপ্রধান বরফাবৃত স্থানে পর্য্যটন করিবার সময়েও তাঁহার একখানা কম্বল ভিন্ন আর কোন গাত্রাবরণ থাকিত না। তাঁহার শিষ্যদ্বয়কেও তিনি বলিয়াছিলেন,—"এক কম্বল বহুৎ"।

কৈলাসের পথে চন্দ্রনাথ নামে এক তীর্থ আছে। শ্রীমৎ শান্তিনাথজী ও শ্রীমৎ নিবৃত্তিনাথজী যখন সে পথ দিয়া গমন করেন, তখন বাবা সমুদ্রনাথ নামক এক নাথযোগী সে স্থানের মোহান্ত। মোহান্তজী তাহাদিগকে বলিয়াছেন যে, তিনি যখন

সেই মন্দিরে পূজারির কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময় যোগিরাজ গম্ভীরনাথ সেখানে গমন করিয়াছিলেন এবং একমাস সেখানে সমাধিনিরত অবস্থায় অবস্থান করিয়াছিলেন। সমুদ্রনাথজীই তাঁহার ভোজন সামগ্রী প্রস্তুত কবিয়া দিতেন এবং তাঁহার সেবা করিতেন। তিনি কোন্ প্রস্তর খণ্ডের উপর আসনস্থ ছিলেন তাহাও মোহান্ত মহারাজ তাঁহাদিগকে দেখাইলেন।

অমরনাথ আর একটি দুর্গম তীর্থ। প্রায় সমস্ত বৎসরই সে স্থান বরফাবৃত থাকে। রাবলপিণ্ডী হইতে শ্রীনগর হইয়া বিপৎসঙ্কুল পার্ব্বত্য পথে সেখানে যাইতে হয়। তীর্থযাত্রিগণ বৎসরের মধ্যে এক দিন মাত্র সেখানে যাইতে পারেন। সেখানকার মোহান্ত ও গভর্ণমেণ্ট তখন যাত্রীদের জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করেন। বাবা গম্ভীরনাথ সেই তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। অমরনাথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যখন তিনি সারঙ্গকোটে আসেন, তখন বাবা গোকুলনাথ তাঁহার প্রথম দর্শন লাভ করেন। গোকুলনাথজীর বয়স তখন ১২।১৩ বৎসর। তিনি বলিয়াছেন,—"আমার পূর্ব্বপুরুষগণ বংশানুক্রমে সারঙ্গকোটের যোগীদের শিষ্য ছিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে আমার পিতার সঙ্গে সারঙ্গকোটে পীর এলাচীনাথের ভাণ্ডারায় গিয়া শুনিলাম যে, একজন 'রাজা যোগী' অমরনাথ হইতে আসিয়াছেন। আমিও আমার পিতার সঙ্গে রাজা যোগী দেখিতে গেলাম। সেই ভাণ্ডারায় ১২০০ শত সাধু

উপস্থিত ছিলেন। তাহার মধ্যে বাবজীকে দেখিয়া রাজা যোগীর মতই আমার মনে হইল।"

মনিকরণ, যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিবরণও পাওয়া গিয়াছে। তদ্ভিন্ন ছোট বড়, প্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ অনেক তীর্থেই তিনি পর্য্যটন করিয়াছেন। তাহার কোন বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। সর্ব্বত্রই তীর্থযাত্রা সাধু ও গৃহস্থগণ তাঁহার ধ্যানগম্ভীর জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিদর্শনে অমৃতলোকের সন্ধান পাইত।

তিনি কুম্ভ মেলায়ও যোগদান করিতেন। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা ১৩০০ বঙ্গাব্দের (১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের) প্রয়াগের কুম্ভমেলা সম্পর্ক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি বাবাজীর সম্পর্কে লিখিয়াছেন,—"যেরূপ তাকাইয়া একটু মাথা নাড়িয়া ইনি ইঙ্গিতে প্রাণ, ভিজাইয়া দেন, তাহার বর্ণনা হয় না। ইনি অত্যন্ত অল্পভাষী। সাধুরা ইঁহাকে সিদ্ধ পুরুষ বলিয়া জানেন। ইনি বহু শিষ্য (?) সঙ্গে মেলাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। একদিন একজন ধনী ইঁহার আসনের নিকট পাঁচ শত খণ্ড কম্বল রাখিয়া যান। বাবা গম্ভীরনাথ ধ্যানস্থ ছিলেন, কিছু পরে নেত্র উন্মীলিত করিয়া দেখিলেন রাশীকৃত কম্বল। বাঁ হাতের অঙ্গুলী ঈষৎ নাড়িয়া বলিলেন, "যাহাদের দরকার আছে, তাহাদিগকে এ সকল দিয়া দাও"। তখনই সমস্ত বিতরণ হইয়া গেল।"*

---

* প্রয়াগধামে কুম্ভমেলা, ৩য় সংস্করণ—৭১ পৃষ্ঠা।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত 'বাবা গম্ভীরনাথজী' গ্রন্থে মনোরঞ্জন বাবুর সুদীর্ঘ উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইতে কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।—"বাংলা ১৩০০ সনের মাঘ মাসে প্রয়াগক্ষেত্রে পূর্ণ কুম্ভের মহাধিবেশন হইয়াছিল। সেই ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীগুরুদেব আমাদিগের নিকট বিভিন্ন শ্রেণীর কয়েকজন সাধু, যোগী, সন্ন্যাসী ও ভক্তের পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিষয় অবলম্বন করিয়া, আমি "প্রয়াগ ক্ষেত্রে কুম্ভমেলা" নামক পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম। সেই পুস্তকে বাবা গম্ভীরনাথজীর সংক্ষিপ্ত কাহিনী ও প্রতিকৃতি দেওয়া হইয়াছে। বড়ই ইচ্ছা ছিল যে, কিছুদিন বাবার নিকট থাকিয়া, পরে তাঁহার আচার-ব্যবহার ও ও নিত্যকর্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবে লিখিব। শুধু কতকগুলি বড় বড় ঘটনা বা অলৌকিক কার্য্য লিখিয়া মহাপুরুষদের পরিচয় দেওয়া যায় না, উহা অনেকটা ফটোগ্রাফের মতন হয়। জীবন্ত হয় না। ছোট ছোট কার্য্য ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্য দিয়াই তাঁহাদের অসাধারণত্ব ফুটিয়া উঠে। তাঁহাদের হাঁটা, চলা, শোওয়া, আহার বিহার, আলাপ ব্যবহার—সকলই সাধারণ লোকের কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র। অকৃত্রিমতা, অমায়িকতা, সত্য, সরলতা ও নির্ভীকতা এবং প্রেম ও পবিত্রতা তাঁহাদের সকল কার্য্য, সকল অনুষ্ঠানে জড়াইয়া আছে। সঙ্গলাভ না করিলে এ সকল প্রত্যক্ষ হয় না। আমার ভাগ্যে তাঁহার সঙ্গলাভ আর ঘটিয়া উঠিল না।

"সেই ১৩০০ সনের কুম্ভমেলায় যখন গুরুদেবের সঙ্গে সাধু-দর্শনে বাহির হইয়া বাবা গম্ভীরনাথজীর নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন সাধুরা চা-পান করিতেছিলেন। বাবা নিজ হাতে ধরিয়া আমাকে এক বাটি চা দিলেন, আমি তাঁহার হাত হইতে গ্রহণ করিলাম,- এখনও সেই কাঁসার বাটিটা এবং চায়ের সুগন্ধ ও সুস্বাদ আমার নয়ন, ঘ্রাণ ও রসনায় যেন লাগিয়া আছে। সেই জিনিস গুলিতে যেন সাধুতা মাখানো ছিল। সেই পবিত্র হস্তের কি স্নেহের দান! যখন বাটি ধরিয়া আমি আন্‌মনে অপেক্ষা করিতেছিলাম, তখন ঈষৎ নয়ন ভঙ্গিমা করিয়া, একটু মাথা নাড়িয়া আমাকে চা-পান করিতে ইঙ্গিত করিলেন,—সেটী যে কত মধুর, তাহা বুঝাইতে পারিব না। নিঃসঙ্গ সন্ন্যাসী, কোনও বস্তু বা ব্যক্তির জন্যই আসক্তি নাই; অথচ প্রেমে পরিপূর্ণ। অনাসক্ত, জীবন্মুক্ত, আত্মারাম, অথচ বিশ্ব-প্রেমিক মহাপুরুষদিগের সঙ্গলাভ যাঁহারা করেন নাই, তাঁহারা ভারতমাতার অমূল্য রত্ন কিছুই দেখিতে পান নাই। প্রথম যখন গুরুদেবের কৃপায় ইহাঁদের দর্শন পাইলাম, তখন মনে হইল, যেন ভারতভূমির একটি অপূর্ব্ব ও অমূল্য রত্ন ভাণ্ডার আমার নিকট প্রকাশিত হইল।

"প্রেমাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন,—'যাঁহার সঙ্গ হইলে আপনি মুখে কৃষ্ণনাম আইসে, তাঁহাকেই প্রকৃত বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে'। আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, যাঁহারা সদ্‌গুরুর শিষ্য, কোনও সাধুসঙ্গ হইলেই তাঁহাদের দীক্ষা-মন্ত্র যেন গাড়ীর

চাকার মতন আপনি চলিতে থাকিবে,—বাধা দিয়া নিবারিত করার শক্তি আসিবে না। বাবা গম্ভীরনাথের সংসর্গে অনেকেই এই তত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন।

"শ্রীকবির সাহেব বলিয়াছেন,—

'অলখ্‌ পুরুখকো আরসী সাধু হি কা দেহ।
লখ্‌ যো চাহে অলখ্‌ কো উনহিমে লখ্‌ নেহ॥'

তিনি অলক্ষ্য পুরুষ (ব্রহ্ম), সাধুদিগের দেহই তাঁহাকে দেখিবার দর্পণ স্বরূপ। যিনি সেই অলক্ষ্যকে লক্ষ্য করিতে চাহেন, সাধুর মধ্যেই তাঁহাকে দেখিতে হইবে।

যীশু খৃষ্ট বলিয়াছেন,—'যে ব্যক্তি পুত্রকে দেখিয়াছে, সেই পিতাকে দেখিল'।

উপনিষৎ বলিয়াছেন,—'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি'।

অতএব প্রকৃত সাধুদিগের দর্শনে, ধ্যানে, পূজায় ও পরিচর্য্যায় ঈশ্বরেরই পূজা হয়। বাবা গম্ভীরনাথ এই শ্রেণীর পূজ্যপাদ মহাত্মা ছিলেন।"*

প্রয়াগ কুম্ভে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া সাধুদের নিকট শোনা গিয়াছে। কুম্ভমেলায় বিভিন্ন শ্রেণীর সাধুসঙ্ঘের মধ্যে কখন কখন দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া থাকে। প্রয়াগ কুম্ভে একবার বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত নাগা সাধুগণ কোন কারণে উত্তেজিত হইয়া যোগিসম্প্রদায়ভুক্ত সাধুদিগের উপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার ও মারপিট করিয়াছিল। তাহাতে অনেক যোগীর

* মহাত্মা বাবা গম্ভীরনাথজী—২৭-৩১ পৃষ্ঠা।

মাথা ফাটিয়া যায়। যোগিসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ বাবা গম্ভীরনাথ ঘটনাস্থলের অদূরে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার চক্ষু অন্তর্নিবদ্ধ, দেহ নিস্পন্দ, বদনমণ্ডল নির্ব্বিকার ও সুপ্রসন্ন। বাহিরে কি হইতেছে সে দিকে তাঁহার কোনই খেয়াল নাই। তাঁহার সঙ্গীয় সাধুগণ কতবার আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,—"মহারাজ, দেখ্‌ছেন না কি হচ্ছে?" কিন্তু মহারাজ যে সে রাজ্যেই নাই, তাঁহার দেহটী মাত্র সেখানে উপস্থিত। বৈষ্ণব নাগাগণ মারপিট করিতে করিতে বাবাজীর অতি নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল; যোগীরা সংখ্যায় অত্যন্ত কম ছিল বলিয়া তাহাদিগকে বাধা প্রদানে অক্ষম ছিল। তখন একজন যোগী বাবাজীর আসনের সন্নিকটে আসিয়া ভয়ানক চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল "মহারাজ, দেখুন, দেখুন, সর্ব্বনাশ।" তখন বাবাজীর সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি ব্যাপার দেখিয়া অপেক্ষাকৃত একটু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "বাস্, শান্তি কর, শান্তি কর।" এই কথা বলা মাত্রই অকস্মাৎ অত্যাচারকারিগণের যেন ক্রোধের উপশম হইল, তাহারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত হইয়া প্রস্থান করিল।

এই উপলক্ষে যোগিসম্প্রদায়ের আর একজন মহাপুরুষের কথা মনে পড়িতেছে। তাঁহার নাম বাবা সুন্দরনাথ। তিনি সাধারণতঃ বদরিকাশ্রমে বা গঙ্গোত্রীতে থাকিতেন, কখন কখন বা আবু পাহাড়ে আসিতেন, এবং কুম্ভমেলা প্রভৃতি

উপলক্ষে মাঝে মাঝে লোকালয়েও দর্শন দিতেন। তিনি বৈরাগ্য প্রধান জীবন্মুক্ত পুরুষ ছিলেন। সদা সর্ব্বদা সমাধিমগ্ন থাকিতেন। জগতের সহিত কোনরূপ লৌকিক সম্পর্ক রাখিতেন না। তাঁহার মত সর্ব্ব-কর্ম্ম-পরিত্যাগী, নিত্যনিরন্তর সমাধিমগ্ন মহাপুরুষ ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। যোগিগণ বলেন যে, তিনি সদা সর্ব্বদা ষষ্ঠ ভূমিতে বিহার করিতেন। একবার কুম্ভ মেলার ঝগড়ায় নাগাগণ উন্মত্ত হইয়া অত্যাচার করিতে করিতে তাঁহারও মাথায় আঘাত করিয়া রক্তপাত করিয়াছিল। তিনি স্বীয় আসনে সমাধিমগ্ন, হাঙ্গামার বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানেন না; মাথা কাটিয়া অবিরল ধারে রক্তপাত হইতেছে, তাহাতেও তাঁহার হুঁস নাই—তাহাতেও তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হয় নাই। অন্য সাধুগণ আসিয়া ক্ষতস্থান বাঁধিয়া রক্ত নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিল। তিনি সমভাবে নির্ব্বিকার চিত্তে সমাহিত অবস্থাতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। শোনা যায় যে তাঁহাকে একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে দেখা যাইত। বাবা গম্ভীরনাথের সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি বাবাজীর সঙ্গ এবং গোরক্ষনাথের 'স্থান' দর্শন করিতে দুই বার গোরক্ষপুরে আসিয়াছিলেন। পশ্চিমোত্তর ভারতে আত্মারাম যোগিবর সুন্দরনাথের অনেক ভক্ত আছেন, কিন্তু কাহাকেও তিনি শিষ্য করেন নাই।

১৩০৩ সনে (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে) শ্রাবণ মাসে তিনি গোদাবরী কুম্ভ মেলায় গমন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে

পঞ্চবটী (নাসিক) গমন করেন। পঞ্চবটী হইতে জব্বলপুর হইয়া তিনি কাশীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কাশীতে তিনি গোরক্ষপুরের মোহান্ত দীলবরনাথজীর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হন এবং সাধুদিগের অনুরোধে গোরক্ষপুর আসিয়া কিছুদিন থাকিতে বাধ্য হন।

১৩০৭ বঙ্গাব্দে (১৯০০ খৃঃ) কলিকাতার নিকটবর্ত্তী দমদমার গোরখ্‌বংশীর সাধুগণ বাবাজীকে সেখানে লইয়া যান। সেখান হইতে তিনি গঙ্গাসাগর গমন করেন। আবার দমদমায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সেখান হইতে তিনি পুরী যাত্রা করেন। এসব যাত্রাতে তাঁহার সহিত বহু সাধু ছিলেন। তিনি জগন্নাথ ক্ষেত্রে পৌছিয়া এক পাণ্ডার গৃহে অবস্থান করেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পুত্র ও শিষ্য মহাত্মা যোগজীবন গোস্বামী, যোগিরাজ গম্ভীরনাথের আগমন সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন এবং তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গীয় সাধুদিগকে নিজেদের নরেন্দ্র সরোবরতীরস্থ আশ্রমে লইয়া যান। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ কায়মনোবাক্যে তাঁহার ও সাধুদের সেবা করিয়াছিলেন। তিনি ৬ দিন সেখানে (জটীয়া বাবার সমাধি মঠে) অবস্থান করিয়াছিলেন।

উক্ত মঠের ঐকান্তিক সেবক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—"আমার পরম সৌভাগ্য যে একবার ৺পুরীধামে গুরুদেব ভগবান্ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীদেবের নরেন্দ্র-সরোবরতীরস্থ সমাধি মঠে তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলাম। তখন

যে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছি, ইহা তাঁহারই কৃপায় চিরদিনের তরে হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।

"আশ্রমের সেবাকার্য্য সম্পন্ন করিরা মাঝে মাঝে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে তাঁহার নিকট যাইয়া বসিতাম। তাঁহার নিকট বসিলেই অনুভব হইত, আমার গুরুপ্রদত্ত 'নাম' আপনা আপনি স্রোতবেগে চলিতেছে। কিছুক্ষণ পরে বাবা বলিতেন 'যাও, এখন সেবার কার্য্যে যাও'। আমি তখন যাইয়া শ্রীমৎ গুরু-দেবের আরতি করিতাম, বাবা দাঁড়াইয়া উহা দর্শন করিতেন। দাদা স্বর্গীয় যোগজীবন গোস্বামী তাঁহাকে ৺পুরীতে আসিয়া পাণ্ডার বাড়ীতে আছেন দেখিয়া, অতি যতনে মঠে লইয়া আসেন এবং অর্থাভাব থাকিলেও ঋণ করিয়া খুব ভক্তির সহিত তাঁহার সেবা করেন। আমরা তাঁহার সহিত এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিতাম ও তাঁহার প্রদত্ত আহারীর গ্রহণ করিতাম। বাবাকে এ স্থানে দেখিয়াছি, তাঁহার ধর্ম্মের কোন বাহ্যাড়ম্বর নাই, পরিধানে মাত্র একখানা সাদা ধুতি ও একখানা সাদা চাদর রহিয়াছে। কাহারও সহিত বেশী কথা বলেন না, নিরন্তর সাধনে রহিয়াছেন। মাঝে মাঝে সঙ্গীয় লোকদের সহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব দর্শনে যাইতেন। সন্ধ্যার অল্প পরে ধুনীর পাশে বসিয়া সঙ্গীয় সাধুদের সায়ংকালীন ভজনে যোগ দিতেন এবং কখন কখন সেতার যোগে নিজেই ভজন গান করিতেন। তিনি ছয় দিবস দয়া করিয়া এই মঠে ছিলেন।"

বাবাজী পুরী হইতে যাত্রা করিয়া সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি দর্শন পূর্ব্বক গয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এইরূপে সর্ব্ব-বন্ধন-পরিশূন্য আত্মানন্দ-পরিপূর্ণ যোগীশ্বর মহাপুরুষ মুক্ত বিহগরাজের মত নানা তীর্থে বিচরণ করিতে লাগিলেন। গয়াতেই তাঁহার স্থায়ী আসন ছিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া গয়াতেই আসিয়া বিশ্রাম করিতেন।

তাঁহার কপিলধারায় অবস্থানের শেষভাগে পরমহংস রতনগিরি নামক আর একজন মহাপুরুষ সেখানে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তিনিও একজন প্রভাবশালী সাধু ছিলেন। শুনিয়াছি যে তিনি স্বনামখ্যাত মহাপুরুষ ভাস্করানন্দ-স্বামীর গুরুভাই। তিনি পূর্ব্বে পাতিয়ালায় থাকিতেন। কপিলধারায়ও তিনি অনেকের শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করেন। বাবাজী যখন অধিকাংশ সময় গয়া হইতে অনুপস্থিত থাকিতে লাগিলেন, তখন পরমহংসজী তাঁহার ধনী ভক্তদের সাহায্যে কপিলধারায় অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করাইয়া আশ্রমের অনেক বাহ্যিক উন্নতি সম্পাদন করিলেন। আশ্রমের চেহারা পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এখন আর এ আশ্রম সর্ব্বত্যাগী নিষ্কিঞ্চন সাধকের নিবিড় সাধনের তেমন উপযুক্ত স্থান রহিল না। গুহা বেদী প্রভৃতি রক্ষিত হইল বটে, কিন্তু বাহ্যাড়ম্বরে তাহাদিগকে ঢাকিয়া ফেলিল। আশ্রমের বাহ্যাকৃতিতে রাজসিক ভাবের প্রাধান্য হইল।

কপিলধারার আশ্রমের যখন এইরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হইল,

তখন বাবাজী গয়ায় আসিয়া করিলধারায় বাস করা পছন্দ করিতেন না। তাঁহার ঐকান্তিক ভক্ত সেবক মাধোলাল বামনী-ঘাটের উপরে একটী নির্জ্জন স্থানে তাঁহার একান্ত বাসের উপযোগী একটি বাগানবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বাবাজী তদবধি যখন গয়ায় আসিতেন তখন সাধারণতঃ ঐ বাগান বাড়ীতেই আসন গ্রহণ করিতেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

গোরক্ষপুরে মঠাধ্যক্ষ

ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশে এবং ভারতবহির্ভূত বহু স্থানে গোরক্ষনাথ প্রবর্ত্তিত নাথযোগী সম্প্রদায়ের অসংখ্য মঠ এখনও বিদ্যমান আছে, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রত্যেক মঠেরই অধ্যক্ষরূপে একজন করিয়া মোহান্ত থাকেন; তিনি সেখানে গোরক্ষনাথের বিশেষ প্রতিনিধি, এবং তদুপযুক্ত সম্মান পাইয়া থাকেন। সাধারণতঃ সাধুগণ মোহান্ত-পদ-প্রাপ্তি বিশেষ ভাগ্যের কথা মনে করেন। প্রত্যেক মঠেরই অল্পবিস্তর নিজস্ব সম্পত্তি আছে। এই সব সম্পত্তি দেবোত্তর—দেবসেবা, সাধুসেবা ও দীন-দুঃখীর সেবার জন্য উৎসর্গীকৃত। কোন ব্যক্তিবিশেষ এ সব দেবোত্তর সম্পত্তির মালিক নয়, কেহ পুরুষানুক্রমে ইহা ভোগ দখল করিবার অধিকারী নয়, কাহারও ব্যক্তিগত ভোগ বিলাসের জন্য এসব সম্পত্তি হইতে একটি পয়সা ব্যয় হইলেও তাহা অপব্যয় বলিয়া গণ্য, এবং যে ব্যক্তি এরূপ ব্যয় করে, সে দেবতার নিকট, সম্প্রদায়ের নিকট, দরিদ্র-নায়ায়ণের নিকট ও সমগ্র সমাজের নিকট অপরাধী। দেবোত্তর সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে যিনি নিযুক্ত থাকেন, তিনি সেবক—সম্পত্তির মালিক নহেন। ঐ সম্পত্তির আয় দ্বারা

দেবসেবা, সাধুসেবা ও দরিদ্র-নারায়ণ সেবার সুচারু বন্দোবস্ত করিতে তিনি অধিকারী ও তজ্জন্য তিনি দায়ী। অপরিহার্য্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কারণে নিজের জন্য ইহা হইতে এক কড়ি ব্যয় করিতেও তিনি ধর্ম্মতঃ ও ন্যায়তঃ অধিকারী নহেন। এই সব সম্পত্তির মালিক দেবতা।

প্রত্যেক মঠের মোহান্ত সেই মঠের সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক। তিনি অর্থ-সংগ্রহের ব্যবস্থা করিবেন; সাধুগণ সেই মঠে অবস্থিতি কালে আহারাচ্ছাদনাদি বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া যাহাতে নিরুপদ্রবে সাধন ভজনে নিযুক্ত থাকিতে পারেন, তদ্বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিবেন; যে কোন ক্ষুধাতৃষ্ণা-পীড়িত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে তাহাকে ভোজন ও আশ্রয় দান করিবেন, কোন দরিদ্র বা নিরাশ্রয় ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে ঔষধ পথ্য শুশ্রূষা প্রভৃতি দ্বারা তাহার যথোচিত সেবা ও স্বাচ্ছন্দ্যবিধান করিবেন; আশ্রমস্থ ব্যক্তিমাত্রই যাহাতে আশ্রমের নিয়ম-পদ্ধতি যথাযথরূপে মানিয়া চলেন এবং যাহাতে কাহারও দ্বারা আশ্রমে যে সময়ে যে উপলক্ষে যে ভাবে যে কাজ সম্পন্ন হওয়া উচিত, তাহা যাহাতে যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয় তাহার উপযুক্তরূপ বন্দোবস্ত করিবেন। দেশের ও দশের কল্যাণার্থে নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে কোন সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে তাহাতে যথাশক্তি অর্থ দান করিবেন, দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতির সময় অন্ন-বস্ত্র, ঔষধ-পথ্য, টাকা-কড়ি ও লোকজন দ্বারা দুঃস্থদের অভাব মোচনে যথাসাধ্য প্রযত্ন করিবেন। এ

সকলই দেবসেবার অঙ্গীভূত। দেবতার সেবা-বুদ্ধিতেই তিনি এই সব কার্য্য করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—

"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চা বিড়ম্বনম্॥ ৩।২৯।২১
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥৩।২৯।২২
অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥ ৩।২৯।২৪
অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্ দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥" ৩।২৯।২৭

আমি অন্তরাত্মা রূপে সর্ব্বভূতে সর্ব্বদা অবস্থিত। সেই (সর্ব্বভূতে অবস্থিত) আমাকে অবজ্ঞা করিয়া যে মনুষ্য কেবলমাত্র মন্দিরাদিতে আমার পূজা করে, তাহার পূজা বিড়ম্বনা মাত্র (পূজার অনুকরণ মাত্র, যথার্থ পূজা নহে)। যে ব্যক্তি মূঢ়তা বশতঃ সকল প্রাণীর মধ্যে আত্মস্বরূপে বিরাজমান ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া (প্রাণিবর্গকে উপেক্ষা করিয়া) বিগ্রহাদির অর্চ্চনা করে, সে প্রজ্বলিত হুতাশনকে পরিত্যাগ করিয়া ভস্মেই ঘৃতাহুতি প্রদান করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রাণিবর্গকে অবমাননা করে, সে নানারূপ উপচারে আমাকে অর্চ্চনা করিলেও আমি সন্তোষলাভ করি না। অতএব সর্ব্বভূতে মৈত্রীসম্পন্ন হইয়া ও সর্ব্বত্র ভেদ-বুদ্ধি, বর্জ্জন করিয়া, দান

ও মান দ্বারা সর্ব্বভূতের দেহে নিবাসশীল ভূতাত্মা স্বরূপ আমাকে অর্চ্চনা করিবে।

স্বয়ং ভগবান্ ভগবদর্চ্চনার যে আদর্শ এইরূপ বহু উপদেশ উপাসকদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, সেই আদর্শ অনুসারে দেবার্চ্চনা করিবার বিশেষ অধিকার ও দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াই, দেবসেবক মোহান্তগণ দেবমন্দির ও দেবোত্তর সম্পত্তির কর্ত্তৃত্ব ভার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্যই মোহান্তপদের সৃষ্টি।

যাঁহার মোহ অন্ত হইয়াছে, তিনিই মোহান্ত নামের ও মোহান্ত পদের উপযুক্ত। যাঁহার মোহ আছে, দেহে আত্মবুদ্ধি আছে, দেহসম্পর্কিত বস্তুবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আসক্তি আছে, দেহেন্দ্রিয় তৃপ্তির লোভ আছে, যশ মানের আকাঙ্ক্ষা আছে, কাম ক্রোধ লোভের অধীনতা আছে, স্বার্থবুদ্ধি, অর্থলিপ্সা ও কার্পণ্য আছে, তিনি মোহান্ত পদের অনুপযুক্ত। যাঁহার দেবতার প্রতি ভক্তি নাই, মানুষের প্রতি প্রেম নাই, সাধুদের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, আর্ত্ত ও দীন দুঃখীর বেদনা যিনি নিজে অনুভব করেন না, তিনি মোহান্ত পদের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে অসমর্থ। ত্যাগী, ভক্ত, প্রেমিক, তিতিক্ষু, বিচারশীল, লোক-হিত-ব্রত ও কার্য্যদক্ষ সাধুই মোহান্ত পদে অধিষ্ঠিত হইবার উপযুক্ত পাত্র, এবং এইরূপ আদর্শ-সাধু জ্ঞান করিয়াই গৃহী ও সাধু সকলে তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি ও পূজা করিয়া থাকেন।

নাথ সম্প্রদায়ের যত মঠ আছে, তাহাদের সকলের কর্ম্মক্ষেত্র সমান নয়, মর্য্যাদা সমান নয়, বিত্তসম্পৎ সমান নয়; সুতরাং সকল মঠের মোহান্তের পদমর্য্যাদাও সমান নয়। গোরক্ষপুরের মঠ, গোরক্ষনাথের তপোভূমিতে তাঁহারই আসনের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহার বিশেষ মর্য্যাদা আছে, ইহার কর্ম্মক্ষেত্রও প্রশস্ত, বিত্ত-সম্পত্তিও যথেষ্ট। গোরক্ষপুর মঠের মোহান্তও পদমর্য্যাদায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ-মোহান্ত বলিয়া পরিজ্ঞাত।

বাবা গম্ভীরনাথ যখন নাথসম্প্রদায়ে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার গুরু বাবা গোপালনাথ গোরক্ষনাথ মন্দিরের মোহান্তের আসনে অধিরূঢ় ছিলেন, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

বাবা গোপালনাথের দেহান্তের পর তাঁহার শিষ্য এবং বাবা গম্ভীরনাথের জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা বাবা বলভদ্রনাথজী মোহান্ত হন, এবং তিনি ১৮৮০ হইতে ১৮৮৯ পর্য্যন্ত নয় বৎসর সেই দায়িত্ব বহন করিয়াছিলেন। তৎপর তাঁহার শিষ্য বাবা দিলবরনাথ তাঁহার স্থান অধিকার করেন। তিনি ১৮৮৯ হইতে ১৮৯৬ পর্য্যন্ত ৭ বৎসর মন্দিরের সেবা করেন এবং এই সময়ের মধ্যেই প্রস্তর-হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ প্রভৃতি দ্বারা মন্দিরের অনেক উন্নতি সাধন করেন। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই আগষ্ট তাঁহার দেহান্ত হয়।

এই সময় যোগিরাজ গম্ভীরনাথ সম্প্রদায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাসিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া সাধু সমাজে প্রখ্যাত। কুম্ভমেলায় সকল শ্রেণীর সাধুগণ তাঁহার, অনন্যসাধারণ তেজ, গাম্ভীর্য্য,

প্রেম ও নিত্য-সমাহিত ভাব দর্শন করিয়া মুগ্ধ। অনেক স্বনাম-খ্যাত মহাপুরুষ তাঁহাকে অসীম-শক্তিশালী-মহাপুরুষ বলিয়া নিজ-জনের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। এমন একজন সার্থক-নামা মোহান্ত নাথসম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান-ক্ষেত্র গোরক্ষপুরে গোরক্ষনাথ মন্দিরের সেবার ভার গ্রহণ করিলে, ক্ষেত্রের গৌরব, মন্দিরের গৌরব, সম্প্রদায়ের গৌরব।

সাম্প্রদায়িক সাধুগণ বাবাজীকে মোহান্ত-পদ গ্রহণের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন এবং নানা যুক্তির অবতারণা করিয়া ইহার সমীচীনতা প্রতিপাদন করিলেন। কিন্তু বাবা গম্ভীরনাথ গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"নেহি"। অগত্যা বাবা বলভদ্র-নাথের অন্যতম শিষ্য এবং বাবা দিলবরনাথের গুরুভাই বাবা সুন্দরনাথ মোহান্তপদে অভিষিক্ত হইলেন। তিনি মন্দির সেবার গুরুভার বহন করিতে সমর্থ হইবেন কিনা এবং মোহান্তপদের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবেন কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। যাহা হউক, যোগিরাজ তাঁহাকে মোহান্ত পদে বসাইয়া যথোচিত উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক কিছু দিন পরে স্বকীয় তপোভূমি গয়াধামে ফিরিয়া গেলেন। কোন কোন সাধু বলিয়াছেন যে, গোরক্ষনাথের মোহান্তের আসন শূন্য রাখা রীতি-বিরুদ্ধ বলিয়া, বাবা দিলবরনাথের মহাসমাধির অব্যবহিত পরেই তৎকালে উপস্থিত সাধুগণ ও ভদ্রলোকগণ যোগ্যতর কোন ব্যক্তিকে সম্মুখে না পাইয়া বাবা সুন্দরনাথকেই মোহান্তের

গদীতে বসাইয়াছিলেন। বাবা গম্ভীরনাথ মন্দিরে আগমন করা মাত্র বাবা সুন্দরনাথ স্বয়ংই আসন হইতে উঠিয়া আসিয়া স্বীয় শিরোপা (উষ্ণীষ) বাবাজীর পায়ের নিকট রাখিয়া বলিলেন,—"এই মোহান্তপদ আপনারই প্রাপ্য, আপনিই অনুগ্রহ করিয়া ইহা গ্রহণ করুন।" অন্যান্য সাধুগণ ও ভদ্র-মণ্ডলী মোহান্তজীর প্রস্তাব সমর্থন করিয়া বাবাজীকে অনেক পীড়াপীড়ি করিলেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই স্বীকার করিলেন না।

যিনি মোহান্তপদ লাভ করিলেন, অল্প দিনের মধ্যেই তিনি তাঁহার আচার-ব্যবহারে ও কার্য্য-কলাপে আপনার অনুপযুক্ততা প্রমাণ করিলেন।

গোরক্ষনাথের তপঃক্ষেত্রের,—নাথ-সম্প্রদায়ের কেন্দ্র-ভূমির,—সাধুসজ্জনের আশ্রয়স্থানের,—দেবতার মন্দিরের, নানা প্রকার অমর্য্যাদা হইতে আরম্ভ হইল।

বাবা গম্ভীরনাথকে এসব ব্যাপার জানান হইল, সাধুগণ তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন, গোরক্ষপুরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে চিঠিপত্র লিখিতে লাগিলেন। যে নিবিড় আনন্দের রাজ্যে তিনি সদা সর্ব্বদা বিহার করিতেন, সেখানে এসব সংবাদ পৌছায় না। ব্যবহারিক জগতে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আনাই কঠিন। অবশেষে তাঁহাকে বিশেষভাবে ধরিয়া পড়া হইল। তিনি আসিয়া ব্যবস্থা না করিলে গোরক্ষনাথের মন্দির—তাঁহার গুরুর আশ্রম একেবারে নষ্ট

হইয়া যায়, ইহা নানাভাবে তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইল। তিনি তখন পুরী প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া গয়ায় আসিয়াছেন। তিনি আসিতে স্বীকৃত হইলেন। যদিও তাঁহার দৃষ্টিতে মোহান্তপদের প্রতিষ্ঠা ও নিবিড় অরণ্যে অজ্ঞাতবাস উভয়ই সমান, যদিও রাজপ্রাসাদে ও পার্ব্বত্য গুহায় তাঁহার নিকট কোন পার্থক্য নাই, যদিও তিনি কোন অবস্থাকে হেয়, এবং কোন অবস্থাকে উপাদেয় মনে করেন না, তথাপি নির্জ্জনে নিষ্কিঞ্চন ভাবে লোকালয়ের বাহিরে নিত্য-অবিচ্ছেদে ধ্যানানন্দ উপভোগ করাই যাঁহার স্বভাব, তাঁহার পক্ষে লোক-কোলাহল ও লৌকিক ব্যবহারের মধ্যে আসিয়া অবস্থান করা স্বভাবের প্রতিকূল, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সেই হেতুই তিনি প্রথমতঃ লোকালয়ে আসিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি প্রেম-প্রধান, সর্ব্বভূত-হিতে রত। যেখানে লোক-সমাজের কল্যাণের জন্য তাঁহার আহ্বান আসে, সেখানে তাহার অবিরাম সমাধি সম্ভোগের আসক্তিও ছাড়িতে হয়। এই ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া ভগবানের বিধান তাঁহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে টানিয়া আনিতেছিল। তিনি এ পর্য্যন্ত গুরুর আসন—আচার্য্যের আসন গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার শিষ্য হইবার জন্য আগ্রহ বহু ধর্ম্মার্থীরই ছিল। একবার তাঁহাকে দীক্ষা-দানের জন্য পীড়াপীড়ি করাতে তিনি বলিয়াছিলেন,—"ক্যা পল্টন করেঙ্গে?" কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি, তাঁহার প্রারব্ধ,

ভগবানের বিধান, তাঁহাকে দিয়া যেন একটি আধ্যাত্মিক পল্টন সৃষ্টি করিবারই সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল। তিনি লোকালয় হইতে দূরে, পাহাড়ে জঙ্গলে ও দুর্গম তীর্থ সমূহে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকিলে সে কার্য্য সম্পন্ন হয় কিরূপে? তাঁহার দেহটিকে লোকসমাজের দৃষ্টির সম্মুখে একটি প্রধান ও সুগম তীর্থক্ষেত্রে বাঁধিয়া রাখা প্রয়োজন। সেখানে তিনি গৃহীকে গৃহীর আদর্শ দেখাইবেন, সাধুকে সাধুর আদর্শ দেখাইবেন, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসের সামঞ্জস্য বিধানের কৌশল লোকসমাজকে শিখাইবেন, কৃপাপ্রার্থীদিগকে কৃপা বিতরণ করিবেন, সংসার-জ্বালাপীড়িত শান্তিপিপাসু সংসারীদিগকে আশ্রয় ও ভরসা দিবেন।

এই সকল কার্য্য তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল বলিয়াই বোধ হয় এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হইল, যাহাতে দৈহিক জীবনের শেষ কয়েক বৎসর গোরক্ষনাথ মন্দিরেই তাঁহার নিয়তবাসের ব্যবস্থা হইল। ভগবানের বিধান ও জীবের প্রারব্ধ কোন্ পথ ধরিয়া আপনাকে চরিতার্থ করে, তাহা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর। মহাপুরুষগণ অবশ্য জানিয়া স্বেচ্ছায়ই তাঁহাতে যোগ দেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে তিনি গোরক্ষপুর গমন করেন। স্থানের আব্‌হাওয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। মোহান্ত মহারাজের মস্তক তাঁহার নিকট আপনা আপনি অবনত হইল। বাবাজী সাক্ষিরূপেই বাস করিতে লাগিলেন। 'হাঁ' 'আচ্ছা' 'নেহি' প্রভৃতি ইঙ্গিত দ্বারাই অধিকাংশ কার্য্য

সারিয়া দিতেন ; কখন কখন দু-চারিটী কথা বলিতেন, সর্ব্বদাই অন্তর্মুখ থাকিতেন। অথচ তাঁহার সান্নিধ্যে সকল জটিল বিষয়ই যেন সরল হইয়া যাইত, সকল সমস্যাই সহজে মীমাংসিত হইয়া যাইত। আবার আশ্রমে রীতিমত সাধুসেবা, অতিথিসেবা, দীনসেবা, জীবসেবা প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত হইল, এবং দেবতার কার্য্য যথাবিহিত রূপে সুসম্পন্ন হইতে লাগিল। ধর্ম্মার্থী গৃহস্থগণ আগ্রহের সহিত 'দর্শন' করিতে আসিতে লাগিলেন। যোগীশ্বর মহাপুরুষের শুভ দৃষ্ঠিপাতে সকলদিকের সুব্যবস্থা হইল।

অনেক সাধু ও স্থানীয় বিশিন্ট ভদ্রলোক মোহান্তের পদচ্যুতির পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু পদচ্যুতি দূরের কথা, বাবাজী তাঁহার সম্মানেরও বিন্দুমাত্র লাঘব করিলেন না। মোহান্তপদের সম্মান ও পূজা মোহান্তই পাইতে লাগিলেন। বাবাজী নিজে সেবকরূপে মন্দিরের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত হইলেন। বাবা গম্ভীরনাথ সম্পত্তি-পরিচালনার জন্য সুদক্ষ বিশ্বাসী কর্ম্মচারী নিয়োজিত করিলেন, এবং উপযুক্ত সাধুদের উপর আশ্রমের বিভিন্ন বিভাগের ভার অর্পণ করিলেন। তিনি স্বয়ং উপদ্রষ্টা ও অনুমন্তা হইয়া নিজের ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

আশ্রমের কার্য্য যখন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে লাগিল, তখন তিনি আবার গয়ায় গিয়া নির্জ্জন বাস আরম্ভ করিলেন, মাঝে মাঝে কর্ম্মচারী ও সাধুগণের আগ্রহে গোরক্ষপুর আসিয়া

দেখিয়া শুনিয়া যাইতেন। তাঁহার অনুপস্থিতি কালে আশ্রমে আবার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। আশ্রমস্থ সাধুগণ, কর্ম্মচারিগণ এবং স্থানীয় পদস্থ ব্যক্তিগণ আবার যোগিরাজ গম্ভীরনাথের শরণাপন্ন হইলেন এবং এক প্রকার জোর-জবরদস্তী করিয়া ১৯০৬ সনে তাঁহাকে আশ্রমে লইয়া আসিলেন। তাঁহার আগমনে মোহান্ত মহারাজের মস্তক অবনত হইল। তখন সকলে মিলিয়া মোহান্তকে পুনরায় একরার-নামা লিখিয়া দিতে বাধ্য করিলেন। তদনুসারে মন্দিরের কোন কার্য্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহার অধিকার রহিল না। কাহাকেও দীক্ষাদান করিবার অধিকার হইতেও তিনি বঞ্চিত হইলেন। মাস মাস নির্দ্দিষ্ট মাসহারা এবং সাম্প্রদায়িক ব্যাপারাদিতে মোহান্ত-পদোচিত কর্ত্তব্য-সম্পাদন ও সম্মান-প্রাপ্তি—ইহাতেই তাঁহার অধিকার রক্ষিত হইল। তিনি যে সব অপরাধ করিয়াছিলেন, বাবাজী অবশ্যই তাহা ক্ষমা করিলেন, এবং আশ্রমের ও সম্প্রদায়ের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য তাঁহার অধিকার যতটুকু সংকুচিত করা অবশ্যপ্রয়োজনীয় বোধ হইয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক কিছু করিতে রাজী হইলেন না।

আবার সুশৃঙ্খল ভাবে কার্য্য আরম্ভ হইল। সাধু এবং ভক্তদিগের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে বাবাজীও তদবধি গোরক্ষপুরেই স্থায়ী ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন বোধ হইল যেন, তিনি তাঁহার স্বাভাবিক নির্জ্জন-প্রিয়তা সত্ত্বেও বাধ্য হইয়া সম্পূর্ণরূপে প্রারব্ধ ও ভগবদ্-বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ

পূর্ব্বক লোকালয়ে অবস্থিতি স্বীকার করিয়া লইলেন। মহাভারতে এক অবধূত বলিয়াছিলেন,—

"নাভিনন্দামি মরণং নাভিনন্দামি জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষেঽহং নির্দ্দেশং ভৃত্যকো যথা॥"

—আমি মরণও অভিনন্দন করি না, জীবনও অভিনন্দন করি না; ভৃত্য যেমন প্রভুর আদেশের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, আমিও সেইরূপ কালের প্রতীক্ষা করিয়া আছি। যোগিরাজ গম্ভীরনাথও তখন হইতে ব্যবহারক্ষেত্রে তদ্রূপ ভাব অবলম্বন করিয়াই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি যে বিশ্বগুরু ভগবানের বিদ্যাশক্তি বা গুরুশক্তির প্রেরণায় কৃপাপরবশ হইয়া অবিদ্যান্ধ লোকসমূহকে মানব জীবনের আদর্শ দেখাইতে ও জ্ঞানচক্ষু প্রদান করিতে লোক-সমাজের মধ্যে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাকে যে সদ্‌গুরুর আসন গ্রহণ করিয়া বহু ধর্ম্মার্থীকে প্রকাশ্যে কৃপা করিতে হইবে, তাহা তাঁহার নিরাবরণ দৃষ্টির নিকট স্পষ্ট প্রতিভাত হইলেও, তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া তাহার কোন পূর্ব্বাভাস পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

প্রায়ই দেখা যায়, যে সব মহাপুরুষ জ্ঞানধর্ম্মামৃত বিতরণ করিবার জন্য লোকসমাজে বাস করেন, তাঁহাদের জীবনে মাঝে মাঝে বিশেষ সঙ্কটপূর্ণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়া থাকে। বোধ হয় ইহা করুণাময় বিশ্ববিধাতার একটি বিশেষ বিধান। মহাপুরুষগণ লোকচক্ষুর অন্তরালে পর্ব্বত গুহাদিতে অবস্থিতি কালে কিরূপ সাধন ভজন করেন, কিভাবে জীবন যাপন

করেন এবং তাহা দ্বারা কি প্রকার অবস্থা লাভ করেন, তৎসম্বন্ধে সাধারণ লোকে বিশেষ কিছু পরিজ্ঞাত হইতে পারে না, এবং সেই হেতু ধর্ম্মময় জীবনের বৈশিষ্ট্য ও মাধুরী উপলব্ধি করিতেও সমর্থ হয় না। কিন্তু যেরূপ সঙ্কটময় বৈষয়িক ব্যাপারে পতিত হইলে বিষয়ী লোক হতবুদ্ধি হইয়া যায় এবং নানাপ্রকার নীতি-বিগর্হিত কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হয় না, সেইরূপ ব্যাপারের মধ্যে ধর্ম্মপ্রাণ সাধুগণ কি প্রকার ধীর স্থির নির্ব্বিকার থাকেন এবং কি প্রকার ধর্ম্মানুগত ব্যবহার দ্বারাই সেই সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হন তাহা দর্শন করিয়া তাহারা মহাপুরুষগণের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এবং নিজেদের জীবন পরিচালনা সম্বন্ধেও অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারে। সাধারণ লোকের নিকট ধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিয়া তাহাদিগকে কল্যাণের পথে আকর্ষণ করিবার জন্যই বোধ হয় করুণাময় বিশ্বগুরু ভগবানের এই ব্যবস্থা। এরূপ বিপদে মহাপুরুষগণ পতিত হন কেন, তাহা জিজ্ঞাসা করা নিষ্ফল, এরূপ বিপদের মধ্যে তাঁহারা কি রকম ব্যবহার করেন, তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়। সাধারণ লোকে যাহা ভয়ঙ্কর বিপদ মনে করে, ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদিগের নিকট তাহা যে বিপদই নয়, সংসারের কোন ঝঞ্ঝাবাতেই যে তাঁহাদের প্রশান্ত-বাহিনী চিত্তনদীতে কোনরূপ বিক্ষোভ উৎপাদন করিতে পারে না, তাঁহারা যে সংসারের সর্ব্বপ্রকার কোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও সর্ব্বদা সংসারের ঊর্দ্ধে অবস্থান

করিয়া থাকেন, ইহা দর্শন করিয়া মানুষ উপলব্ধি করিতে পারে, নিরাবিল শান্তির উৎস কোথায়।

যাঁহারা বৈরাগ্যবান্ বিষয়-বিমুখ অকপট সাধক, যাঁহারা ব্রহ্ম-জ্ঞান, ব্রহ্ম ধ্যান ও ব্রহ্মানন্দ-রস-পানের কিঞ্চিন্মাত্রও আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, লৌকিক ব্যবহার মাত্রকেই যাঁহারা ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগের ব্যাঘাতকর বলিয়া জানেন, তাঁহারা যোগিরাজের মঠাধ্যক্ষপদ স্বীকারে অন্য কারণে বিস্মিত হইলেন। যিনি জীবনের অধিকাংশ সময় পর্ব্বত-গুহায় নিবিড় সমাধি অভ্যাসে অতিবাহিত করিয়াছেন, ব্রহ্মভাবে সমাহিত থাকা যাঁহার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে, দেহপাত পর্য্যন্ত নিত্য-নিরন্তর নিরাবিল ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগে ডুবিয়া থাকাই যাঁহার নিকট অভীষ্টতম হওয়ার কথা, তিনি যে সেই অতুলনীয় আনন্দ সম্ভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবের কল্যাণের জন্য লোকালয়ে আসিয়া বিষয় কর্ম্মের সহিত যুক্ত হইলেন, ইহাই তাঁহাদের নিকট অধিকতর বিস্ময়জনক। তিনি যে কেবলমাত্র বিষয় কর্ম্মের সংস্পর্শে আসিলেন, তাহা নয়; তৎসংশ্লিষ্ট বিবাদ বিসংবাদ ও অশান্তিজনক নানা ঘটনা উপস্থিত হইলেও, সম্প্রদায়ের, আশ্রমের সাধুদের ও জনসাধারণের মঙ্গলের অনুরোধে সেই সম্পর্ক পারত্যাগ না করিয়া, তিনি তাহার মধ্যেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। যে বিষয়ের প্রতি তাঁহার বিন্দুমাত্রও অভিমান বা মমতা নাই, তাহারই সহিত যুক্ত হইয়া তৎসংশ্লিষ্ট নানা ঝঞ্ঝাবাতে তিনি যেন নিরুপায় দীন

জনের মত সমস্ত সহ্য করিতে লাগিলেন ; বিক্ষেপ, লাঞ্ছনা ও গোলমাল এড়াইবার জন্য তাহা হইতে দূরে প্রস্থান করিলেন না। ইহাই সূক্ষ্মদর্শী সাধকদের নিকট আশ্চর্য্যজনক বোধ হইতে লাগিল। তাঁহারা বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, জীবের প্রতি প্রেম তাঁহার কত গভীর, যে সমাধির আনন্দকে উপেক্ষা করিয়া, জীবের কল্যাণার্থে ক্লেশ স্বীকারকে তিনি ইষ্টতর বোধ করিতেছেন। কিন্তু গুহানিবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ব্যবহারিক জীবন গ্রহণে একদিকে যেমন লোক সমাজের প্রতি তাঁহার সুগভীর প্রেম ব্যক্ত হইয়াছে, অন্যদিকে বিষয় কর্ম্মের সহিত ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগের, বৈষয়িক কোলাহলের সহিত গুণাতীত ভাবে অবস্থানের, সংসারের সহিত সমাধির, যে একটা সামঞ্জস্য সম্ভব, তাহাও তিনি ইহার ভিতর দিয়া জনমণ্ডলীকে শিক্ষা দিয়াছেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহার যোগৈশ্বর্য্য অসীম, তিনি এসব বৈষয়িক ব্যাপারে স্বীয় যোগশক্তির বিন্দুমাত্রও পরিচয় প্রদান করিতেন না, সাধারণ প্রাকৃতজনের মতই সকল কার্য্য করিতেন, সাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠ বুদ্ধিমান্ লোকসমূহ যেরূপ অবস্থায় যেরূপ উপায় অবলম্বন করেন, তিনিও তাহাই করিতেন। তাঁহার অপ্রাকৃতত্ব প্রকাশ পাইত কেবলমাত্র তাঁহার সর্ব্বাবস্থায় সমভাবে অবস্থানে—নিত্য নির্লিপ্ত নির্ব্বিকার সুপ্রসন্ন মুখশ্রীতে—সকল গোলমালের মধ্যেও অব্যাহত ব্রাহ্মীস্থিতিতে। এসব কাণ্ড কারখানার মধ্যে তাঁহার স্বীয় আসনে উপবিষ্ট প্রশান্ত গম্ভীর

মূর্ত্তিখানির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হইত, যেন প্রবল বাত্যাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে একটি বিশাল পর্ব্বতরাজ মস্তক উত্তোলন করিয়া নির্ব্বিকার নিশ্চিন্ত উদাসীন-ভাবে আপন মনে অবস্থান করিতেছেন; তরঙ্গমালা তাঁহার গাত্রে আঘাতের পর আঘাত করিয়া আপনা আপনি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া চূরমার হইয়া যাইতেছে, তাঁহাতে সে আঘাতের স্পর্শা-নুভূতিরও কোন নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না। তাঁহার যোগৈশ্বর্য্যের মধ্যে এইটীই সর্ব্বদা প্রকাশ পাইত।

এই সময় হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত গোরক্ষপুরে গোরক্ষনাথ মন্দিরেই বাবা গম্ভীরনাথের স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি মোহান্ত না হইয়াও সর্ব্ববিষয়ে মন্দিরের সর্ব্বে-সর্ব্বা হইলেন। তিনি আশ্রমের অধ্যক্ষ হইলেন। কার্য্যতঃ আশ্রম-সম্পত্তির তিনিই মালিক হইলেন, প্রজাগণের নিকট 'মা বাপ' হইলেন, গৃহস্থের ন্যায় সাধু-সেবক ও অতিথি-সেবক হইলেন। এক বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে তাঁহার আসন স্থাপিত হইল। নাথ সম্প্রদায়ের নেতৃ-পদে তিনি আসীন হইলেন। অসংখ্য সাধু গৃহস্থের দৃষ্টি তাঁহার উপর নিহিত রহিল। তাঁহার অধ্যক্ষতায় আশ্রমে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল, সাধুগণ ও কর্ম্মচারিগণ স্বচ্ছন্দচিত্তে স্ব স্ব কর্ত্তব্য সাধনে তৎপর হইলেন, ধর্ম্মার্থী গৃহস্থগণ বিষয়-কর্ম্মের অবসরে মন্দিরে আগমন পূর্ব্বক দেবতা ও মহাপুরুষের দর্শন ও পাদস্পর্শ লাভ করিয়া তাপিত চিত্ত শীতল করিতে লাগিলেন। প্রজাগণের

মধ্যে সন্তোষ ও শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। কোথাও কোনরূপ বিশৃঙ্খলা নাই।

যাঁহার নেতৃত্বাধীনে এত বড় একটা বিরাট সংসার এরূপ সুশৃঙ্খল ভাবে পরিচালিত হইতে লাগিল, তাঁহার দিকে যখনই দৃষ্টিপাত করা যাইত, তখনই দেখা যাইত তিনি আত্মস্থ, তাঁহার দৃষ্টি বাহিরের দিকে মোটেই নাই। তিনি যেন একটি নির্বিকার শান্তির—তরঙ্গ-বিহীন পরিপূর্ণ-আনন্দের—প্রতি-মূর্ত্তিরূপে এই বিকার-ময় সংসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। কর্ম্মচারিগণ বৈষয়িক কাজকর্ম্মের নিবেদন করিতেছে, মনে হইত যেন ভক্ত নিজ মনে দেব-প্রতিমার নিকটে তাহার বক্তব্য বিষয় বলিয়া যাইতেছে। বলা শেষ হইল, তিনি সব কথা শুনিয়াছেন কিনা তিনিই জানেন, তিনি একটি 'হাঁ' বা 'নেহি' কিংবা 'আচ্ছা' অথবা প্রয়োজনানুরূপ দু' একটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। এইরূপ, কখনও ভৃত্য আসিয়া আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে, কখনও কোন দরিদ্র ভিক্ষুক সাহায্যের প্রার্থনা করিতেছে, কখনও কোন আগন্তুক আশ্রমে অতিথি হইয়াছে, কখনও সাধুগণ বাদবিসংবাদ করিয়া মীমাংসার জন্য তাঁহার শরণ লইয়াছে, একই সময়ে হয়ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিভিন্ন প্রকার দরবার লইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত। তিনি অর্দ্ধ বাহ্য অবস্থাতেই মৃদুভাবে দু' একটি কথায় যাহাকে যাহা বক্তব্য তাহা বলিয়া, যাহাকে যাহা দেয় তাহা দিয়া, অতিথি

অভ্যাগতদিগের যথোচিত সেবার ব্যবস্থা করিয়া, আবার আত্মস্থ হইতেন। অথচ ইহাতেই সকল বিষয়ের সুবন্দোবস্ত হইয়া যাইত। তিনি যে সব আদেশ বা উপদেশ আশ্রমবাসীদিগকে দিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত যে আশ্রমসংশ্লিস্ট কোন ব্যাপারই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতেছে না. সকলের প্রতি, সকল কর্ত্তব্যের প্রতি, তাঁহার চক্ষু যেন অনবরত ধাবিত হইতেছে; অথচ তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে প্রায় সর্ব্বদাই দেখা যাইত যে, সে চক্ষু নিমীলিত বা অর্দ্ধ নিমীলিত।

ভগবান্ শাস্ত্রে সগুণ ও নির্গুণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তাঁহার মত সংসারীও কেহ নাই, তাঁহার মত অসংসারীও কেহ নাই। অনন্ত জটিলতা-সঙ্কুল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় ব্যাপারের একমাত্র কর্ত্তা তিনি, অথচ তিনি কোন কর্ম্মই করেন না, কোন কর্ম্ম বা কর্ম্ম-ফলই তাঁহাকে স্পর্শ করে না। জাগতিক অনন্ত গুণের, অনন্ত বিকারের, অনন্ত ভাবের অধ্যক্ষ ও আশ্রয় তিনি অথচ তিনি গুণাতীত, ভাবাতীত, বিকার লেশ-শূন্য, নিত্য আত্মস্বরূপে বিরাজমান। তিনি 'বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতোবাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ', আবার তিনি 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্'। একদিকে 'স এবেদং বিশ্বং কর্ম্ম' 'স বিশ্বকৃদ্‌বিশ্ববিৎ' 'সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ', অন্যদিকে 'ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে' 'সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ'। তিনি পূর্ণরূপে সংসারী, আবার পূর্ণরূপে অসংসারী। ইহা যে কিরূপে সম্ভব হয়, কিরূপে এত বড় বিরাট সংসারের যাবতীয়

কর্ম্ম সুচারুরূপে বিহিত বিধানে সম্পন্ন করিয়াও ভগবান্ নিত্য আত্মস্থ নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বিরাজিত, তাহার অভ্যাস বাবা গম্ভীরনাথের কর্ম্মজীবন দেখিয়া কতকটা ধারণা করা গিয়াছে। শ্রীভগবান্ যেরূপ বিশ্বাতীত স্বরূপে নিত্য বিরাজিত থাকিয়া অনাদি অনন্তকাল এই বিশ্ব সংসার পরিচালনা করিয়া আসিতেছেন, সেইরূপ সর্ব্বকর্ম্মাতীত আত্মস্বরূপে বিরাজিত থাকিয়াই বাবা গম্ভীরনাথ তাঁহার কর্ম্মজীবনে মঠাধ্যক্ষরূপে যাবতীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জীবন্মুক্তের আশ্রম পরিচালনা

গোরক্ষনাথ মন্দিরে মঠাধ্যক্ষরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবা গম্ভীরনাথের বেশ পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি যখন যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে থাকিতেন, তখন তাঁহার বেশভূষা তদনুরূপ হইত। এ বিষয়ে তাঁহার নিজের কোন ভ্রূক্ষেপ না থাকিলেও অবস্থানুসারে ব্যবস্থা হইয়া যাইত। সাধুসমাজেই হউক কি গৃহি-সমাজেই হউক, কোথাও তিনি বেশের বৈশিষ্ট্য দ্বারা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। যখন তিনি নির্জ্জন কুটীরে বা গুহায় থাকিয়া সাধন ভজনে রত ছিলেন, তখন তাঁহার পরিধান ছিল একটিমাত্র কৌপীন, যখন পরিব্রাজকরূপে পর্য্যটন করিতেন, তখন কৌপীনের উপর বহির্ব্বাস থাকিত। লোকের সংসর্গে আসিলে লোকসমাজের মর্য্যাদা রক্ষার্থে গাত্রাবরণ ব্যবহার করিতেন। এতদ্ভিন্ন, তাঁহার সম্বলের মধ্যে ছিল একটী মাত্র কাল কম্বল, একটি ফৌরি ও একটি খাপ্‌রা। তাঁহার মস্তকে ছিল জটাভার, বদনমণ্ডল ছিল ঘন গুম্ফ ও শ্মশ্রুরাজিতে আবৃত। দেহ সাধারণতঃ বিভূতিলিপ্ত থাকিত। তিনি প্রথম যখন গোরক্ষপুরে আসিয়া গোরক্ষনাথ তত্ত্বাবধানের প্রতি দৃষ্টিপ্রদান করিতে বাধ্য হন, তখন কৌপীনের উপর একখানা সাদা ধুতি পরিতে

আরম্ভ করেন। সাধু-সেবকগণ তৈল, খৈল, দধি প্রভৃতি মাখিয়া ধৌত করিতে করিতে তাঁহার জটাজাল পরিষ্কার করেন, এবং প্রসাধন করিতে করিতে তাঁহার সুদীর্ঘ কেশরাশিকে জটাবন্ধন হইতে মুক্ত করেন। ইহার পরে তিনি যখন গোরক্ষপুর হইতে চলিয়া যান, ও গয়ায় মাধোলালের বাগানবাড়ীতে অবস্থান করিতে থাকেন, তখন বেশের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। দীর্ঘকাল বাহিরে থাকিলে অবশ্য আবার কেশ জটায় পরিণত হইত ও কৌপীন সম্বল হইত। যখন তিনি গোরক্ষপুরের মঠাধ্যক্ষ হইলেন, তখন হইতে তাঁহার বেশভূষায় তাঁহাকে একটি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত গৃহী ভদ্রলোকের মতই দেখা যাইত। পরিধানে কৌপীনের উপর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এক খানা সাদা ধুতি, গায়ে এক খানা সাদা চাদর, পায়ে কাষ্ঠ-পাদুকা, প্রশান্ত মুখমণ্ডলে সুঘন সুলম্বিত শ্বেত-কৃষ্ণ সগুম্ফ শ্মশ্রুরাজি, মস্তকে আস্কন্ধ বিলম্বিত অর্দ্ধপক্ক কেশজাল। তখন হইতে তিনি তক্তাপোষের উপরে কম্বলশয্যায় শয়ন ও উপবেশন করিতেন। তাঁহার বাঙ্গালী শিষ্যগণ তাঁহাকে এই বেশেই দর্শন করিয়াছেন।

মোহান্তের বাসের জন্য যে দ্বিতল অট্টালিকা আছে, তাহার নীচের তালায় একপার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে তিনি বাস করিতেন। সেই কক্ষটিই তাঁহার শয়ন ঘর, বসিবার ঘর, অফিস ঘর, জিজ্ঞাসুদিগকে উপদেশ দিবার ঘর। সেই ঘরে একখানা খাট ছিল, তিনি তাহার উপর আসনস্থ হইয়া

অধিকাংশ সময় অর্দ্ধবাহ্যাবস্থায় থাকিতেন। নীচে এক খানি সতরঞ্চ পাতা থাকিত ; সাধুগণ, ভক্তগণ, কর্ম্মচারিগণ, আগন্তুক সজ্জনগণ তথায় উপবেশন করিতেন এবং প্রয়োজনানুসারে স্ব স্ব বক্তব্য নিবেদন, ও আদেশ বা উপদেশ গ্রহণ করিতেন।

সর্ব্ব-বন্ধন-বিনির্ম্মুক্ত মহাপুরুষের দৈনন্দিন কার্য্যকলাপ রীতিমত নিয়মবদ্ধ ভাবে সম্পাদিত হইত। তিনি রাত্রি তিন ঘটিকার সময় শয্যার উপরে উঠিয়া বসিতেন। কতক্ষণ নিদ্রা যাইতেন, তাহা বলিতে পারি না। তবে তিনটার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সাধারণতঃ তিনি শয়ন করিয়া থাকিতেন। ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত শয্যার উপরেই যোগাসনে বসিয়া তিনি গভীর সমাধিজনিত বিশেষ আনন্দ সম্ভোগ করিতেন। ৫টার পর মলমূত্র ত্যাগান্তে এক একটি এরণ্ডের চারা কাটিয়া একহস্ত পরিমিত করিয়া তদ্দারা তিনি দাঁতন করিতেন। দাঁতন করিতে করিতে তিনি সমস্ত কাষ্ঠখণ্ড গলার ভিতর দিয়া কয়েকবার উদর পর্য্যন্ত প্রবেশ করাইয়া দিতেন ও বাহির করিয়া আনিতেন। ইহাকে ব্রহ্মদাঁতন বলা হয়। তৎপর পরিষ্কাররূপে হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া অল্প কতটুকু সময়ের জন্য বাহিরে আসিতেন, এবং গোরক্ষনাথ মন্দিরের সম্মুখস্থ একটি সমাধি মন্দিরের উন্মুক্ত রোয়াকের এক কোণে উপবেশন করিতেন। সাধারণতঃ তখন তিনি একাকীই বসিতেন, তবে কাহারও বিশেষ প্রয়োজনীয় কোন বিষয়

নিবেদন করিতে হইলে, তখন তাহা করা যাইত। ইহার পরে স্বীয় কক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি আবার আসনস্থ হইতেন। বেলা ৮ ঘটীকা পর্য্যন্ত কক্ষের দরজা বন্ধ থাকিত। ৮টা হইতে ১০॥টা কি ১১টা পর্য্যন্ত সেই কক্ষে লোক-জনের যাতায়াত হইত। তিনি স্বীয় আসনে স্বভাব-সিদ্ধ প্রশান্ত গম্ভীর অন্তর্মুখ অবস্থাতেই উপবেশন করিয়া থাকিতেন, যাঁহার যাহা বক্তব্য ও শ্রোতব্য, তিনি তাহা বলিয়া ও শুনিয়া যাইতেন।

তৎপর তিনি স্নানাহার করিতেন। শ্রীশ্রীনাথজীর ভাণ্ডারা তৈয়ারী হইলে, অন্যান্য সাধুদের জন্য যাহা প্রস্তুত হইত, তাঁহার জন্যও ঠিক তাহাই প্রস্তুত হইত এবং তিনি তাহাই আহার করিতেন। মোহান্তের ন্যায় নিজের জন্য কোনরূপ বিশেষ ব্যবস্থা তিনি অনুমোদন করিতেন না। কাহাকেও দীক্ষা প্রদান করিতে হইলে, স্নানের পরই তাহা করিতেন, তৎপরে আহার করিতেন। আহারান্তে ৩টা বা ৩॥০টা পর্য্যন্ত তিনি বিশ্রাম করিতেন। তখন কেহ কোন কথা নিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত না। গরমের দিনে কখন কখন বাতাস করিবার জন্য কোন একটি সেবক উপস্থিত থাকিত। ৩॥০টার পর হাতমুখ প্রক্ষালন করিয়া আবার সেই খোলা জায়গায় সমাধি মন্দিরের রোয়াকের উপর তিনি আসন গ্রহণ করিতেন। তখন অনেক দর্শনার্থী দর্শন ও প্রণাম করিতে আসিত। সেই রোয়াকের উপরই

একখানা সতরঞ্চ পাতা থাকিত, সেখানে আসিয়া উপস্থিত সাধু ও ভদ্রলোকেগণ উপবেশন করিতেন। তখন তাঁহাদের সহিত তিনি দু' চারিটা কথাও বলিতেন। ক্রমে ক্রমে, বিশেষতঃ বাঙ্গালীদের সমাগমের পরে, তাহাদের আন্তরিক আগ্রহে তিনি সামান্য কিছু বার্ত্তালাপের অভ্যাস করিয়াছিলেন। লোকসকল তাঁহার মুখের দু' একটি কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ-চিত্তে উন্মুখ হইয়া থাকিত, তিনি ভাবাবিষ্ট অবস্থাতেই সময় সময় তাহাদের সহিত কিছু কিছু সৎ-প্রসঙ্গ করিতেন।

সন্ধ্যাসময়ে গোরক্ষনাথ মন্দিরের আরতির ঘণ্টা বাজিয়া উঠিত। প্রায় দুই ঘণ্টা ব্যাপিয়া মন্দিরে মধুর আরতি হইতে থাকে। সকলেই তখন নীরব। তিনিও তখন আত্মসমাহিত হইয়া বসিয়া থাকিতেন। আরতির পরে আশ্রমস্থ সকল সাধুর একত্রে সাত বার মন্দির প্রদক্ষিণ করিবার নিয়ম। তিনিও সাধুদের সহিত মিলিত হইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেন এবং সাম্প্রদায়িক নিয়মানুযায়ী শ্রীশ্রীনাথজীর আসনের সম্মুখে প্রণামাদি করিতেন। তৎপর তিনি স্বীয় গুরু গোপালনাথজীর সমাধি মন্দির প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিতেন। পুনরায় আসিয়া সেই আসনে নীরবে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিতেন। সেই সময় আশ্রমবাসী সাধুগণ শ্রীশ্রীনাথজীকে ও মোহান্তজীকে প্রণাম করিয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতেন। বাহিরের যে সব ভদ্রলোক তখন

সেখানে উপস্থিত থাকিতেন, তাহারাও মন্দির ও বাবাজীকে প্রণাম করিয়া ক্রমে ক্রমে বিদায় গ্রহণ করিতেন। এইরূপ দুই ঘণ্টার অধিক রাত্রি কাটিয়া গেলে তিনি স্বীয় কক্ষে ফিরিয়া আসিতেন।

শীতকাল ব্যতীত অন্য সময় রাত্রিতে তিনি প্রায় কক্ষের ভিতরে শয়ন করিতেন না। বারান্দায় একখানা ছোট খাটুলিতে শয়ন করিতেন। তখন আরতির পর ফিরিয়া আসিয়া আর কক্ষে প্রবেশ করিতেন না, বারান্দায় খাটুলীর উপরই উপবেশন করিতেন। আশ্রমের রাত্রিকালীন ভোজনাদি ব্যাপার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত বসিয়াই থাকিতেন। শিষ্য ও ভক্তগণের পক্ষে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিবার এবং নিজ নিজ সাধ্য-সাধন-বিষয়ক সংশয় ও ভ্রান্তি নিরসন করিয়া লইবার ইহাই প্রকৃষ্ট সময় ছিল। আশ্রমকার্য্য শেষ হইলে সকলকে 'আরাম' করিতে উপদেশ দিয়া তিনি নিজেও শয়ন করিতেন। তখন সেবা-পরায়ণ ভক্তগণ সময় সময় তাঁহার হস্তপদাদি মর্দ্দনরূপ সেবা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইতেন।

তাঁহাকে কোন ঘড়ী ব্যবহার করিতে দেখি নাই। অথচ তাঁহার যে সময়ের যে কাজ, তাহা ঠিক সময়েই সম্পাদিত হইতে দেখা যাইত। তিনি সময়ের সদ্ব্যবহার ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন।

দেশের ও জগতের সংবাদ রাখা ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা করা চিন্তাক্ষম ব্যক্তিমাত্রেরই একটি বিশেষ কর্ত্তব্য, ইহা প্রদর্শন

করিবার জন্যই বোধ হয় তিনি যখন বৈকালে বাহিরে রোয়াকের উপরে আসিয়া বসিতেন. তখন সংবাদপত্র পাঠক ভদ্রলোকদের নিকট হইতে সাময়িক বিশেষ বিশেষ বৃত্তান্ত শ্রবণ করিতেন ও তৎসম্বন্ধে দু' একটি মন্তব্য করিতেন। ইউরোপীয় যুদ্ধের সময় শ্রীযুত হেমন্ত বিহারী ঘোষাল নামক তাঁহার একজন এলাহাবাদ প্রবাসী বাঙ্গালী ভক্তশিষ্য (তিনি তখন গোরক্ষপুরে রেলওয়ে পুলিস বিভাগে চাকুরী করিতেন.) নানা ইংরেজী সংবাদপত্র হইতে বিশেষ বিশেষ বৃত্তান্ত যত্নের সহিত সংগ্রহ করিয়া আনিয়া প্রতিদিন বৈকালে উর্দ্দু ভাষায় তাঁহাকে শ্রবণ করাইতেন। তিনি মাঝে মাঝে 'হাঁ', 'হুঁ' উচ্চারণ করিয়া কখনও এক আধটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, কখনও এক আধটী মন্তব্য প্রকাশ করিয়া. বক্তার উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। তখন সেখানে বহু সাধু ও গৃহী উপস্থিত থাকিতেন। সকলেই আনন্দের সহিত এসব সংবাদ শ্রবণ করিতেন। মাঝে মাঝে দেশের সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক বা ধর্ম্মনৈতিক বিশেষ বিশেষ ঘটনা তাঁহার নিকট বর্ণন করিয়া তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করা হইত। তিনি তাঁহার অঙ্গুলি ঈষৎ সঞ্চালিত করিয়া, অতি শ্রুতিমধুর সুললিত সহজ হিন্দি ভাষায় দু' চার কথায় সে সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেন। এইরূপে তিনি দেশের ও জগতের সমষ্টিগত জীবনের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের যোগরক্ষা করিতে শিক্ষা দিতেন।

যথার্থ অভাব লইয়া কোন প্রার্থী তাঁহার নিকট উপস্থিত

হইলে কখনও প্রত্যাখ্যাত হইত না। অর্থদ্বারা, বস্ত্রদ্বারা, আহারের ব্যবস্থা দ্বারা—একজন সাধারণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ গৃহস্বামী বা মঠস্বামীর যে সব উপায়ে অর্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করা উচিত, সেই সব উপায়ে তিনি যাচকদের প্রয়োজনানুরূপ বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। প্রজাগণের কোন অভাব অভিযোগ উপস্থিত হইলে, শিশু যেমন পিতার নিকট দৌড়িয়া গিয়া আবদার করে, সেইরূপ, তাহারা বাবাজীর নিকট দৌড়িয়া গিয়া তাহাদের অভাব অভিযোগের বিষয় জানাইয়া আবদার করিত। শিশুর যেমন পিতামাতার উপর দাবী থাকে, তাহাদেরও যেন বাবাজীর উপর তদ্রূপ দাবী ছিল। যদিও তিনি সর্ব্বদাই অন্তর্মুখ থাকিতেন, এবং তাহাদের কথার উত্তর প্রত্যুত্তর প্রায়ই করিতেন না, তথাপি তিনি যখন তাহাদের দিকে তাকাইতেন, তখন সেই দৃষ্টির ভিতর হইতে স্নেহ ও করুণাধারা এমন প্রবাহিত হইত যে, তাহাতেই যেন তাহারা প্লাবিত হইয়া যাইত; তাহাদের অভাবের জ্বালা কমিয়া যাইত, এবং তাহাদের অভাব অভিযোগের কারণ যে নিরাকৃত হইবে, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকিত না। তিনিও এমন ব্যবস্থা করিয়া দিতেন যাহাতে প্রজাদের দুঃখের লাঘব হয়, সন্তোষ ও শান্তি বর্দ্ধিত হয়।

ডাকঘর বা টেলিগ্রাফের পিয়ন যখন মনি-অর্ডার বা টেলিগ্রাম নিয়া আসিত, তখন তিনি তাহাদিগকে প্রতিবারই এক আনা বা দুই আনা করিয়া বক্‌সিস্ দিতেন। একবার উপস্থিত একজন ভক্তকে আদেশ করিলেন 'উস্‌কো দো আনা

দে দেও'। ভক্তটি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ভদ্রলোক। প্রতিবাদ করিয়া বাবাজীকে যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে, ইহারা ইহাদের কার্য্যের জন্য সরকার হইতে রীতিমত মাসিক বেতন পায়, এই কার্য্য নিষ্ঠার সহিত সম্পাদন করিতে ইহারা আইনতঃ বাধ্য, ইহাতে পুরস্কারযোগ্য কিছু নাই। একজন পুরস্কার দিলে যাহারা পুরস্কার দিবে না, তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে ইহাদের অবহেলা আসিতে পারে, ইত্যাদি। তাঁহার বক্তব্য বাবাজী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মৌনভাবে শ্রবণ করিলেন, এবং তাঁহার বক্তব্য শেষ করিয়া তিনি যখন নীরব হইলেন ও বাবাজীর আদেশ শুনিবার জন্য চাহিয়া রহিলেন, তখন বাবাজী তেমনি মৃদুভাবে আবার বলিলেন 'দো আনা দে দেও'। ভক্তটি অপ্রতিভ হইয়া বাবাজীর তহবিল হইতে দুই আনা বাহির করিয়া পিয়নকে প্রদান করিলেন। পিয়ন প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। তৎপর ভক্তটি স্বীয় ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বাবাজী তাঁহাকে ধীরভাবে নিজের উদ্দেশ্যটি বুঝাইয়া দিলেন যে, ইহারা সরকার হইতে যে বেতন পায়, তাহা তাহাদের অভাবের তুলনায়, পরিশ্রমের তুলনায় ও দায়িত্বের তুলনায় খুব অল্প। ইহারা দরিদ্র, যাহাদের সামর্থ্য আছে, তাহাদের নিকট ইহারা কিছু কিছু প্রত্যাশা করে, কিছু কিছু পাইলে ইহাদের কর্ত্তব্য-সাধনে উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়, অভাবের তাড়নাতেই এবং পরিশ্রম ও দায়িত্বের অনুপাতে অর্থ না পাইলেই অনেক

সময় কার্য্যে শৈথিল্য আসে, ভয়ে কার্য্য করা অপেক্ষা উৎসাহের সহিত কার্য্য করিলে কার্য্যও ভাল হয়, নিজেরও কল্যাণ হয়।

সাধু ও ব্রাহ্মণদিগকে তিনি তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইতে বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতেন। উৎসবাদি উপলক্ষে তিনি তাঁহাদিগকে ভোজন করাইয়া বস্ত্রাদি দান করিতেন। তিনি যখন আশ্রম হইতে কোথাও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেন তখন যাত্রা-মঙ্গলের অঙ্গীভূত ভাবে তিনি সাধু ও ব্রাহ্মণদিগকে তৃপ্তির সহিত ভোজন করাইয়া ও দরিদ্রদিগকে পয়সা বিতরণ করিয়া যাত্রা করিতেন। তিনি সাধু ব্রাহ্মণদের তৃপ্তির জন্য কখন কখন উৎসব সৃষ্টি করিতেন। বিশেষ বিশেষ ঋতুতে বিশেষ বিশেষ ফল বা খাদ্য-সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সে সব জিনিষ প্রচুর পরিমাণে সাধু ও ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবার জন্য তিনি প্রায় ঋতুতেই এক একটি উৎসব করিতেন। গোরক্ষনাথ মন্দির-সংশ্লিষ্ট অনেক আম বাগান আছে এবং তাহাতে প্রচুর আম জন্মে। আম মন্দিরে আসিলে তিনি বিশেষ ভোজের বন্দোবস্ত করিতেনই, তদ্ভিন্ন বহু লোককে আম বিতরণ করিতেন।

সাধু ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণ করিলে তাঁহাদের ভোজনাদি ব্যাপারে কোনরূপ বিঘ্ন না হয়, তাঁহাদের তৃপ্তির কোনরূপ ব্যাঘাত না হয়, কেহ অভুক্ত বা অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় ফিরিয়া না যায়, কাহারও আদর অভ্যর্থনায় কোনরূপ ত্রুটি না হয়, এসব

বিষয়ে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন এবং তজ্জন্য প্রয়োজন হইলে কখন কখন একটু ঐশ্বর্য্যও প্রকাশ করিতেন।

এ সম্বন্ধে দু' একটি ঘটনা শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। একবার মন্দিরে ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ। যতলোক নিমন্ত্রণে যোগদান করিবার সম্ভাবনা, তাহা হিসাব করিয়া দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু আহারের সময় দেখা গেল যে যতজন ব্রাহ্মণের জন্য আয়োজন করা হইয়াছে, তাহার দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যাঁহাদের উপর এ কার্য্যের ভার অর্পিত ছিল, তাঁহারা দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। ব্রাহ্মণকে অভুক্ত ফিরাইয়া দেওয়া অকল্পনীয়, অথচ যে পরিমাণ ভোজ্য সামগ্রী আছে, তাহাতে সংকুলান হওয়াও অসম্ভব। তাঁহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া বাবাজীর নিকট দৌড়াইয়া গিয়া এ বিষয় নিবেদন করিলেন। তিনি সঙ্কট অবস্থা বিবেচনা করিয়া, একখানা নূতন চাদর খুলিয়া দিলেন, এবং সেই চাদর দ্বারা খাদ্য সামগ্রী আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়া একদিক হইতে পরিবেশন করিতে আদেশ করিলেন। শেষে দেখা গেল যে সকলে তৃপ্তির সহিত ভোজন করিয়া যাওয়ার পরেও কতক পরিমাণ জিনিষ অবশিষ্ট রহিয়া গিয়াছে!

আর একবার আমের দিনে শুধু আমের নিমন্ত্রণ। সে দিনও লোকের সংখ্যা অপ্রত্যাশিতরূপে এত অধিক হইয়াছিল যে, যত আম গৃহে আছে, তাহাতে তাহাদিগকে তৃপ্তির

সহিত ভোজন করান অসম্ভব। বাজার হইতে আম কিনিয়া আনিবারও তখন সময় ছিল না। সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল। 'স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ঃ' মহাপুরুষ তখন ধীরভাবে আদেশ করিলেন যে, সমস্ত আম এই খাটের নীচে আনিয়া রাখ। আম আনীত হইলে তিনি তাহা এক খানা কাপড় দিয়া ঢাকিয়া দিলেন এবং এক পার্শ্ব হইতে খরচ করিতে বলিলেন। সে দিনেও সকলের তৃপ্তির সহিত প্রচুর পরিমাণে ভোজনের পরও অনেক আম অবশিষ্ট রহিল!

এইরূপে, অতিথি-সেবার কোনরূপ ক্রটী না হয়, তজ্জন্য মাঝে মাঝে তাঁহার ব্যবহারিক জীবনের সাধারণ নিয়ম কতক পরিমাণে উল্লঙ্ঘন করিয়া, সেবাধর্ম্ম যে কত বড়, তাহাই তিনি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন।

বিদ্যার্থীদিগকে বিদ্যালাভে সাহায্য করা তিনি একটি প্রধান কর্ত্তব্য-কর্ম্ম বলিয়া শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সাহায্যে অনেক গরীব বিদ্যার্থী বিদ্যালাভে সমর্থ হইয়াছে। অকপট বিদ্যা-লাভেচ্ছু কোন বালক বা যুবক সাহায্যের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি অন্ন বস্ত্র অর্থ প্রভৃতি দ্বারা যথাসাধ্য (লৌকিক ভাবে) তাহার বিদ্যালাভের সুবিধা করিয়া দিতে চেষ্টা করিতেন। অতিথি-সেবায় তিনি যেরূপ আগ্রহ ও পটুতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, বিশেষ ধর্ম্মনিষ্ঠ কর্ত্তব্যপরায়ণ গৃহস্থের মধ্যেও সেরূপ কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। কোন অতিথি গোরক্ষনাথ মন্দিরে সমাগত হইলে, তাঁহার যখন যাহা প্রয়োজন হওয়ার

সম্ভাবনা, তাহা পূর্ব্বেই বুঝিয়া তিনি তদনুরূপ ব্যবস্থা করিয়া রাখিতেন। নিত্য-নিরন্তর সমাহিত ভাবে অবস্থিতি সত্ত্বেও, কোথায় কোন্ অতিথি কিরূপ অসুবিধা বোধ করিতেছেন, অথবা কোন্ সময় কাহার কোন্ জিনিষের আবশ্যকতা উপস্থিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত। তাঁহার অন্তর্মুখ অবস্থাতেই মাঝে মাঝে হঠাৎ তিনি সম্মুখস্থ কোন ভক্ত বা সেবককে আদেশ করিতেন যে আশ্রমের অমুক স্থানে কয়েক ব্যক্তি আছেন, তাঁহাদিগকে শীঘ্র অমুক অমুক জিনিষ দিয়া আইস, অথবা অমুক বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আইস। তিনি নিজে অনেক সময় উপস্থিত হইয়া অতিথিদিগের সুবিধা অসুবিধার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং নানাভাবে তাঁহাদিগকে আপ্যায়িত করিতেন। একই সময়ে বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত, বিভিন্ন জাতীয় বহু অতিথি আশ্রমে উপস্থিত হইলেও, সকলেই অনুভব করিতেন যে মঠ-স্বামী বাবা গম্ভীরনাথের আতিথ্য-পূর্ণ সযত্ন দৃষ্টি তাঁহাদের প্রত্যেকের উপরই নিবদ্ধ আছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনানুরোধে কখন কখন তিনি এক আধটুকু অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়া ফেলিতেন।

কয়েক জন বাঙ্গালী ভক্ত সপরিবারে আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন, মন্দিরের পশ্চাদ্বর্ত্তী বাগানে তাঁহাদের বাসস্থান নিরূপিত হইয়াছে, ভাণ্ডার হইতে চাউল, দাল, তরকারী, মসল্লা, কাঠ, প্রভৃতি সব সেখানে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারা পাক আরম্ভ করিয়াছেন। বাবাজী ভক্ত সঙ্গে তাঁহার গৃহে

বসিয়া আছেন। হঠাৎ তিনি দুই জন সেবককে ভাল কিছু জ্বালানি কাঠ বাগানে দিয়া আসিবার জন্য আদেশ করিলেন। তাঁহারা অবাক্ হইয়া তৎক্ষণাৎ কাঠ মাথায় করিয়া বাগানে লইয়া গিয়া দেখেন যে, পূর্ব্বের কাঠগুলি ভিজা থাকায় সেখানে পাকের বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। এরূপ ঘটনা আরও অনেকবার দেখা গিয়াছে।

শ্রীযুত সারদা কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত 'বাবা গম্ভীরনাথজী' গ্রন্থে শ্রীযুত অভয় নারায়ণ রায় মহাশয় বাবাজীর অতিথি-সেবার একটি উজ্জ্বল বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"বাবা গম্ভীরনাথজীর গোরক্ষপুর আশ্রমে স্বর্গীয় যোগজীবন গোস্বামী প্রভৃতির সহিত আমি একবার গিয়াছিলাম। আমাদিগকে তিনি যে প্রকার দরদ ও আদের সহিত সেবা করিয়াছিলেন, ওরূপ আমি কুত্রাপি দর্শন করি নাই। গৃহীলোকে কদাচ ওরূপ সেবা করিতে জানেন না, ও পারেন না।"

তিনি বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগকে দীক্ষা দিতে আরম্ভ করার পর বহু বাঙ্গালী ভদ্রলোক সপরিবারে দলে দলে তাঁহার নিকট যাইতেন। তাঁহাদের আহারাদির বন্দোবস্ত তিনি নিজ ভাণ্ডার হইতে করিতেন, এবং তাঁহাদের কোন প্রকার অসুবিধা না হয়, সে দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতেন। তাঁহার অনেক শিষ্য ইহাতে একটু কুণ্ঠা বোধ করিয়া, নিজেরা বাজার হইতে আহার্য্য সামগ্রী কিনিয়া আনিয়া আহারাদির

ব্যবস্থা করিবার জন্য ইচ্ছুক হইয়াছিলেন; বাবাজী তাহা অনুমোদন করিলেন না। তিনি বলিলেন যে 'আপনারা আমার অতিথি, আপনাদের সেবা করা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য'। তিনি অবশ্য সাধুসেবার জন্য উৎসর্গীকৃত সামগ্রী গৃহস্থদিগকে বিনা প্রতিদানে আত্মসাৎ করিতে উপদেশ দিতেন না। তিনি শিষ্যদিগকে সাধুদের ভোজনের জন্য ভাণ্ডারা দিতে এবং নানাভাবে সাধু সেবা করিতে উপদেশ প্রদান করিতেন।

আশ্রমের পশুপক্ষী কীটপতঙ্গদের আহারাদির দিকেও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। আশ্রমের চিড়িয়াখানায় অনেক পশু ছিল। তাহাদের মধ্যে একটি ব্যাঘ্রও ছিল, সে বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। অনেক লোকে গো-প্রভৃতি পশু মন্দিরে উপঢৌকন প্রদান করিত। তাহাদের আহার ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা ত তিনি করিতেনই, কীট-পতঙ্গদের জন্যও আহার্য্য প্রদানের ব্যবস্থাও করিতেন। মাঝে মাঝে আশ্রম সংলগ্ন গোশালায় গমন করিয়া গরুসকলের তত্ত্বাবধান করা ও তাহাদিগকে একটু আদর করা তাঁহার একটি বিশেষ কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল।

উৎসবাদি উপলক্ষে যে সব নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের রীতি বহুদিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছিল, সে সব তিনি রক্ষা করিতেন, এবং নিজে তাহাতে যোগদান করিয়া সকলের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন ও তাহার মধ্যে পবিত্র ভাব সংক্রামিত করিয়া দিতেন। আশ্রমে একটি হস্তী ছিল। হস্তীটি তাঁহার

একটি বিশেষ বাহন ছিল। দশহরার দিনে তিনি হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গোরক্ষনাথের মেলায় রামলীলা দর্শন করিতে যাইতেন। বহুলোক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিত। তিনি দুই দিকে পয়সার লুট দিতে দিতে যাইতেন, দরিদ্র লোকসকল তাহা কুড়াইয়া লইত।

তিনি গোরক্ষনাথের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত প্রজাগণের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিবার জন্য, এবং তাহাদের সকল প্রকার গোলমাল মিটাইয়া দিয়া ও অভাব অভিযোগের কারণ দূর করিয়া তাহাদের চিত্তে সন্তোষ ও প্রসন্নতা উৎপাদন করিবার জন্য দুই মাস পরিমিত সময় মফঃস্বলে বাস করিতেন। সেখানেও স্বভাবসিদ্ধ সমাহিত ভাবেই তিনি অবস্থান করিতেন। তাঁহার উপস্থিতিতেই সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিত। প্রজাগণ দলে দলে তাঁহার দর্শন লাভের জন্য উপস্থিত হইত এবং তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইয়া যাইত। প্রজাগণ স্বভাবতঃই তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিল। এখনও তাহারা গোরক্ষপুর আসিলে বাবাজীর সমাধি-মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার মূর্ত্তির নিকট আপনাদের প্রাণের সকল বেদনা নিবেদন করিয়া ও তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। তাঁহার তিরোধানে গ্রাম্য দরিদ্র প্রজাগণ আপনাদিগকে পিতৃহীন বোধ করিতেছে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

শিষ্য সমাগম

যোগিরাজ গম্ভীরনাথ মহাসিদ্ধ মহাজ্ঞানী শিবকল্প মহাপুরুষরূপে সর্ব্বত্র খ্যাতি ও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইলেও, এবং আপনার অলোকসামান্য জীবনবৃত্তি দ্বারা সর্ব্বত্র আধ্যাত্মিক প্রভাব বিস্তার করিলেও, শিষ্যদল গঠন করিতে তিনি অনিচ্ছুক ছিলেন। দীক্ষা প্রদান করা দূরের কথা, মৌখিক উপদেশ প্রদান করিতেও তাঁহার অনিচ্ছা প্রকাশ পাইত। ধর্ম্মপিপাসু লোকসকল তাঁহার অনন্যসাধারণ বৃত্তি, ভাব ও আকৃতি দর্শন করিয়া তাঁহার দিকে স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হইত, তাঁহার স্নিগ্ধ মধুর দৃষ্টিপাতে গভীর সহানুভূতি ব্যক্ত হইত, কিন্তু তিনি কাহাকেও শিষ্যরূপে গ্রহণ ত করিতেনই না, আচরণ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে উপদেশ প্রদানেও কুণ্ঠিত হইতেন। অনেকে তাঁহার নিকট দীক্ষাপ্রার্থী হইয়া প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় কয়েকজন ভক্তের সহিত তাঁহার নিকট গিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রার্থনা করিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন 'হাম কুছ নেহি জানতা'।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বাবাজী যখন গ্রহণ উপলক্ষে কাশীতে গমন করিয়াছিলেন, তখন বাবা ব্রহ্মনাথজী সদ্‌গুরুর অন্বেষণে

ঘুরিতে ঘুরিতে তাঁহার দর্শন লাভ করেন, এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কায়মনবাক্যে সেবা করিতে থাকেন। সেবা-কার্য্যে তাঁহার আগ্রহ ও পটুতা দর্শন করিয়া অনেক সাধু চমৎকৃত হইয়া গিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে বাবাজী কৃপা করিয়া ব্রহ্মনাথজীকে চেলা করিয়া সন্ন্যাস প্রদান করেন। ব্রহ্মনাথজীকেই তিনি সর্ব্বপ্রথমে সন্ন্যাস প্রদান করেন কিন্তু তাঁহাকেও তিনি কন্‌ফট্‌ করেন নাই। গুরুদেবের অনুমোদন ক্রমে তাঁহার সাম্প্রদায়িক কর্ণবেধ সংস্কার অপর একজন যোগী দ্বারা সম্পাদিত হয়। মোহন্ত সুন্দরনাথের দেহান্তের পর তিনি গোরক্ষনাথ মন্দিরের মোহান্তের পদে অভিষিক্ত হন। ১৯৩৫ সালে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

বাবাজীর প্রথম বাঙ্গালী সেবক স্বর্গীয় কালীনাথ ব্রহ্মচারী। তাঁহার নিবাস ছিল বিক্রমপুরে কামারগাঁ গ্রামে এবং নাম ছিল কালী কিশোর চক্রবর্ত্তী। তিনি পুলিশ বিভাগে কার্য্য করিতেন। নানা অশান্তি ভুগিয়া তিনি চাকরী ত্যাগ করেন ও সদ্‌গুরুর অন্বেষণে বহির্গত হন। ঘুরিতে ঘুরিতে তিনি গয়ায় উপস্থিত হন এবং বাবাজীর ভক্ত শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার সাহায্যে বাবাজীর নিকট উপস্থিত হন। বাবাজী তাঁহাকে কৃপা করিয়া সান্ত্বনা ও উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক কাশীতে পাঠাইয়া দেন। বাবাজীর প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। বাবাজী যখন গোরক্ষপুরে আসিয়া মঠাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন,

তাহার অত্যল্প কাল পরেই কালীনাথ গোরক্ষপুরে আসেন, এবং সমস্ত দেহমনপ্রাণ তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হন। তাঁহার সেবাও অনন্যসাধারণ ছিল। মা যেমন শিশু-সন্তানের সেবা করেন, তিনিও সেইরূপ বাল্যের সহিত বাবাজীর সেবা করিতেন। নিজের দেহসম্বন্ধে ও দৈহিক প্রয়োজন সম্বন্ধে বাবাজী অনেকটা শিশুর মতই ছিলেন। তাঁহার ইষ্টানিষ্ট ছিল না, তিক্ত মধুর ছিল না, গ্রহণও ছিল না, বর্জ্জনও ছিল না, স্বীয় দেহরক্ষার প্রতি মনোযোগ ছিল না; নিজের সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। জীবনমরণ, দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য ও ক্লেশ, সমান ছিল। 'সর্ব্বত্র সমচিত্তত্ব মিষ্টানিষ্টো-পপত্তিষু'—তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। কালীনাথ ব্রহ্মচারী তাঁহার সেবায় ব্রতী হইয়া তাঁহার শরীরের ভার গ্রহণ করিলেন। তিনি বেশ ভাল পাক করিতে পারিতেন। নিজের কক্ষে নিজের মনোমত নানাপ্রকার জিনিষ পাক করিয়া তিনি বাবাজীকে আহার করাইতেন। বাবাজী কখন তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলে তিনি জোর করিতেন, কখনও মিষ্ট কথায় শিশুর মত তাঁহাকে বুঝাইতেন, কখনও বা দু' চারটা কটু কথা শুনাইয়া দিতেন, কখনও বা অভিমান করিয়া নিজে আহারাদি বন্ধ করিতেন। বাবাজী যেন শিশুর মত ভয়ে ভয়ে তাঁহার নির্দ্দেশ মত আহারাদি করিতেন। কখন হয়ত বাবাজী ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, (ভোজনের সময় সে কক্ষে কাহারও থাকার নিয়ম ছিল না) এবং ব্রহ্মচারী

হয়ত তাঁহার নিজ ঘরে বসিয়া অন্য লোকের সহিত কথা বলিতেছেন বা তামাক সেবন করিতেছেন, হঠাৎ দুটা কাঁচা লঙ্কা লইয়া দৌড়াইয়া তিনি বাবার ভোজনকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গিয়াছে যে কোন একটি বিশেষ তরকারীর সহিত কাঁচা লঙ্কা মাখিয়া খাইলে তাহা অধিকতর স্বাদু হইবে। তিনি বাবাজীর ভোজন পাত্রের উপর কাঁচা লঙ্কা দিয়া সেই তরকারীর সহিত উহা মাখিয়া খাইতে শিখাইয়া দিলেন। তিনি যখন যে কার্য্যেই ব্যস্ত থাকিতেন, বাবাজীর কোন্ সময় কি প্রয়োজন হইতে পারে, তাঁহার দৃষ্টি যেন সর্ব্বদা সেই দিকেই নিবদ্ধ থাকিত। তিনি নিজহাতে বাবাজীর বিছানা করিয়া দিতেন। খাটের উপর এক একখানি করিয়া কম্বল পাতিয়া তাহা হাত দিয়া ও বালিস দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া মসৃন করিয়া দিতেন। বাবাজীর সেবা সম্বন্ধীয় অতি ছোটখাট কার্য্যেও তিনি এইরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। তিনি সেবার ভার গ্রহণ করিবার পর ভৃত্যকে পর্য্যন্ত বিশেষ কিছু করিতে দিতেন না। এরূপ বাৎসল্যের সহিত সেবা বাবাজীর অন্য কোন ভক্ত বা শিষ্য করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ।

অদূর ভবিষ্যতে বহু বাঙ্গালী শিষ্য লইয়া বাবাজীর যে একটি বৃহৎ পরিবার গঠিত হইবে, কালীনাথ ব্রহ্মচারী সেই পরিবারের অগ্রদূত হইয়া রহিলেন। পরবর্ত্তী কালে যত বঙ্গীয় নরনারী বাবাজীর চরণাশ্রয় লাভ করিয়াছে, তাহাদের

সকলকেই তিনি নিজের ভ্রাতা-ভগিনীর ন্যায় দর্শন করিতেন, আদর অভ্যর্থনা করিতেন, সেবা করিতেন, ভৎর্সনা করিতেন। তিনি সকলেরই 'ব্রহ্মচারী দাদা'।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দ হইতে বাবাজী দু' একটি করিয়া বাঙ্গালীকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। বর্ত্তমান যুগে শিক্ষিত বাঙ্গালী ধর্ম্মার্থিগণ প্রধানতঃ মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন ও উপদেশের প্রভাবেই সদ্‌গুরুর আশ্রয় লাভের প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করেন।

তত্ত্বজ্ঞান-পিপাসু মুমুক্ষুর পক্ষে সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হওয়া অত্যাবশ্যক বলিয়া সকল শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন। উপনিষৎ বলিয়াছেন,—'তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপানিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্'—তত্ত্বজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে মুমুক্ষু সমিৎপানি হইয়া শাস্ত্রজ্ঞান-সম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর শরণাপন্ন হইবেন। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

—তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণের শরণাপন্ন হইয়া প্রণিপাত, সেবা ও প্রশ্ন জিজ্ঞাসাদি দ্বারা সেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ কর; তাঁহারা তোমাকে জ্ঞানোপদেশ করিবেন। এই শ্লোকের ভাষ্যে জ্ঞানিগুরু শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, 'যে সম্যগ্‌দর্শিনস্তৈরুপদিষ্টং জ্ঞানং কার্য্যক্ষমং ভবতি, নেতরদিতি ভগবতো মতম্'—যাঁহারা সম্যগ্‌দর্শী তাঁহাদের উপদিষ্ট জ্ঞানই কার্য্যক্ষম হয়, অন্য

(পুস্তক পাঠাদি জনিত) জ্ঞান নহে, ইহাই ভগবানের মত। বেদান্তাচার্য্য শঙ্কর আরও স্পষ্টরূপে তাঁহার 'তত্ত্বোপদেশ' গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

আত্মা প্রকাশমানোঽপি মহাবাক্যৈস্তথৈকতা।
তত্ত্বমোর্বোধ্যতেঽথাপি পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারতঃ॥
তথাপি শক্যতে নৈব শ্রীগুরোঃ করুণাং বিনা।
অপরোক্ষয়িতুং লোকে মূঢ়ৈঃ পণ্ডিতমানিভিঃ॥

আত্মা স্বয়ং প্রকাশমান হইলেও এবং বেদান্ত বাক্যের পৌর্ব্বাপর্য্য বিচার করিয়াও 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের তাৎপর্য্য অনুধাবন করিয়া জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেও শ্রীগুরুর করুণা ব্যতীত কোন অবিদ্যাগ্রস্থ ব্যক্তি স্বীয় পাণ্ডিত্যের বলে আত্মার অপরোক্ষ সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সমর্থ হয় না। বিবেক-চূড়ামণিতে তিনি লিখিয়াছেন,—

উপসীদেদ্‌গুরুং প্রাজ্ঞং যস্মাদ্ বন্ধ বিমোক্ষণম্।
শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ॥
ব্রহ্মণ্যুপরতঃ শান্তো নিরিন্ধন ইবানলঃ।
অহেতুক দয়া সিন্ধুর্বন্ধুরানমতাং সতাম্॥
তমারাধ্য গুরুং ভক্ত্যা প্রাহ্ব-প্রশ্রয়-সেবনৈঃ।
প্রসন্নং তমনুপ্রাপ্য পৃচ্ছেদ্ জ্ঞাতব্যমাত্মনঃ॥

যিনি শাস্ত্রমর্ম্মার্থদর্শী, পাপগন্ধবিহীন, বাসনালেশশূন্য, ব্রহ্মবিদ্‌বরিষ্ট, সদা ব্রহ্মভাবভাবিত, নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায়

প্রশান্ত এবং অহেতুক কৃপাসিন্ধু ও শরণাগত-বৎসল—এমন ভব-বন্ধন-মোচন-কারী প্রাজ্ঞ গুরুর সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইবে; এবং ভক্তিসহকারে প্রণাম, বিনয়, সেবা শুশ্রূষা প্রভৃতি দ্বারা গুরুর আরাধনা করিয়া, তাঁহার প্রসন্নতা সম্পাদন পূর্ব্বক স্বীয় জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিবে। হঠযোগ-প্রদীপিকায় স্বাত্মারাম যোগীন্দ্র বলিয়াছেন,—

"দুর্ল্লভো বিষয়োত্যাগো দুর্ল্লভং তত্ত্বদর্শনম্।
দুর্ল্লভা সহজাস্থা সদ্‌গুরোঃ করুণাং বিনা॥"

সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতিরেকে বিষয়-বৈরাগ্য, তত্ত্ব-দর্শন এবং সমাধি দুর্ল্লভ।

সকল শাস্ত্র ও জ্ঞানী মহাপুরুষগণ সদ্‌গুরু-শরণাগতি, তত্ত্বজ্ঞান ও পরাশান্তি লাভের জন্য অত্যাবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে সদ্‌গুরুরূপে যোগিরাজের লোকশিক্ষার কার্য্য ধীরে ধীরে আরম্ভ হইল। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যদিগের আত্মীয় ও ধর্ম্মপিপাসু বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যেই এই কার্য প্রথম আরম্ভ হয়। গোস্বামী মহাশয়ের এক শিষ্যের অতিবৃদ্ধা শাশুড়ীর নিরতিশয় কাতর প্রার্থনায় যোগিরাজ তাঁহাকে কৃপা করেন। বাবা শান্তিনাথজী এই বৎসরই দীক্ষা প্রাপ্ত হন। সেই বৎসরই আরও কয়েকটি ভক্ত তাঁহার কৃপালাভ করেন। ক্রমে প্রতি বৎসরেই ২০ জন কি ২৫ জন করিয়া ভক্ত তাঁহার কৃপা লাভ করিতে লাগিলেন।

কতজন যে কত অলৌকিক উপায়ে তাঁহার সন্ধান পাইয়াছেন ও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন, তাহা সবিশেষ বর্ণন করিবার উপায় নাই। অনেকের কথা জানা যায় নাই, অনেকের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিবার অধিকার নাই। তাঁহার নাম ও পরিচয় জানিবার অনেকদিন পূর্ব্বে কেহ কেহ স্বপ্নে তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহার দর্শন লাভের পূর্ব্বে স্বপ্নে তাঁহাব নিকট দীক্ষাও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে তিনি তাঁহার আশ্রিত-গণকে আকর্ষণ করিয়া চরণপ্রান্তে আনিতে লাগিলেন।

একটি বালকের বাড়ী নোয়াখালী জেলার সুদূর পল্লীগ্রামে। বাল্যকাল হইতেই সে ধর্ম্মপ্রাণ। কিন্তু সাধুমহাপুরুষদের বিষয় শ্রবণ করিবার বিশেষ সুযোগ তাহার ঘটে নাই। নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে সে স্বপ্নে বাবাজীর দর্শন লাভ করে এবং তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট ব্যক্তি যে কে, কোথায় থাকেন—কিছুই তাহার জানা নাই। সুতরাং তাঁহাকে জানিবার ও পাঁইবার জন্য তাহার ব্যাকুলতা বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। অনেক দিন পরে ঘটনাক্রমে ফেণী আসিয়া কোন ধর্ম্মবন্ধুর নিকট সেই স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষের বর্ণনা করিলে, তিনি বলিলেন যে, সম্ভবতঃ ইনি গোরক্ষপুরের বাবা গম্ভীরনাথ। ফেণীতে তাঁহার কতিপয় শিষ্য ছিলেন। তাহাকে একজন শিষ্যের গৃহে নিয়া বাবাজীর প্রতিকৃতি দেখান হইলে, সে নিঃসংশয় হইল এবং আনন্দে ও উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া পড়িল।

বালকটি নিতান্ত দরিদ্র, যাইবার খরচ বহন করিতেও অসমর্থ, অথচ তীব্র ব্যাকুলতা। ফেণী হইতেই পাথেয় সংগ্রহ করিয়া যাত্রা করিল। তৃতীয় দিন রাত্রি ৩টার সময় গোরক্ষপুর ষ্টেশনে পৌছিয়াই এক্কা করিয়া গোরক্ষনাথ মন্দিরে গিয়া সে দেখে, বাবাজী বারান্দায় খাটুলির উপর বসিয়া আছেন, নিকটে একটি আলো জ্বলিতেছে। প্রণাম করা মাত্রই তিনি এমন ভাবে স্নেহের স্বরে আহ্বান করিয়া তাহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া শয়নাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন যে, তাহার মনে হইল যেন তিনি তাহারই জন্য আলো লইয়া বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন এবং তাহার শয়নাদির বন্দোবস্ত পূর্ব্ব হইতেই ঠিক রাখিয়াছিলেন। গুরুদেবের তিরোধানের পরে তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন পূর্ব্বক হিমালয়ে যোগসাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

ময়মনসিংহ নিবাসী একটি বালক একজন বাঙালী যোগী-পুরুষের অনুগত ছিল, এবং তাঁহার শিষ্যদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিয়া মিশিয়া ধর্ম্মালোচনা ও সাধন ভজন করিত। ধ্যানাভ্যাস করিতে করিতে তাহার হৃদয়পটে একটি অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ব মহাপুরুষের মূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। এরূপ কোন মহাপুরুষ জীবিত আছেন কিনা তাহাও তাহার জানা ছিল না। কিন্তু ঘটনাক্রমে বাবাজীর জনৈক শিষ্যের গৃহে তাহার স্বপ্নদৃষ্ট মূর্ত্তির ফটো দেখিয়া সে বিস্ময়ান্বিত হইল। যখন সে অবগত হইল যে ইনি গোরক্ষপুরের মহাপুরুষ, তখন তাঁহার চরণাশ্রয়ের

জন্য সে ব্যাকুল হইল এবং তাঁহার দু' এক জন শিষ্যের সন্ধান পাইয়া তাঁহাদের প্রতিও অনুরক্ত হইল। নিতান্ত বালক বলিয়া একাকী গোরক্ষপুর যাওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিছু কাল অপেক্ষা করার পর, বাবাজীর কৃপাপ্রার্থী তাহার একজন শিক্ষকের সহিত সে গোরক্ষপুরে গমন করিয়া অভীষ্ট মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করে। এ বালকটিও গুরুদেবের তিরোধানান্তে সংসারের সংস্রব ত্যাগ করিয়া সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

কুমিল্লার একজন ডাক্তার স্বপ্নযোগে দেখিলেন যে, তিনি একটী নূতন স্থানে গমন করিয়াছেন, এবং সেখানে একজন মহাপুরুষ বিশেষ স্নেহের সহিত তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। সেই স্বপ্নাবস্থায় তাঁহার দীক্ষালাভ হইল। সেই মহাপুরুষ কে এবং কোথায় অবস্থান করেন ও কি ভাবে তাঁহার সাক্ষাৎলাভ হইতে পারে, তাহা চিন্তা করিতে করিতে তিনি বিশেষ অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের একজন শিষ্য তাঁহার ধর্ম্মবন্ধু ছিলেন। তিনি একদিন ঐ ডাক্তারের বাসায় আসিয়া তাঁহার অস্বস্থভাব দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি তাঁহার নিকট স্বপ্নের বিষয় বিবৃত করিলেন। বন্ধুটী তখন তাঁহাকে বলিলেন যে, সম্ভবতঃ ইনি গোরক্ষপুরের মহাত্মা বাবা গম্ভীরনাথ হইবেন, আপনি তাঁহার নিকট গমন করুন। কিন্তু তাঁহার হাতে টাকা না থাকায় তিনি যাওয়ার কোন সুবিধা দেখিতেছিলেন না। হঠাৎ

অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার সপরিবারে গোরক্ষপুরে গমনের উপযুক্ত পরিমাণ টাকা একদিনেই লাভ হইল। তিনি গোরক্ষপুর গমন পূর্ব্বক আশ্রমে পৌছিয়া দেখেন যে, স্থানটী তাঁহার পরিচিত, ইহা তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট স্থান। দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি বাবাজীর নিকট স্বপ্নের কথা বলায়, বাবাজী মৃদুভাবে বলিলেন—'তোমার সংস্কার ছিল, তোমার সহিত আমার পূর্ব্বের সম্বন্ধ ছিল।'

একটী ভক্ত হবিগঞ্জে সেরেস্তাদারী করিতেন। গোস্বামী মহাশয়ের জনৈক শিষ্যের পত্র লইয়া তিনি দীক্ষালাভের উদ্দেশ্যে গোরক্ষপুরে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে গয়াতে তিনি বাবাজীর দর্শনলাভ করেন। গোরক্ষপুরে পৌছিয়া তিনি দেখেন যে, ইহা তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট মূর্ত্তি। গুরুদেব কৃপা করিয়া পূর্ব্বেই তাঁহাকে দর্শনদান করিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার অহেতুকী দয়ার কথা চিন্তা করিতে করিতে তিনি ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

শ্রীযুত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার এক ভাগিনেয়ীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"শ্রীমান্ হরেন্দ্র যখন দীক্ষা গ্রহণ করিতে তাহার স্ত্রী ও ভগ্নী শ্রীমতী কিরণকে নিয়া গোরক্ষপুরে যায়, তখন আমার বড় ভাগিনেয়ী শ্রীমতী হিরণ্ময়ী দেবী দীক্ষা গ্রহণ করিতে যাইতে পারে নাই। ইহাতে হিরণের খুব ক্লেশ হইয়াছিল। শ্রীমান্ হরেন্দ্র দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলে একদিন ভোরে হিরণ

প্রফুল্ল হইয়া হরেন্দ্রকে বলিল,—'গতরাত্রে এক সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়াছি।' হরেন্দ্র বলিল 'কি দেখেছিস ?' হিরণ বলিল, 'স্বপ্নে দেখিলাম আমি গঙ্গাপারে একটী পর্ণকুটিরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সে স্থানে মামাদের গুরু শ্রীমৎ গোস্বামী দেব রহিয়াছেন এবং অপর একখানা আসন পাতা রহিয়াছে। গোঁসাইজী আমাকে দেখিয়া বলিলেন "কি চাও ?" আমি বলিলাম "আমি আপনার কাছে দীক্ষা চাই।" তিনি বলিলেন "আমি তোমার গুরু নই, বাবা গম্ভীরনাথ তোমাকে দীক্ষা দিবেন ; তিনি পায়খানায় গিয়াছেন, এখনি আসিবেন ; আমি তাঁহাকে বলিয়া দিব।" বাবা আসিলে গোস্বামী মহাশয় বলিয়া দিলেন এবং আমার দীক্ষা হইল।' শ্রীমান্ হরেন্দ্র ইহা শুনিয়া বাবার একখানা ফটো আনিয়া দেখাইল এবং বলিল 'দেখ্‌তো, যে মহাপুরুষকে দেখিয়াছিস, তাঁহার চেহারা কি এইরূপ ?' হিরণ বলিল—'হাঁ, ইনিই সেই।' সময়ান্তরে যখন বাবার নিকট হিরণ সাধন পাইল, তখন 'নাম' পাইয়া বলিয়াছিল, আমি স্বপ্নে বাবার নিকট যে 'নাম' পাইয়াছিলাম, এই 'নাম'ও সেই 'নাম'।"

শ্রদ্ধাস্পদ মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয় লিখিয়াছেন,—"আমার একটি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের পিতা তাঁহাকে কোনও একজন বিশিষ্ট সাধুর নিকট দীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এই সময়ে উক্ত যুবকটি স্বপ্নে এক সাধুমূর্ত্তি দেখিলেন, তিনি পিতৃ-নির্দ্দিষ্ট সাধু নহেন। পরিশেষে বাবা

গম্ভীরনাথের দর্শন পাইয়া যুবক বলিলেন,—তিনি স্বপ্নে ইঁহাকেই দেখিয়াছেন। তাঁহার নিকট দীক্ষা পাইলেন। এই ঘটনায় পিতা রুষ্ট হইবেন ভাবিয়া যুবক ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু এই দীক্ষার কথা শুনিয়া তিনি কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না। এগুলি 'মিরাকেল' নয়। মানুষের মন-রাজ্যটা আমাদের নিকট যেরূপ অন্ধকার, সকলের নিকট সেরূপ নয়। যাঁহাদের চিত্ত সংযত, মন রাজ্যের উপর তাঁদের অনেক ক্ষমতা জন্মে।"

একটি মহিলার মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী প্রভৃতি অনেকেই বাবাজীর কৃপালাভ করেন। তাঁহারা ময়মনসিংহে থাকেন এবং ময়মনসিংহ হইতেই গোরক্ষপুরে গিয়াছিলেন। মহিলাটী পতিগৃহে থাকায় এবং যথাসময়ে ময়মনসিংহে আসিতে না পারায় তাঁহাদের সঙ্গে যাইতে পারেন নাই। তাঁহার দীক্ষা-লাভের জন্য বিশেষ ব্যাকুলতা ছিল। তিনি স্বপ্নে বাবাজীকে দর্শন করেন ও তাঁহার কৃপালাভ করেন। তিনি দীক্ষামন্ত্র তাঁহার মাতাকে জানাইয়াছিলেন। মা যে মন্ত্র পাইয়াছেন, কন্যাও স্বপ্নে সেই একই মন্ত্র পাইয়াছেন। সৌভাগ্যবতী মহিলাটী কিছুদিন পরেই দেহত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং বাবাজীব সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই।

যোগিরাজ গম্ভীরনাথের বহুসংখ্যক শিষ্য ও শিষ্যা দীক্ষার বহু পূর্ব্বে, এমন কি, তাঁহার সম্বন্ধে কিছু জানিবার বহু পূর্ব্বে, এইরূপ অলৌকিকভাবে তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া তাঁহার প্রতি

আকৃষ্ট হইয়াছেন। অনেকের পক্ষে সেখানে গমনের বন্দোবস্ত পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যরূপে হইয়া গিয়াছে। ইহাতে স্বভাবতঃই মনে হয় যে, বাবাজী তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীকে আবাহন ও আকর্ষণ করিয়া আপনার কৃপায় আপনার কোলে টানিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহাদের জীবন সার্থক করিয়া দিয়াছেন। অথচ সাক্ষাৎ-দর্শনের কালে কখন তিনি ইহার কোন পরিচয় প্রদান করিতেন না। অলৌকিক দর্শন সম্বন্ধে কেহ সাহস করিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি প্রায়শঃ বলিতেন যে 'স্বপ্নত স্বপ্নই, তৎপ্রতি এত মনোযোগ দিবার আবশ্যকতা কি?' দু' একজন ভক্ত নিতান্ত আকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে তাঁহাদিগকে যেন সান্ত্বনা প্রদানের স্বরে তিনি বলিতেন, 'তোমাদের সহিত সম্বন্ধ ছিল' অথবা 'তোমার সংস্কার ছিল'।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার শিষ্যসংখ্যা খুব বেশী হয় নাই, অনুমান একশতের কিছু অধিক হইবে। ঐ সনের পৌষ মাসে তিনি নেত্র-চিকিৎসা উপলক্ষ্য করিয়া কলিকাতায় আসেন। তিনি যতদিন কলিকাতায় ছিলেন, ততদিন প্রায় প্রত্যহ অনেক ধর্ম্ম-পিপাসুকে তিনি শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন। কলিকাতায় অবস্থান কালেই তাঁহার শিষ্যসংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। কলিকাতা হইতে তাঁহার গোরক্ষপুর প্রত্যাবর্ত্তনের পর দলে দলে শিক্ষিত বাঙ্গালী নরনারীগণ গোরক্ষপুর যাইতে থাকেন। যাঁহারা পূর্ব্বে দীক্ষা পাইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার

দর্শন ও চরণস্পর্শ লাভের জন্য যাইতেন, এবং যাঁহারা দীক্ষা পাইতে ইচ্ছুক, তাঁহারা দীক্ষা লাভের জন্য যাইতেন। ১৯১৭ সনে তাঁহার দেহান্ত ঘটে। তখন পর্য্যন্ত এইরূপই চলিয়াছিল এবং তাঁহার শিষ্যসংখ্যা তখন ছয় শতের অধিক হইয়াছিল।

অনেক ভক্ত পিতামাতা তাঁহাদের শিশু-পুত্রকন্যাকেও বাবাজীর নিকট দীক্ষিত করিয়া লইয়াছেন। বাবাজী তাহাদের কাণ ফুঁকিয়া মন্ত্র দিতেন। তাহারা অবশ্যই তখন দীক্ষা-মন্ত্র স্মরণ রাখিতে পারিত না। সেই সব শিশুদের মধ্যে কাহারও কাহারও সম্বন্ধে তিনি বলিতেন যে, সময়ে মন্ত্র আপনা-আপনি স্মৃতিপথে স্ফুরিত হইবে,—"আপ্‌সে ইয়াদ্‌ হো জায়গা," অন্য কাহাকেও স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না। কাহারও কাহারও পিতামাতাকে মন্ত্র স্মরণ করাইয়া দিতে বলিতেন।

তত্ত্বদর্শী যুক্তযোগী মহাপুরুষের নিকট দীক্ষালাভের অধিকার যে বিশেষ সৌভাগ্যের পরিচয়, জন্মান্তরীণ বিশেষ সুকৃতির ফলেই যে এরূপ সৌভাগ্য লাভ হয়, তাহা শাস্ত্র ও জ্ঞানিগণ একবাক্যে ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ দৃষ্টিতে এই অধিকার অনেক ক্ষেত্রে বুঝিতে পারা যায় না। একস্থানে রত্নের খনি আছে, কিন্তু তাহার উপরে অনেক স্তর মৃত্তিকা ও আবর্জ্জনা থাকিতে পারে। সে ক্ষেত্রে সাধারণ দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ মৃত্তিকা ও আবর্জ্জনাই দেখিতে পায়, রত্নের সন্ধান পায় না; কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ ঐ মৃত্তিকা ও

আবর্জ্জনার মধ্যেও এমন সব লক্ষণ আবিষ্কার করেন, যাহাতে তাহার নীচে অবস্থিত রত্নখনির সত্তা সম্বন্ধে তাঁহারা নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। সেইরূপ কোন কোন ব্যক্তির অন্তর্জীবন সমুজ্জ্বল আধ্যাত্মিক অধিকার সম্পন্ন হইলেও, বিশেষ কুপ্রারব্ধবশে তাহাদের বহির্জীবনে এমন কতকগুলি দোষ থাকিতে পারে, যাহা দেখিয়া সাধারণলোক স্বভাবতঃই তাহাদের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকে ; ভোগদ্বারা কুপ্রারব্ধ ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদের অন্তর্জীবনের সমুন্নত আধ্যাত্মিক ভাবসমূহ বহির্জীবনে সদ্‌বৃত্তিরূপে বিকাশ-প্রাপ্ত হইতে বাধা পায়, সুতরাং সাধারণজ্ঞানবিশিষ্ট লোকসকল বাহিরের ব্যবহার দেখিয়াই বিচার করে বলিয়া তাহাদিগকে ততদিন চিনিতে পারে না। অন্যদিকে, বহির্জীবনে সাধুবৃত্তি-সম্পন্ন ও শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন লোকের অন্তরেও অধ্যাত্মভাববিরোধী এমন কতকগুলি সংস্কার থাকিতে পারে, যাহাতে সাধারণ লোকের নিকট সাধু বলিয়া পরিচিত হইলেও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তাহারা নিম্নস্তরেই অবস্থিত। এ সম্বন্ধে পৌরাণিক ও আধুনিক দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে ও লোকসমাজে বিরল নহে। অতএব আধ্যাত্মিক জীবনে কে কোন্ স্তরে অবস্থিত; তাহা সাধারণ দৃষ্টিতে বহির্জীবনের আচার, কর্ম্ম, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি দেখিয়া সিদ্ধান্ত করা সকল ক্ষেত্রে নিরাপদ নহে। আধ্যাত্মিক জীবনের বিশেজ্ঞগণ—তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ—লোকের অন্তর্জীবন দর্শন করিতে পারেন, বহির্জীবনের আচারব্যবহার

অন্তর্জীবনের অনুরূপ না হইলেও তাহার মধ্যে অন্তর্জীবনের যে ছাপ পড়ে, তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রত্যেক জীবনের বিশেষত্ব অনুধাবন করিতে পারেন। ধর্ম্মার্থিগণের অন্তর্জীবনের আধ্যাত্মিক অবস্থা বিচার করিয়াই লোকশিক্ষক মহাপুরুষগণ তাহাদিগকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন, এবং তাহাদের অধিকারানুরূপ সাধন উপদেশ করেন।

যোগিরাজ দীক্ষাপ্রদান কার্য্যে ব্রতী হইয়াও প্রথম প্রথম কোন কোন দীক্ষার্থীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কিন্তু কোন প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করিতেই তাঁহার প্রেমপূর্ণ প্রাণে যেন বেদনা অনুভূত হইত। পরবর্ত্তীকালে তিনি কোন দীক্ষার্থীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় নাই। কিন্তু কেহ কেহ প্রাণে অশান্তি ভোগ করিয়া দীক্ষা গ্রহণের জন্য তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াও দীক্ষাপ্রাপ্তির প্রার্থনা তাঁহাকে জানাইতে সমর্থ হয় নাই, অন্যান্য কথা বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, ইহা দেখা গিয়াছে। এই সব দেখিয়া মনে হইত যে যাহারা তাঁহার নিকট দীক্ষালাভ করিবার অধিকারী, তাহারাই তাঁহার নিকট দীক্ষার প্রার্থনা লইয়া উপস্থিত হইতে সক্ষম হইত। যাহারা প্রত্যাখ্যাত হইবার যোগ্য, তাহারা তাঁহার নিকট দীক্ষার বিষয় উল্লেখ করিতেই সমর্থ হইত না। তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, তিনি দীক্ষার্থীদের অধিকার নিরূপণ কিরূপে করেন। তিনি লৌকিক ভাবে উত্তর করিলেন, যাহারা এত

দূর দেশ হইতে, এত অর্থব্যয় করিয়া ও এত ক্লেশস্বীকার করিয়া দীক্ষার জন্য আসিয়া থাকে, এবং এরূপ ব্যাকুলতা ও প্রেমের সঙ্গে দীক্ষাপ্রার্থনা করে, তাহাদিগকে কিরূপে প্রত্যাখ্যান করা যায়? ধর্ম্মের প্রতি হৃদয়ের টান না থাকিলে কি এ ভাবে আসে? যাঁহারা পূর্ব্বে স্বপ্নে দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন, এরূপ প্রশ্নের উত্তরে প্রায়ই তিনি নীরব থাকিতেন। দু' একজনকে বলিয়াছেন যে, 'আমার সহিত তোমার পূর্ব্বের সম্বন্ধ ছিল'। এই সম্বন্ধ কি প্রকার, তাহা অবশ্যই তিনি ব্যাখ্যা করেন নাই।

ছয় শতের অধিক বাঙ্গালীকে তিনি দীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক কৃতার্থ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেবলমাত্র দুইজনকে তিনি সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস-জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা কিরূপ উচ্চ ছিল, এবং নিজের জীবনে তিনি সেই সন্ন্যাস-জীবনের মর্য্যাদা কি ভাবে রক্ষা করিতেন, তাহার আভাষ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। অধিকার-নিরপেক্ষভাবে দলে দলে লোক সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসের আদর্শ কিরূপ ক্ষুণ্ণ করিয়াছে এবং হিন্দুসমাজের পরমগৌরবাস্পদ সন্ন্যাসাশ্রমকে কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে সর্ব্বদাই তিনি সজাগ ছিলেন। এই হেতু একদিকে যেমন তিনি গৃহস্থদিগকে সন্ন্যাসের প্রতি ও সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইতে উপদেশ দিতেন, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ সন্ন্যাসীদের সহিত বেশী

মেশামিশি করিতে নিষেধ করিতেন; কারণ বর্ত্তমান সময়ের সাধুবেশীদের সঙ্গে বেশী মেশামিশি করিলে সন্ন্যাসের প্রতিই অশ্রদ্ধা উৎপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা। কোন গৃহস্থ সংসার ত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবার প্রার্থনা জানাইলে তিনি বলিতেন যে, গার্হস্থ্যাশ্রম পরিত্যাগ করিলেই সন্ন্যাস-জীবন লাভ করা যায় না, সন্ন্যাসের বেশ গ্রহণ করিয়াও অনেকে কিরূপ বহির্মুখ, কলহপরায়ণ, খলস্বভাব হয়, তাহা ত দেখিতেছ, ইহা অপেক্ষা গৃহস্থ থাকিয়া সংসারের বিহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলে ও অবসরমত ভগবানের নাম করিলে অধিকতর কল্যাণ লাভ হয়; আধ্যাত্মিক উন্নতি গার্হস্থ্যের উপরও নির্ভর করে না, সন্ন্যাসের উপরও নির্ভর করে না; সন্ন্যাসী হইয়াও সাধন-ভজনে শিথিল হইলে মুক্তিলাভ করা যায় না, আবার গৃহস্থ-জীবনেও ভগবানের সেবাবোধে কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিলে, এবং অবসর সময় ঐকান্তিক অনুরাগের সহিত সাধন-ভজনে নিরত থাকিলে একজন্মেই মুক্ত হওয়া যায়; যাহাদের সন্ন্যাসের উপযুক্ত উত্তম সংস্কার আছে, তাহাদেরই সন্ন্যাসী হওয়া উচিত।

সন্ন্যাসের প্রতি আগ্রহ সম্পন্ন কয়েকজন শিষ্যকে এই প্রকার উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক তিনি নিবৃত্ত করিয়াছেন এবং গার্হস্থ্যোচিত ধর্ম্মে শ্রদ্ধাসম্পন্ন করিয়াছেন। পিতামাতা ভাই ভগিনী প্রভৃতি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের উদ্দেশ্যে একটি বালক কয়েক মাস সর্ব্বদা বাবাজীর সঙ্গে অবস্থান পূর্ব্বক তাঁহার সেবা করিয়াছিল। গুরুসেবা ও নাম

জপই কেবলমাত্র তাহার কার্য্য ছিল। সে বলিয়াছে যে, তখন প্রতি দিন ১৯।২০ ঘণ্টা তাহার সাধন চলিত। পিতামাতা অবশ্যই তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ করিতেছিলেন। কয়েকমাস পরে বুঝাইয়া শুনাইয়া নানা প্রকার উপদেশ দ্বারা তাহার মনের তাৎকালিক গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া, বাবাজী তাহাকে গৃহে পাঠাইয়া দেন এবং পড়াশুনা করিতে, পিতামাতার সেবা করিতে ও পিতামাতার আদেশানুসারে বিবাহ করিতে উপদেশ দেন। আর একজন বিবাহিত যুবক সংসারে নিতান্ত বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া নিত্য-নিরন্তর সাধনে ডুবিয়া থাকিবার উদ্দেশ্যে অনেকবার বাবাজীর নিকট সন্ন্যাস প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং একবার সন্ন্যাসের জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়া গৃহে হইতেও বহির্গত হইয়াছিলেন। কিন্তু বাবাজী তাঁহার সন্ন্যাস অনুমোদন করিলেন না, এবং নানারূপ উপদেশ দিয়া তাঁহাকে গৃহী সাধু হইতে আদেশ করিলেন। এই প্রকার আরও অনেকে সন্ন্যাসের জন্য সাগ্রহ প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কাহাকেও সন্ন্যাস প্রদান করেন নাই।

তিনি যে দুইজন মাত্র শিষ্যকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন বাল্যকাল হইতেই অনন্যসাধারণ। 'আশিষ্ঠো দ্রঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠো মেধাবী'—উপনিষদুক্ত এই সব লক্ষণ তাঁহাদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত ছিল। বাল্যকাল হইতেই

তাঁহাদের শরীর দৃঢ় সুস্থ ও সবল ছিল, অনুশীলন দ্বারা তাঁহারা তাহার প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। শীতাতপবর্ষা, অনশন, অর্দ্ধাশন প্রভৃতি সহ্য করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের অসাধারণ ছিল। বাল্যকাল হইতেই তাঁহাদের মন ভোগসুখে বিমুখ, সংসারে উদাসীন, বহুলোকসঙ্গে অনিচ্ছুক ছিল। তাঁহাদের সাহস দুর্জ্জয় ছিল এবং ব্রহ্মচর্য্য অটুট ছিল। তাঁহাদের শরীর ও মন সর্ব্বাংশে আদর্শ-সন্ন্যাস-জীবন-যাপনের উপযুক্ত হইয়াই গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদিগকেও বাবাজী একেবারেই সন্ন্যাসের দীক্ষা প্রদান করেন নাই। বাবা শান্তিনাথজী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে দীক্ষালাভ করেন। তৎপর অনেক পরীক্ষার ভিতর দিয়া তাঁহাকে যাইতে হইয়াছে। অনেক কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরও বাবাজী তাঁহাকে বিবাহ করিতে, পড়াশুনা করিতে ও সংসারে থাকিয়া পিতামাতার সেবা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ গুরুদেবের এই প্রকার আদেশ তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতম পরীক্ষা হইয়াছিল। কিন্তু সে অবস্থাতেও তিনি তাঁহার তীব্র ঐকান্তিক মুমুক্ষুতার এমন পরিচয় প্রদান করিলেন যে, গুরুদেব তাঁহার আদেশ প্রত্যাহার করিলেন। তখন তিনি কলেজে পড়াশুনার ভিতর থাকিয়াও ১৮।১৯ ঘন্টা গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিতেন ও গুরুচিন্তা করিতেন। অতঃপর ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে গুরুজী তাঁহাকে সন্ন্যাস প্রদান করিয়া হৃষীকেশে পাঠাইয়া দেন। তদবধি তিনি আদর্শ-সন্ন্যাসীর

জীবন যাপন করিয়া বেদান্তানুযায়ী সাধনে নিমজ্জিত হন। এরূপ একনিষ্ঠ নিয়তাভ্যাসী সাধক ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। তিনি ইংরাজী বাংলা হিন্দী ও সংস্কৃত কয়েকখানা দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১৯৪৯ সালের ২৮ নবেম্বর দেহত্যাগ করেন।

বাবা নিবৃত্তিনাথজী ১৯১০ খৃষ্টাব্দে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁহাকেও বাবাজী গৃহে থাকিয়াই সাধন ভজন করিতে আদেশ করেন, এবং তিনিও গৃহের বহিঃপ্রাঙ্গণে ক্ষুদ্র একটি পর্ণকুটীরে ব্রহ্মচারী তপস্বীর ভাবে জীবন যাপন করিয়া নিত্যনিরন্তর সাধন করিতে থাকেন। কয়েক বৎসর পরে তাঁহার পিতামাতাও গোরক্ষপুর গিয়া বাবাজীর নিকট দীক্ষা লাভ করেন। সেই সময় কথাপ্রসঙ্গে বাবাজী তাঁহার পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি তাঁহার পুত্রকে বিবাহ করাইতে ইচ্ছুক কিনা। পিতা বলিলেন যে, 'আমি উহাকে আপনার চরণেই সমর্পণ করিয়াছি'। তৎপরও অনেকদিন বাবাজী তাঁহাকে পিতা-মাতার সেবা করিতে আদেশ দিয়া গৃহে রাখেন। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে, তিরোধানের কয়েক মাস মাত্র পূর্ব্বে, বাবাজী তাঁহাকে সন্ন্যাস প্রদান করেন।

একজন ধর্ম্মপিপাসু দীক্ষা প্রার্থী হইয়া যোগিরাজের শরণাপন্ন হন। তাঁহার সহধর্ম্মিণীও দীক্ষালাভের নিমিত্ত অতিশয় ব্যাকুল ছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। অভীষ্ট গুরুর চরণপ্রান্তে উপনীত হওয়ার সুযোগ হইতে তিনি বঞ্চিত হন। শোকার্ত্ত স্বামী গুরুসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া

নিবেদন করেন যে, স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে গুরুকৃপা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে, ইহা তাহাদের উভয়েরই প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল, অপূর্ণ বাসনা লইয়া স্ত্রী ইহলোক হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি কাতরপ্রাণে স্ত্রীর জন্য দীক্ষা প্রার্থনা করেন। যোগিরাজ প্রথমে ধীরভাবে উত্তর দেন যে, প্রেতাত্মাকে দীক্ষা দেওয়া কিরূপে সম্ভব? যোগিরাজের পক্ষে যে ইহা অসম্ভব নয় সে বিশ্বাস দীক্ষার্থীর ছিল। স্বামীর ঐকান্তিক ব্যাকুলতায় যোগিরাজের অনুকম্পা হয়। দীক্ষাকালে তিনি দুইখানা আসন স্থাপন করিতে নির্দ্দেশ দেন। দীক্ষার্থী স্বামী গুরুদেরের সম্মুখে একখানা আসনে উপবেশন করিলে, তিনি তাঁহাকে চক্ষু মুদিত করিয়া বসিতে আদেশ করেন। দীক্ষা লাভের সঙ্গে সঙ্গে শিষ্যের অনুভব হইল যে, তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার পত্নীও দীক্ষা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। গুরুদেবের অসাধারণ করুণায় তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হইল। দীক্ষান্তে পুনরায় আপনার অনুভূতির উপর বিশ্বাস সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত তিনি বিনীতভাবে প্রশ্ন করিলেন, তাঁহার স্ত্রীর দীক্ষালাভ হইয়াছে কি না। গুরুদেব মৃদুস্বরে উত্তর দিলেন—হাঁ। অহেতুক কৃপাসিন্ধু গুরুদেব কৃপা করিয়া প্রেতাত্মাকেও আকর্ষণ পূর্ব্বক আপনার চরণপ্রান্তে আনিয়া দীক্ষাদান করিতেন, ইহা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হৃদয় বিস্ময়ে ভক্তিতে কৃতজ্ঞতায় বিহ্বল হইয়া পড়িল।

ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ

ছাত্রাবস্থাতেই তাঁহার এক শিক্ষকের সহিত গোরক্ষপুর আসিয়া যোগিরাজের কৃপালাভ করেন। গুরুদেবের মহাসমাধির পরে তিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করেন এবং দেশ ও সমাজের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া এক বিশাল সংঘ গঠন করেন। যোগিরাজের তিরোধানের পর তাঁহার আরো কতিপয় ব্রহ্মচর্য্যব্রতী শিষ্য সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

কলিকাতায় একমাস

১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাবা গম্ভীরনাথ নেত্র-চিকিৎসা উপলক্ষে বাঙ্গালার কেন্দ্রভূমি মহানগরী কলিকাতায় শুভ-পদার্পণ করিয়া প্রায় এক মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার একটি চক্ষুতে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইতেছিল। যাঁহার নিকট জীবন ও মৃত্যু সমান; স্বাস্থ্য ও ব্যাধি, সম্পদ্ ও বিপদ, কর্ম্ম ও বিশ্রাম সকল অবস্থাতেই সমান ভাবে ব্রহ্মভূত হইয়া অবস্থিতি যাঁহার স্বভাবে পরিণত, যিনি দেহে থাকিয়াও বিদেহ, সংসারে থাকিয়াও নির্ম্মুক্ত, কর্ম্মকোলাহলের ভিতরে থাকিয়াও নিষ্কর্ম্মা ও নীরব, বিশ্বজগৎ যাঁহার জাগ্রতদৃষ্টির নিকটে স্বপ্নের ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহার নিজের কাছে অবশ্য এই প্রয়োজনীয়তা-শব্দের বিশেষ কোন অর্থ নাই। যাঁহার দৃষ্টি সংসারের সকল ব্যাপারের অন্তর্নিহিত সত্যের দিকে সর্ব্বাবস্থায় উন্মুক্ত, দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যে সকল প্রকার ব্যবধান তিরোহিত, যিনি জ্ঞানাঞ্জনশলাকাদ্বারা সত্য-দর্শন-প্রার্থীদের চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিবার ব্রত গ্রহণ করিয়া অবিদ্যান্ধ মনুষ্যদিগের নেত্র-চিকিৎসক রূপে সংসারে বিচরণ করিতেছেন, তাঁহার চক্ষুতে ব্যাধি, তাঁহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, জড়ধাতু-নির্ম্মিত অস্ত্রের সাহায্যে তাঁহার দৃষ্টিশক্তির আবরণ বিনষ্ট করিয়া দিতে হইবে, ইহা

আপাততঃ নিতান্তই বিস্ময়কর। যিনি সামান্য একটু ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিলেই সর্ব্বপ্রকার ব্যধি হইতে দেহকে মুক্ত রাখিতে পারেন, তাঁহার শরীর ব্যাধিগ্রস্ত কেন হয়, এরূপ প্রশ্ন দেহাভিমানীদের মনে স্বভাবতই ওঠে। কিন্তু মায়িক দেহ মায়ার নিয়মেই চালিত হয়, ভগবানের জগতে জীবদেহ ধারণ করিয়া যতদিন বিচরণ করা যায়, ততদিন মায়াধীশ ভগবানের বিধান মানিয়াই চলিতে হয়। ব্যবহারিক জগতে অজ্ঞানীও তাঁহার বিধান অনুসারেই চলে, জ্ঞানীও তাঁহার বিধান অনুসারেই চলেন। পার্থক্য এই যে, অজ্ঞানী তাহাতে বিমোহিত হইয়া চলে, সে এই মায়ার জগতেই এক অবস্থা অমঙ্গলজনক ও দুঃখপ্রদ বোধে পরিহার ও অন্য ঈপ্সিততর অবস্থা লাভ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয়, এবং তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্যাপারসমূহ সংঘটিত হইতেছে দেখিয়া নিরর্থক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করে ; কিন্তু জ্ঞানী তাহাতে বিন্দুমাত্রও বিমোহিত ও বিকারপ্রাপ্ত হন না, এই মায়িক জগতের ভিতরে কোন অবস্থাকে বাঞ্ছনীয় এবং কোন অবস্থাকে অবাঞ্ছনীয় তিনি মনে করেন না, এক অবস্থা ছাড়িয়া অন্য অবস্থা পাইবার জন্য তিনি উৎকণ্ঠিত হন না, তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জগতে কোন ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে বলিয়া তিনি মনে করেন না, সকল ব্যাপারেই তিনি পরম আনন্দময়, পরম মঙ্গলময় ভগবানের ইচ্ছা ও শক্তির অভিব্যক্তি, তাঁহার মায়ার খেলা দর্শন করেন। ঈশ্বরেচ্ছা ও তাঁহার নিজের ইচ্ছার মধ্যে কোন প্রকার

পার্থক্য দেখেন না। তিনি পারমার্থিক দৃষ্টিতে সবই মিথ্যা বলিয়া জানেন, এবং ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সকলই ভগবানের লীলা বলিয়া দর্শন ও সম্ভোগ করেন।

এই ভাবে জগতে বিচরণ করেন বলিয়া, তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ ব্যবহারিক বিষয়ে সাধারণতঃ প্রাকৃত মনুষ্যের মতই ব্যবহার করিয়া থাকেন, সাধারণ সচ্চরিত্র ধর্ম্মপরায়ণ বিচারশীল ব্যক্তিগণ যে ক্ষেত্রে যেরূপ আচরণ করেন এবং যেরূপ আচরণ চতুপার্শ্ববর্ত্তী মায়াধীন জনমণ্ডলী অনুসরণ করিয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারে, তাঁহারাও লোকসমাজে তদ্রূপ আচরণই করিয়া থাকেন। তাঁহারা সাধারণ কর্ম্মক্ষেত্রে সাধারণ লোকের মত ব্যবহার করিয়াও এবং লৌকিক সুখদুঃখ ভোগ করিয়াও জ্ঞান প্রভাবে অসাধারণ ভাবে অবস্থান করেন ও নিত্যানন্দ সম্ভোগ করেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষগণের ব্যবহারিক জীবন যে ভাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, আদর্শ মহাপুরুষদের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, তাঁহাদের লৌকিক জীবন সেই ভাবেই পরিচালিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥

—"হে ভরতবংশোদ্ভব অর্জ্জুন ! অজ্ঞানিগণ কর্ম্মে আসক্ত হইয়া যেরূপ কাম্য কর্ম্ম করিয়া থাকে, জ্ঞানী পুরুষ লোক-সমাজকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার উদ্দেশ্যে অনাসক্তভাবে সেইরূপই কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। জ্ঞানী ব্যক্তি স্বীয় আচরণ বা উপদেশ দ্বারা কর্ম্মে আসক্তি-বিশিষ্ট অজ্ঞ জনমণ্ডলীর বুদ্ধিকে কখনও তাহাদের স্বভাবোচিত কর্ম্মের পথ হইতে বিচলিত করিবেন না, বরং লৌকিক দৃষ্টিতে যে সব কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, স্বয়ং সেই সব কর্ম্ম যথাবিধি সম্পন্ন করিয়া তাহাদিগকে তদনুরূপ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবেন।"

মহাযোগীর সকল লৌকিক কর্ম্ম এই নীতি অনুসারেই সম্পাদিত হইত। যেমন তিনি নিজে কখনও কোন কর্ম্মের সৃষ্টি করিতেন না, নিজে সংকল্প করিয়া কোনরূপ নূতন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না, তেমনই আবার তাঁহার লৌকিক জীবনের পথে যখন যে কর্ম্ম আপনা-আপনি আসিয়া উপস্থিত হইত, দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় লৌকিক হিসাবে যে কর্ম্ম তাঁহার পক্ষে ধর্ম্মবিধিসঙ্গত কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত, তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে নিষ্প্রয়োজন ও অর্থবিহীন হইলেও তাহা সম্পাদন করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। এবং কোনরূপ যোগৈশ্বর্য্যের প্রকাশ না করিয়া একজন সাধারণ বিচারবান্ সাধুব্যক্তির ন্যায় যথাবিধি তাহা সম্পাদন করিতেন।

এই নীতির অনুসরণেই তিনি কোন প্রকার শারীরিক ব্যাধিদ্বারা আক্রান্ত হইলে সুচিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ

করিতেন এবং চিকিৎসকের উপদেশানুসারে চলিতে ও ঔষধ সেবন করিতে আপত্তি করিতেন না। এই নীতি অনুসারেই মন্দিরের সম্পত্তি নিয়া কোন মামলা মোকদ্দমার কারণ উপস্থিত হইলে তিনি কর্ম্মচারীদিগকে উকীল-মোক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করিতে বলিতেন, কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা উপস্থিত হইলে পুলিসের সহায়তা গ্রহণ করিতে বলিতেন। কোন শিষ্য বা ভক্ত নিজের বা আত্মীয়-স্বজনের বিশেষ কোন পীড়া উপলক্ষ্যে নিতান্ত চিন্তাযুক্ত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, তিনি দু' এক কথায় সমবেদনা প্রকাশ করিয়া সুচিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে উপদেশ দিতেন। কোন শিষ্য কোনরূপ বিপদে পড়িয়া তাঁহাকে জানাইলে তিনি তাঁহাকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য যথোচিত উপায় অবলম্বন ও পুরুষকার প্রয়োগ করিতে বলিতেন। অনেক ভক্ত ও শিষ্য এরূপ সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় তাঁহাকে নিজেদের অবস্থার বিষয় জানাইবার পর কখন কখন তাঁহার উপদেশানুসারে সামান্যরূপ পুরুষকার প্রয়োগ করিয়াই অপ্রত্যাশিত ভাবে বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের সুদৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে, ইহা বাবাজীর কৃপারই ফল। কিন্তু তাঁহার আচরণে এমন কিছু লক্ষিত হইত না, যাহাতে তাঁহার সংকল্প প্রভাবে কিছু ঘটিতেছে বলিয়া মনে করা যায়।

একবার তিনি অসুস্থ হইয়া পনর-ষোল দিন শয্যাশায়ী ছিলেন। ডাক্তারেরা চিকিৎসা করিতেছিলেন। তিনি

বালকের ন্যায় ডাক্তারদের আদেশ ও সেবকদের পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইয়া অবস্থান করিতেন ও ঔষধাদি সেবন করিতেন। তাঁহার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া ভক্ত সেবকগণ প্রাণে কষ্ট অনুভব করিতেন। একদিন কালীনাথ ব্রহ্মচারী কাতর প্রাণে তাঁহার নিকট নিবেদন করিলেন, "বাবা, আপনি ত ইচ্ছা করিয়াই এই কষ্ট ভুগিতেছেন, আপনার এই রোগযন্ত্রণা দেখিয়া আমাদের প্রাণে বড়ই যন্ত্রণা বোধ হইতেছে, আপনি একটু ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করিয়া রোগটাকে তাড়াইয়া দেন,"। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন "মৈঁ ভগবানকী করনী পলট্ দেঙ্গে ?"

১৯১৪ সনের ডিসেম্বর মাসে যখন দেখা গেল যে, বাবাজীর একটি চক্ষু বিশেষভাবে রোগাক্রান্ত হইয়াছে এবং চিকিৎসা-শাস্ত্রের মতে অতি শীঘ্র তাহাতে অস্ত্রোপচার আবশ্যক, তখন গোরক্ষপুরে উপস্থিত শিষ্যসেবকগণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। হয়ত তাহাদের আকর্ষণই তাঁহার কলিকাতা গমনের মুখ্য হেতু। স্বীয় নেত্রচিকিৎসার ব্যপদেশে তিনি বহুশত বালক-বৃদ্ধ-পুরুষ-নারীর নেত্র চিকিৎসা করিতে চলিলেন, তাহাদের অবিদ্যাবরণ উন্মোচিত করিয়া জ্ঞাননেত্রের নির্ম্মল দৃষ্টি প্রস্ফুটিত করিয়া দিতে চলিলেন, তাঁহার কলিকাতায় অবস্থানের সময় যাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদেরই নিকট ইহা প্রতীত হইয়াছে যে, তাঁহার চিকিৎসিত হওয়াটা ছিল যেন গৌণ ব্যাপার। তাঁহাদের বোধ হইত যেন তিনি বঙ্গমাতার

ক্রোড়দেশে আসন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার দরিদ্র রোগক্লিষ্ট ক্ষুধাপীড়িত ধর্ম্মার্থী পুত্রকন্যাগণকে হিন্দুজীবনের আদর্শ প্রদর্শন করিয়া ও ধর্ম্মামৃত প্রদান করিয়া স্বকীয় বিশ্বপ্রেমময় প্রাণে আশ্রয় দিতেই এখানে উপস্থিত হইয়াছেন।

তিনি যখন কলিকাতা আসিতে সম্মতি প্রদান করিলেন, তখনই উপস্থিত সেবকগণ তাঁহার শিষ্যদের নিকট পত্র টেলিগ্রাম প্রভৃতি প্রেরণ করিলেন। সকলে তাঁহার অসুস্থতার জন্য কিয়ৎপরিমাণে উদ্বিগ্ন হইলেও বহুল পরিমাণে আনন্দেই মাতোয়ারা হইয়া উঠিল। তাঁহার শিষ্যসংখ্যা তখন বেশী নয়, এবং তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই অত্যন্ত দরিদ্র। তথাপি তাঁহারা সানন্দচিত্তে আপনাদের মধ্যে চাঁদা করিয়া কলিকাতা যাত্রার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বিধি ব্যবস্থা করিতে ব্রতী হইলেন।

ইতিমধ্যে হবিগঞ্জের প্রসিদ্ধ উকীল, বাবাজীর শিষ্য, উমেশচন্দ্র দাস মহাশয় এক রাত্রে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিলেন। এই স্বপ্ন দর্শন করিয়াই তাঁহার সুদৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, গুরুমহারাজ কলিকাতা যাত্রার ও চিকিৎসা প্রভৃতির সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন। এ বিষয়ে তাঁহার বিন্দুমাত্রও দ্বিধাবোধ হইল না। তাঁহার তখন অর্থকৃচ্ছতা ছিল। কিন্তু অন্তর্য্যামী প্রভু যখন প্রাণে প্রেরণা দান করেন, তখন হিসাব নিকাশের অবসর থাকে না, ভবিষ্যৎ চিন্তা করিবারও প্রবৃত্তি থাকে না, নিজের উপর নিজের কোন

কর্তৃত্বও থাকে না। দাস মহাশয় এই প্রেরণার উন্মাদনায় তৎক্ষণাৎ কতক পরিমাণ টাকা সংগ্রহ করিয়া গোরক্ষপুর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আরও কয়েকজন শিষ্য গোরক্ষপুরে গমন করিয়াছিলেন।

তখন পৌষের প্রথম ভাগ। বাবাজী হিন্দু সাধারণের চিরন্তনী রীতি অনুসারে জ্যোতিষশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ডাকাইয়া যাত্রার শুভদিন নির্দ্ধারিত করিলেন, যাত্রার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ও সাধুদিগকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা প্রদান করিলেন এবং দরিদ্রনারায়ণদিগকে অর্থ বিতরণ করিলেন; যাত্রার সময় পূর্ণকুম্ভ প্রভৃতি মঙ্গলকর দ্রব্য সম্মুখে রাখিয়া যথাবিধি যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য, এ সকলই তাঁহার লোকশিক্ষার অঙ্গীভূত ছিল।

তিনি তাঁহার সন্ন্যাসীশিষ্য বাবা ব্রহ্মনাথ, ব্রহ্মচারী কালীনাথ, উপস্থিত বাঙ্গালীশিষ্যগণ এবং কয়েকজন হিন্দুস্থানী সাধু ও ভক্ত সঙ্গে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। কলিকাতা হইতে রসিকবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ শিষ্য ও ভক্তগণ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য মোটরকার সহ যথাসময়ে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। হাওড়া হইতে তিনি সকলকে লইয়া দমদমা গোরক্ষবংশীতে গমন করিলেন। গোরক্ষবংশীর মোহান্ত-মহারাজ যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার ভক্ত-গণকে গ্রহণ করিলেন, এবং আন্তরিক আদর আপ্যায়নের সহিত সকলের সমুচিত আহারাদি ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতে

লাগিলেন। গোরক্ষবংশী তখন বাঙ্গালী ভক্তদের আশ্রমেই পরিণত হইল। দলে দলে ধর্ম্মপিপাসু লোকসকল অলোক-সামান্য মহাপুরুষের দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবার মানসে কলিকাতা হইতে দমদমা যাইতে লাগিলেন। গোরক্ষবংশীতে সারাদিন লোকে লোকারণ্য হইতে লাগিল। একটা অবিরাম আনন্দহিল্লোলে সকলের প্রাণ উন্মাদিত। যাঁহারাই যাইতেন, সকলকেই কিছু না কিছু প্রসাদ পাইয়া আসিতে হইত। এটী আশ্রম-ধর্ম্ম, ইহার অন্যথা হইবার যো ছিল না। একদিন সেখানে বিশেষ ভাণ্ডারা দেওয়া হইল, বহুসংখ্যক সাধু ও ভক্ত প্রসাদ পাইলেন। এই ভাবে শিষ্য ও ভক্তগণ সহ বাবাজী তিন দিন গোরক্ষবংশীতে অবস্থান করেন। বলা বাহুল্য যে যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া এত আনন্দ, এত লোকসমাগম, এত আহারাদির ব্যবস্থা, তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে স্বভাবসিদ্ধ সমাহিত ভাবেই সর্ব্বদা বিরাজিত থাকিতেন, কেবলমাত্র মাঝে মাঝে একটু স্নিগ্ধ দৃষ্টিপাতে ও এক আধটুকু আশীর্ব্বাদসূচক অস্ফুট শব্দোচ্চারণে সমাগত ভক্তমণ্ডলীর প্রাণ সুশীতল করিয়া দিতেন। অথচ, মাঝে মাঝে তাঁহার দু' একটি আদেশেই সকলে অনুভব করিতেন, যে, সর্ব্বপ্রকার বিধিব্যবস্থার দিকে, সকলের সুবিধা অসুবিধার দিকে, নিরন্তর তাঁহার সুতীক্ষ্ণ ও সপ্রেম দৃষ্টি রহিয়াছে।

ইতোমধ্যে কলিকাতায় প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীটের ২০নং ত্রিতল বাটী ভাড়া লওয়া হইল। দমদমায় আগমনের তৃতীয়

দিবস অপরাহ্নে বাবা গম্ভীরনাথ সেখানকার আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া শিষ্যবৃন্দ সমভিব্যাহারে কলিকাতায় উক্ত বাড়ীতে গমন করেন। দমদমার আশ্রমে আহারাদি শেষ করিয়া যাত্রা করিতে বেলা অবসানপ্রায় হইয়াছিল। প্রায় সন্ধ্যা সময় বাবাজী কলিকাতার বাড়ীতে পৌঁছিলেন। সে রাত্রে কাহারও আহারাদির প্রয়োজন ছিল না, এবং সেই হেতু শিষ্যগণ তদ্বিষয়ে কোন বন্দোবস্তও করিলেন না। বাবাজী সেখানে পৌঁছিয়া তেতালার উপরে তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট আসনে স্বভাবসিদ্ধ সমাহিত ভাবে বসিয়া আছেন। একজন শিষ্যকে সম্মুখে দেখিয়া হঠাৎ মৃদুভাবে তিনি আদেশ করিলেন,—"কিছু খাদ্য-দ্রব্য কিনিয়া আনিয়া সকলের আহারের ব্যবস্থা কর। নূতন বাড়ীতে কাহারো অভুক্ত থাকা উচিত নয়।"

সকল স্থানে, সকল অবস্থায়, আশ্রম-ধর্ম্মের সকল বিধি-নিষেধের প্রতি সর্ব্ববিধ প্রয়োজনের অতীত, নির্ব্বিকার নিত্য-সমাহিত মহাপুরুষের এইরূপ সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ে অভিভূত হইল। সাংসারিক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে বিজ্ঞতাভিমানী ব্যক্তিগণই সেখানে কার্য্যনির্ব্বাহক ছিলেন। কিন্তু এই প্রথম সূচনা হইতেই পদে পদে তাঁহারা অনুভব করিতে লাগিলেন যে, গার্হস্থ্যধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং সাংসারিক কর্ত্তব্য পরিপাটীরূপে সম্পাদন করা সম্বন্ধে এই সংসারাতীত কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যবিহীন পুরুষটীর নিকট তাঁহারা কত শিশু! তৎক্ষণাৎ বাজার হইতে মিঠাই আনিয়া বাবাজীর সম্মুখে উপস্থিত করা

হইল। সকলেই সানন্দচিত্তে 'মিষ্টমুখ' করিলেন। স্বয়ং বাবাজীও আশ্রমের নিয়ম পালনার্থে যৎকিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন।

পরদিন হইতে এই বাড়ীতে অগণিত লোকের সমাগম হইতে লাগিল। বাবাজীর শিষ্যগণ ও ভক্তগণ তাঁহাদের নিকটস্থ ও দূরস্থ বহু আত্মীয়-স্বজন লইয়া ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিতে লাগিলেন। বহু কৃপাপ্রার্থী নরনারী সহর হইতে ও মফঃস্বল হইতে আসিতে লাগিলেন। তখন বড়দিনের ছুটী আরম্ভ হইয়াছে; চতুর্দ্দিক হইতে অনেক ধর্ম্মপ্রাণ লোক এই সুযোগে তাঁহার দর্শন ও কৃপা লাভ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যাঁহাদের বিশেষ কোন নিকট-আত্মীয় কলিকাতায় ছিলেন না, তাঁহারা সকলেই এই আশ্রমের অতিথি। বাবাজীর ভাণ্ডার সকলের জন্যই উন্মুক্ত। কোন্ দিন কতলোক আশ্রমের অতিথি হইবেন, কতলোকের জন্য আহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে, আশ্রমে সেবকগণের—কার্য্যনির্ব্বাহক শিষ্যগণের পক্ষে তাহা নির্দ্ধারণ করা কঠিন ছিল। কার্য্যনির্ব্বাহকগণ বলিয়াছেন যে, এই কারণে প্রথম প্রথম তাঁহাদিগকে কিছু অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল, কিছু বিশৃঙ্খলার মতও বোধ হইতেছিল। প্রায়ই যত লোকের জন্য আয়োজন করা হইত, লোকসংখ্যা তদপেক্ষা অনেক বেশী হইত। কিন্তু সে অসুবিধা হইতে অব্যাহতির পথ তাঁহারা শীঘ্রই আবিষ্কার করিলেন। সমাগত ব্যক্তিদের সুবিধা অসুবিধার দিকে নিজাসনে উপবিষ্ট

অর্দ্ধ-নিমীলিতনেত্র মহাপুরুষেরও সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি আছে, তাহা তাঁহাদের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তখন হইতে তাঁহারা বাবাজীর আদেশ গ্রহণ করিয়াই আহারাদির ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার নিকট তৎসম্বন্ধে আদেশ গ্রহণ করিবার জন্য উপস্থিত হইলে, প্রথমতঃ তিনি লৌকিক ভাবে তাঁহাদিগকেই জিজ্ঞাসা করিতেন যে তাঁহারা কত লোকের সমাগম আশা করেন। তাঁহারা তাঁহাদের অনুমান অনুসারে উত্তর করিলে, তিনি তাঁহার আদেশ জ্ঞাপন করিতেন। শিষ্যগণ যেরূপ আন্দাজ করিতেন, দেখা যাইত, তিনি সাধারণতঃ তদপেক্ষা বেশী আয়োজন করিতে বলিতেন। প্রতিদিন আয়োজনের পরিমাণ অবশ্য সমান হইত না। কিন্তু তিনি যেদিন যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করিতে আদেশ করিতেন, লোকসংখ্যা যাহাই হউক না কেন, তাহাতেই সঙ্কুলান হইয়া যাইত। এই সব সাংসারিক বিষয়েও তাঁহার বিধিব্যবস্থা দেখিয়া তাঁহারা অবাক হইয়া থাকিতেন। তখন হইতে প্রায় সব ব্যাপারেই তাঁহারা তাঁহার উপদেশ ও অনুমতি লইয়া বন্দোবস্ত করিতেন। তিনিও তাঁহার স্বভাবানুরূপ 'হাঁ' 'আচ্ছা' 'নেহি' বা তদ্রূপ সংক্ষিপ্ত দু' একটি বাক্য উচ্চারণ করিয়া সকল ব্যাপার পরিচালিত করিতেন। অতিথিসেবা উপলক্ষে অনুসন্ধিৎসু শিষ্যগণ কখন কখন কিঞ্চিৎ অলৌকিক শক্তির প্রকাশও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। হয়ত ইহা অবস্থানুসারে আপনা-আপনি প্রকাশিত হইয়া পড়িত, কিংবা হয়ত তিনি তদ্দারা শিষ্যদিগকে সেবাধর্ম্মের

গুরুত্ব বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহারা বলেন যে, তদবধি ভাণ্ডারা সম্বন্ধে আর কোন গোলমাল উপস্থিত হয় নাই, বাবাজীর নির্দ্দেশ অনুসারে সকল প্রকার বিধিব্যবস্থা সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইয়া যাইত।

কলিকাতার বাড়ীতে আগমনের ২।৩ দিন পরেই গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য ডাক্তার নরেন্দ্র সামন্তের পরামর্শানুসারে নেত্র-চিকিৎসার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ মৈত্র ও ডাক্তার মেনার্ড্‌কে আনাইয়া চক্ষু পরীক্ষা করান হয়। তাঁহারা তৃতীয় দিবসে অস্ত্রোপচারেব দিন নির্দ্ধারিত করিয়া বাবাজীর অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন 'যেদিন তোমাদের খুসী'। ডাক্তার মেনার্ড্‌ যথাসময়ে অস্ত্রোপচার কবিলেন। ড্রেস করা প্রভৃতি অন্যান্য সমস্ত কার্য্যের ভার ডাক্তার নরেন্দ্র সামন্ত মহাশয় গ্রহণ করিলেন। তিনি কেবলমাত্র ডাক্তার ভাবে নয়, নিজের ভক্তির প্রেরণায়, প্রাণের আবেগে, কায়মনোবাক্যে বাবাজীর সেবা করিতে লাগিলেন। অস্ত্রোপচারের পর ডাক্তারগণ আদেশ করিলেন যে, বাবাজী যেন কয়েকদিনের মধ্যে মলমূত্রত্যাগের জন্যও শায়িত অবস্থা হইতে উত্থান না করেন। বাবাজী সেই নিয়ন পালনের জন্য ২।৩ দিনের মধ্যে মলমূত্র ত্যাগের কোন ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন না, ঠিক এক অবস্থাতেই শায়িত থাকিয়া কয়েকদিন অতিবাহিত করিলেন। এই দুই তিন দিনের পর 'আরও কয়েক দিন তিনি অধিকাংশ সময় শায়িত অবস্থাতেই থাকিতেন, মাঝে মাঝে উঠিয়া শয্যার

উপরেই উপবেশন করিতেন, ঘরের বাহির হইতেন না। লোকজনের বেশী যাতায়াতে অসুস্থতা বৃদ্ধি পাইতে পারে আশঙ্কায় ডাক্তারগণ ৬।৭ দিন সে ঘরে লোকসমাগম নিষেধ করিলেন। বাবাজী যতদিন কলিকাতায় ছিলেন, প্রায় প্রত্যহই সারাদিন দর্শনার্থী লোক দ্বারা সে বাড়ী পরিপূর্ণ থাকিত। যে দিন তাঁহার চক্ষুতে অস্ত্রোপচার হয়, তদবধি কয়েকদিন মাত্র তাঁহার ঘরে কাহাকেও যাইতে দেওয়া হইত না। সে সব দিনেও নীচের তলায় লোকে লোকারণ্য হইত। অনেকে তিনি কিরূপ আছেন, তাহার খবর নিয়া যাইতেন। অনেকে একটিবার মাত্র তাঁহার দর্শনের প্রার্থনা জানাইতেন। সেবকগণ সকলকেই যথারীতি অভ্যর্থনা করিতেন। যখন দর্শনার্থীদিগের অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভবপর হইত না, তখনও তাঁহারা সানুনয়ে ডাক্তারদের আদেশ ও বাবাজীর স্বাস্থ্যের কথা বুঝাইয়া তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিতেন, কোনরূপ কর্কশ ব্যবহার করিতেন না। কাহারও প্রতি কর্কশ ব্যবহার করিলে বাবাজীর প্রতিই সেবাপরাধ হইবে, এ কথা তাঁহাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইত।

নিষিদ্ধ কয়েক দিন ব্যতীত প্রায় প্রতিদিনই বহু সংখ্যক লোক দর্শনার্থী হইয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতেন ও তাঁহার আসনের নিম্নস্থ বিস্তৃত বিছানায় বসিয়া থাকিতেন। বৈকাল বেলায়ই বেশী ভিড় হইত। বাবাজী তাঁহার খাটের উপর অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় সমাহিত ভাবে সমাসীন। ভক্তগণ আসিয়া

প্রণাম করিয়া নীচের বিছানায় উপবেশন করিতেন। ঘন্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইতেছে; কাহারও মুখে কথাটী নাই, অথচ উঠিয়া যাইতেও ইচ্ছা হইতেছে না। একজন ভক্ত * লিখিয়াছেন,—"তেতালায় ঠাকুরের ঘরে নীচে বিছানা পাতিয়া দেওয়া হইত, উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী সেখানে বসিয়া থাকিতেন। ঠাকুর, যেমন বরাবরই দেখিয়াছি, কোন কথা বলিতেন না, খাটের উপর বসিয়া আছেন, দৃষ্টি আনত; এক ঘর মানুষ সামনে বসিয়া, যেন তাঁহার নীরবতার সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে। ক্বচিৎ কোন দিন যদি বা কেহ সাহস করিয়া ২।১টী কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, তিনি এক আধ কথায় প্রশ্নের সঠিক উত্তরটী দিয়া, অথবা 'হাঁ' কি 'না' বলিয়া সমাপ্ত করিয়া দিতেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে সেই বৈকালিক বৈঠকে প্রায় কেহই বসিতেন না, কারণ, অভ্যাগত লোক দ্বারাই ঘর ভরিয়া থাকিত। একটা মজা দেখিতাম যে, এই নিস্তব্ধ বৈঠকে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর যেন ধৈর্য্যের পরীক্ষা হইত। একাদিক্রমে এরূপ ৩।৪ ঘণ্টা সকলে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেন না। কেহ কেহ অর্দ্ধ ঘণ্টা, সিকি ঘণ্টা বসিয়াও চলিয়া যাইতেন। আবার কেহ কেহ সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিয়া দীক্ষার অনুমতি প্রার্থনার সুযোগ খুঁজিতেন। ক্বচিৎ পূর্ব্বাহ্ণে, প্রায়ই অপরাহ্ণে এরূপ বৈঠক বসিত। কলিকাতা নিবাসী গণ্যমান্য বাঙ্গালী,

* বিনোদবিহারী দত্ত গুপ্ত।

হিন্দুস্থানী, মাড়োয়ারী, অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত থাকিতেন। অনেক দিনই এইরূপ নীরবে চলিয়া যাইত। এক আধটুকু কথা যাহা হইত, তাহা প্রায়ই সম্মুখস্থ ঠাকুর বাড়ীর সান্ধ্য নহবতের বাজনার পরে হইত।”

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ অবসর পাইলেই আসিয়া বাবাজীর সঙ্গ সম্ভোগ করিতেন। গোস্বামী মহাশয়ের অন্যতম শিষ্য, সুপ্রসিদ্ধ গায়ক শ্রীযুক্ত রেবতী মোহন সেন মহাশয় মাঝে মাঝে আসিয়া বাবাজীকে কীর্ত্তন শুনাইতেন। বাবাজী তাঁহার কীর্ত্তন শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। একদিন রেবতী বাবু তাঁহার ‘মূখ ও বধির বিদ্যালয়ের’ কয়েকটি ছাত্র সঙ্গে আনিয়া তাহারা যে কথা বুঝিতে ও বলিতে পারে, ইহা বাবাজীকে দেখাইলেন। বাবাজী দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন, এবং তাহাদিগকে মিঠাই খাওয়ার জন্য কয়েকটি টাকা দিলেন।

অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদিগকে আদর করিয়া খাওয়াইতে তিনি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেন বলিয়া মনে হইত। গোরক্ষপুরেও ইহা অনেক সময় দেখা যাইত। কখন কখন দেখা গিয়াছে যে, ভক্তগণ তাঁহাকে যে ফল কি মিষ্টদ্রব্যাদি অর্পণ করিতেন, ছোট বালক-বালিকা উপস্থিত থাকিলে, ইহার অগ্রভাগ তিনি তাহাদিগকে প্রদান করিতেন। তাহারা তাঁহার সম্মুখে খেলা করিতে করিতে খাইতে থাকিলে তিনি আনন্দের সহিত তাহা দেখিতেন। কেহ তাহাদের চঞ্চলতা

নিবারণ করিতে গেলে তিনি তাহাকে নিষেধ করিতেন। তিনি যখন গোরক্ষপুরে তাঁহার গুরুজীর সমাধিমঠের রোয়াকের উপর বসিয়া থাকিতেন, তখন কোন শিশু তাঁহার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকিলে, তিনি গোরক্ষনাথ মন্দির হইতে মিষ্টি বা ফল আনিয়া তাহাকে দিবার জন্য কোন সাধুকে আদেশ করিতেন। তিনি যখন নিজেব ঘরে বসিয়া থাকিতেন, তখন কোন বালক বা বালিকা তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলে, তিনি অনেক সময় নিজের হাতে প্রসাদী ফল বা মিষ্ট দ্রব্য তাহাকে আশীর্ব্বাদ স্বরূপ প্রদান করিতেন। গোরক্ষপুরে একদিন বিকালে তাঁহার জনৈক শিষ্যের শিশু-পুত্র পিতার সঙ্গে গিয়া বাবাজীর সম্মুখে শৈশবোচিত ক্রীড়া করিতেছিল বাবাজীও তাহার দিকে প্রসন্নদৃষ্টি স্থাপন করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন। কথায় কথায় তাহার পিতা বলিলেন যে, শিশুটীর দুগ্ধপানে বড় অরুচি। সে দিন বাবাজীকে রাত্রে যে দুগ্ধ দেওয়া হইয়াছিল, তিনি তাহা হইতে সামান্য এক চুমুক পান করিয়া সেবককে বলিলেন,— "লেড়কাকো দেও।" শিশুটী সেই প্রসাদী দুগ্ধ সে রাত্রে সবটুকুই বিনা আপত্তিতে পান করিয়া ফেলিল।

তাঁহার একজন শিষ্য লিখিয়াছেন যে, "কলিকাতায় এক অপরাহ্ণে ঠাকুর বসিয়া আছেন, নীচের পাতা বিছানায় উপস্থিত ভদ্রলোকদের পুরোভাগে কয়েকটী বালক উপবিষ্ট আছে; ঠাকুর আমাকে ডাকিয়া খাটের নীচ দেখাইয়া বলিলেন যে,—

কৌটার আঙ্গুর ফলগুলি ইহাদিগকে দেও। আমি এক কৌটা হইতে আঙ্গুর লইয়া প্রত্যেককে বণ্টন করিয়া দিতে অগ্রসর হইতেছিলাম। বাবাজী ইঙ্গিত করিলেন যে, আরও দুই একটি কৌটার সব ফলগুলি একত্র করিয়া তাহাদিগকে প্রদান কর এবং তাহারা আপনারাই বণ্টন করিয়া গ্রহণ করুক। আমি নিজ সঙ্কীর্ণতায় ও কর্ত্তৃত্বের প্রবৃত্তিতে সঙ্কুচিত হইলাম।"

ধনী, দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, পুরুষ, নারী, উচ্চপদস্থ, পদ-মর্য্যাদাবিহীন, উচ্চজাতীয়, নিম্নজাতীয়—সকল প্রকার লোকই তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। তাঁহার দৃষ্টি সকলের প্রতিই সমান ছিল, তাঁহার ব্যবহারও সকলের প্রতিই প্রায় সমান দেখা যাইত। তবে ধনাভিমানী, পাণ্ডিত্যাভিমানী, পদাভিমানী ও জাত্যাভিমানী লোকদের প্রতি কখন কখন তাঁহার একটু বাহ্যিক উপেক্ষার ভাব লক্ষিত হইত।

গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য শ্রীযুত কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় একদিন বাবাজীকে দর্শন করিতে আসেন। তাঁহার সঙ্গে তাঁহার ২।৫টী শিষ্য ছিলেন। তখন বাবাজী আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছিলেন। সে সময় সাধারণতঃ তাঁহার ঘরে কাহাকেও যাইতে দেওয়া হইত না। কিন্তু ব্রহ্মচারীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবশতঃ সেবকগণ বাবাজীর অনুমতি লইয়া সশিষ্য ব্রহ্মচারীজীকে তেতালায় লইয়া গেলেন। বাবাজী তাঁহাকে সস্নেহে গ্রহণ করিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যদের প্রতি

তাঁহার একটু বিশেষ কৃপাদৃষ্টি সর্ব্বদাই লক্ষিত হইত। তিনি প্রণামান্তে আসন গ্রহণ করিয়া বাবাজীর নিকট অনেক কথা বলিতে লাগিলেন, অনেক বিষয় নিবেদন করিতে লাগিলেন। বাবাজী প্রসন্নচিত্তে দু' একটি কথা বলিলেন এবং মাঝে মাঝে 'আনন্দ' 'আনন্দ' উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বিদায় কালে ব্রহ্মচারীজী সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া, তৎপর নতজানু হইয়া বসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিলেন যে 'গোঁসাইজীর উপর আপনার যেরূপ কৃপাদৃষ্টি ছিল, এ অধীনের উপরও যেন সেইরূপ থাকে'। বাবাজী আনন্দোৎফুল্লনেত্রে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া 'হ্যাঁ', 'হ্যাঁ', বলিতে লাগিলেন। কেবলমাত্র এইরূপ ভক্তিগদ্‌গদচিত্ত ভক্তদের আন্তরিক আবেগযুক্ত প্রার্থনা ও কথাবার্ত্তার সময়েই বাবাজীর মুখে চোখে একটু উচ্ছ্বাস-বিশিষ্ট ভাবের বিকাশ দেখা যাইত।

একদিন কয়েকজন ভদ্রলোক একজন খঞ্জ ভদ্রলোককে কোলে তুলিয়া তেতালায় বাবজীর নিকটে আনিলেন। ভদ্রলোকটি বাবাজীর আসনের অতি নিকটে উপবেশন করিলেন। তিনি প্রথমে দু' একটি কথা বলিলেন। তৎপর উভয়েই নীরব, তাঁহাদের মধ্যে কোন কথাবার্ত্তা হইতে শোনা গেল না। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে অবস্থান করিয়া ভদ্রলোকটি শরণাগতির ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক অবলুণ্ঠিত মস্তকে বাবাজীকে প্রণাম করিলেন; বাবাজী বিশেষ কারুণ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একবার মাত্র 'হ্যাঁ' বলিলেন। ভদ্রলোকটি

যুক্তকরে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক সঙ্গীদের উপর ভর করিয়া দোতালার বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। তিনি নীচে আসিয়া উপস্থিত ভক্তগণের নিকট বলিয়াছিলেন, যে এই খঞ্জত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বে তিনি প্রায় ৩০ বৎসর অনেক সাধু মহাত্মার সঙ্গ করিয়াছিলেন, এবং তন্মধ্যে একজন মহাপুরুষ তাঁহার প্রতি কৃপা পূর্ব্বক কয়েকটি প্রণালী শিক্ষা দিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন যে, যে কোন সাধু সন্ন্যাসীর নিকট তিনি যাইবেন, তিনি তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করিবেন, এবং সেই সাধু কেমন, তাহা বুঝিতে পারিবেন। তিনি বাবাজীর সম্বন্ধে বলিলেন, "আপনারা কেন এখানে বসিয়া আছেন? কায়মনোবাক্যে ইঁহার শরণাগত হউন। একমাত্র ইঁহার কৃপা ব্যতীত কিছুতেই ইঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারিবেন না। ত্রিগুণাতীত মহাপুরুষ,—আমি প্রথমতঃ স্তব স্তুতি করিয়া দেখিলাম, ভ্রূক্ষেপ নাই; ক্রোধ করিয়া দেখিলাম, টলিলেন না; অবশেষে শরণাপন্ন হইলাম ও প্রণাম করিলাম, তখন তিনি 'হাঁ' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।" বলা বাহুল্য, তিনি বাহিরে এ সব কিছুই করেন নাই। বাহির হইতে বাবাজীর ও তাঁহার সামনাসামনি স্থিরনিস্তব্ধ ভাবে উপবেশন, মাঝে মাঝে বাবাজীর সকরুণ দৃষ্টিপাত, ভদ্রলোকটির ভক্তিপূর্ণ প্রণাম এবং বাবাজীর কারুণ্যপূর্ণ 'হাঁ' শব্দ উচ্চারণ ব্যতীত আর কিছুই অন্যান্য জন কর্ত্তৃক লক্ষিত হয় নাই।

একদিন একজন ভদ্রলোক একটি কমলালেবু হাতে করিয়া

বাবাজীকে দর্শন করিতে আসেন। তখন ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না, ভদ্রলোকটিও প্রবেশের অনুমতি পাইলেন না। দর্শনলাভ ঘটিল না বলিয়া বিষণ্ণমুখে কিয়ৎকাল প্রতীক্ষা করিলেন, তৎপর কমলালেবুটি সেবকের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেবক লেবুটি নিয়া বাবাজীর বিছানার একপার্শ্বে রাখিয়া দিলেন। বাবাজী অধিক রাত্রে বিছানায় উঠিয়া বিছানার পার্শ্ব হইতে কমলালেবুটি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বহস্তে খোসা ছাড়াইয়া সবটাই খাইয়া ফেলেন। পরদিন সকালে তাঁহার বিছানার নীচে খোসা দেখা গেল। সেবকগণ অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনা দর্শন করিয়া ভদ্রলোকটিকে ঐকান্তিক ভক্তিমান্ ও সৌভাগ্যবান্ মনে করিতে লাগিলেন এবং অজ্ঞাত ভক্তের প্রতি বাবাজীর কৃপা দর্শনে বিমোহিত হইলেন। তাঁহার এইরূপ কৃপার নিদর্শন কত সময় কত ভাবে পাওয়া গিয়াছে, তাহা সবিশেষ বর্ণন করা অসম্ভব।

একদিন কলিকাতার মহানির্ব্বাণ মঠের জনৈক ভক্ত কিছু ফল লইয়া বাবাজীকে দর্শন করিতে যান। তিনি বলিয়াছেন যে, তাঁহার আন্তরিক আগ্রহ ছিল যে, নির্জ্জনে বাবাজীর নিকট ২।৩টী কথা নিবেদন করেন এবং বাবাজীর উপদেশ গ্রহণ করেন। তিনি মুখে এ প্রার্থনা জানাইতে সঙ্কোচ বোধ করিলেন, এবং মনে মনে প্রার্থনা করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন আরও কয়েকজন ভক্ত সেই ঘরে উপস্থিত

ছিলেন। বাবাজী যেন তাঁহার আন্তরিক প্রার্থনায় দয়ার্দ্র হইয়া, উপস্থিত ভক্ত কয়েকটীকে এ কাজে সে কাজে পাঠাইয়া বিদায় করিয়া দিলেন, এবং তাঁহাকে দু' একটি কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার সংকোচ দূর করিয়া দিলেন। তখন ভক্তটী বাবাজীর করুণায় বিগলিত হইয়া আবেগভরে আপনার বক্তব্য বলিতে লাগিলেন, এবং বাবাজীও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মৃদু ভাবে ভক্তটির জিজ্ঞাস্য বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় বহুসংখক নরনারী বালকবৃদ্ধ বাবাজীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ ও তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন। তাঁহার নিকট পূর্ব্বে যাঁহারা দীক্ষা লাভ করিয়া প্রাণে শান্তি অনুভব করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বভাবতঃই স্ত্রী পুত্র ও আত্মীয়স্বজনদিগকে নিজেদের সৌভাগ্যের অংশী করিবার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলেন; তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনগণও অনেকেই তাঁহার চরণাশ্রয় লাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র, এবং দরিদ্রদের মধ্যেই যে ধর্ম্ম-পিপাসা অধিক হইয়া থাকে, ইহা একটি চিরন্তন সত্য, এবং বোধ হয় ইহা ভগবানের একটি বিধান। এই শিষ্যগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার নাম ও মাহাত্ম্য শ্রবণে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া, অথবা কোন অলৌকিক উপায়ে তাঁহার দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, প্রাণের আবেগে কোন সুযোগ করিয়া গোরক্ষপুর গিয়াছিলেন। কিন্তু পরিবারস্থ সকলকে নিয়া

গোরক্ষপুর পর্য্যন্ত যাইবার পাথেয় প্রভৃতি সংগ্রহ করা অনেকের পক্ষেই কষ্টসাধ্য ছিল। তাঁহারা মনে করিলেন যে এই দীক্ষালিপ্সু দরিদ্রের জন্যই ঠাকুরকে এই নিম্নভূমিতে অবতরণ করিতে হইয়াছে। অনেক ধর্ম্মপিপাসু তাঁহার নাম ও মহিমা শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সাংসারিক নানারূপ বাধাবিঘ্ন বশতঃ গোরক্ষপুর যাওয়ার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহারা ভাবিলেন যে, তাঁহাদিগকে কৃপা করিবার উদ্দেশ্যেই অহেতুক-কৃপাসিন্ধু গুরুদেব স্বীয় নেত্র চিকিৎসার ছলে স্বয়ং আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন! অনেক বালক-বালিকা তাঁহার নাম ও মহিমা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত ছিল, কিন্তু পিতামাতা বা অন্য অভিভাবকদিগের সহানুভূতি ও সাহায্যের অভাবে গোরক্ষপুর যাইবার কোন সুবিধা পায় নাই। তাহারা এবার তাঁহাকে নিকটে পাইয়া গোপনে তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণের সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। বাংলা দেশে যাঁহারা যেখানে তাঁহার চরণাশ্রয় লাভের জন্য ব্যগ্র ছিলেন, তাঁহার কলিকাতায় আগমনে তাঁহাদের অনেকেরই ধারণা হইল যে, তিনি তাঁহাদের জন্যই এত নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, এবং এ সুযোগ গ্রহণ করিতেই হইবে। যাঁহাদের প্রাণে ধর্ম্ম-পিপাসা ছিল এবং সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তাবোধও ছিল, কিন্তু কোন্ মহাপুরুষের শরণাপন্ন হইলে তাঁহাদের অভীষ্টসিদ্ধি

হইবে, তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারিতেছিলেন না, এমন অনেক ভক্ত তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিতে যাইয়া সেই সংশয় ও দ্বিধা হইতে মুক্তিলাভ করিলেন এবং তাঁহার কৃপাপ্রার্থী হইলেন। কেহ কেহ কৌতূহল বশতঃ বা বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে অথবা দলে পড়িয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মূর্ত্তি দর্শন করিবার পরই যেন 'সোণার কাঠির' স্পর্শে তাঁহাদের অন্তরের সুপ্ত ধর্ম্মভাব জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, এবং অলক্ষিতে তাঁহাদের চিত্তকে তাঁহার চরণে সংলগ্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

এইরূপে বহুসংখ্যক ধর্ম্মার্থী লোক কলিকাতায় তাঁহার আশ্রয় লাভ করেন। তাঁহাদের মধ্যে পুরুষ, স্ত্রী, বালক, যুবক, বৃদ্ধ, ধনী, নির্ধন, উচ্চবর্ণ-সম্ভূত, নিম্নবর্ণজাত,—সকল প্রকার ভক্তই ছিলেন। অকপটচিত্তে দীক্ষাপ্রার্থী হইলে, তিনি কখনও প্রত্যাখ্যান করিতেন না। অনেকে বলিয়া থাকেন যে, বাস্তবিকই বাবাজী তখন কল্পতরু হইয়া বসিয়াছিলেন। যাহাদের চিত্তে কপটতা থাকিত, অথবা যাহারা কোন সাংসারিক অভীষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণের মতলব করিয়া যাইত, তাহারা তাঁহার নিকট দীক্ষার প্রার্থনা জানাইতেই সমর্থ হইত না। তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেই তাহাদের মতলব শিথিল হইয়া যাইত, দীক্ষার কথা ভুলিয়া যাইত, অথবা সেরূপ কোন প্রস্তাব করিতে সঙ্কোচ বোধ করিত। এই প্রকার অবস্থা অনেক ব্যক্তির সম্বন্ধেই শোনা গিয়াছে।

বাবাজীর নিকট কয়েকজন ভক্ত ও শিষ্য একদিন প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের অনেক নরনারী আপনার চরণাশ্রয় লাভের জন্য ব্যাকুল, অথচ তাঁহারা কলিকাতা পর্য্যন্ত আসিতেও সমর্থ হইতেছেন না, আপনি দয়া করিয়া যদি ঢাকায় যাইতে স্বীকৃত হন, তবে তাঁহারা কৃতার্থ হইতে পারেন; আপনি অনুমতি প্রদান করিলে আমরা তদ্রূপ বন্দোবস্ত করি। তাঁহাদের সাগ্রহ প্রার্থনা সত্ত্বেও বাবাজী তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। লোকসকলকে কৃপা করিবার প্রকাশ্য উদ্দেশ্যে তিনি কোথাও যাইবেন, বা কোন কার্য্যে ব্রতী হইবেন, ইহা তাঁহার ব্যবহারিক জীবনের নীতির বিরুদ্ধ ছিল। ইহাতে যে অভিমানের গন্ধ পাওয়া যায়! তিনি শিষ্য ও ভক্তদিগকে সম্পূর্ণ নিরভিমান হইতে শিক্ষা দিতেন। লোকশিক্ষা দেওয়ার অভিমানও অভিমান। অভিমান যে পরিমাণে থাকে, আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হইবার পথ সেই পরিমাণে রুদ্ধ থাকে। অভিমান বর্জ্জনের চেষ্টাই আধ্যাত্মিক জীবনের সর্ব্বপ্রধান সাধনা। তত্ত্বজ্ঞানে তাঁহাব নিজের অভিমান অবশ্য সম্পূর্ণরূপেই ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল, তাহার পুনরুত্থানের কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ভক্ত ও শিষ্যদিগকে অভিমান বর্জ্জন শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার ব্যবহারিক জীবনও এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত, যেন তাঁহারা তাঁহাদের স্থূল দৃষ্টিতেও কোনরূপ অভিমানের চিহ্ন তাঁহার আচরণে লক্ষ্য করিয়া ভ্রমে পতিত না হন। প্রকাশ্যতঃ তিনি স্বীয় নেত্র-চিকিৎসার

জন্যই কলিকাতায় আসিয়াছিলেন,—লোক সকলকে কৃপা করিতে নয়। ভক্তদের ব্যাকুল প্রার্থনার উত্তরে তিনি আস্তে আস্তে বলিয়াছিলেন যে, যাহাদেব সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহারা সকলেই আসিয়া জুটিবে, এবং তাহাদের দীক্ষা-লাভের কোন উপায় হইয়া যাইবে।

বাবাজীর কলিকাতা পৌছিবার ২।৩ দিন পর হইতেই কিছু কিছু করিয়া দীক্ষা আরম্ভ হয়। চক্ষুতে অস্ত্রোপচারের পর হইতে কয়েকদিন মাত্র তাঁহার গৃহে লোকসমাগম নিষিদ্ধ ছিল এবং দীক্ষাপ্রদান কার্য্যও বন্ধ ছিল। তাহার পর চক্ষুতে ব্যাণ্ডেজ লইয়াই তিনি দীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। দীক্ষা দান সাধারণতঃ পূর্ব্বাহ্নেও হইত কদাচিৎ অপরাহ্নেও হইত। একদিন প্রাতে ৮॥-৯টা হইতে আরম্ভ করিয়া ১২-১২॥টা পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশ জন স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকার দীক্ষা হইয়াছিল। দিনের পর দিন এইরূপ দীক্ষা চলিতে লাগিল। কোন ভক্ত হয়ত বিকালে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, এবং চাকরী বা সাংসারিক কর্ত্তব্যের অনুরোধে সেই দিনই সন্ধ্যার পর তাঁহার কলিকাতা ত্যাগ করা প্রয়োজন। করুণাময় ঠাকুর ফুলফল বা অন্য কোনরূপ আয়োজন বিনা তখনই তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিয়া কৃতার্থ করিলেন। কোন স্ত্রীলোক হয়ত দূরদেশ হইতে আসিয়াছেন, শীঘ্র প্রত্যাবর্ত্তন না করিলে চলে না, অন্য সময় আসাও তাঁহার পক্ষে কষ্টকর, অথচ দীক্ষালাভের জন্য ঐকান্তিক আগ্রহ;

ঠাকুরের ঘর হয়ত তখন ডাক্তারের আদেশে বন্ধ, দর্শনাদি প্রদানও নিষিদ্ধ ; দীক্ষার্থিনীর আগ্রহে ঠাকুরকে তাঁহার কথা একবার জানান হইল, 'জীবকল্যাণৈকদীক্ষ' ঠাকুর ডাক্তারের নিষেধ অবমাননা করিয়াও উঠিয়া বসিয়া দীক্ষার্থিনীর অভীষ্ট পূরণ করিয়া তাঁহাকে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আদেশ দিলেন। এই ভাবে ঠাকুর কল্পতরু হইয়া কৃপা বিতরণ করিতে লাগিলেন, এবং আধ্যাত্মিক-কল্যাণ-পিপাসু নরনারীর প্রাণে স্বীয় সাধনলব্ধ আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়া তাঁহাদের মানবজন্মকে সম্যক্ সফলতার দিকে চালিত করিলেন।

বাবাজী শিষ্যদিগকে প্রচলিত ধর্ম্মের অনুশাসন মানিয়া চলিতেশিক্ষা দিতেন এবং তদুদ্দেশ্যে নিজেও তাহাতে যোগদান করিতেন, ইহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার কলিকাতায় অবস্থান কালে তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে কালীঘাটে কালীমাতাকে একটি বিশেষ পূজা দেওয়া হইয়াছিল, এবং তদুপলক্ষে সায়াহ্নে একটি বিশেষ ভোজের আয়োজন করা হইয়াছিল। বাবাজী অসুস্থতানিবন্ধন কালীঘাটে গমন করিতে পারিলেন না। কিন্তু তিনি পূজার দিন মধ্যাহ্নে অন্ন বা রুটী আহার করিলেন না, রাত্রিতে ভোজন করিলেন। গোস্বামী মহাশয়ের অনেক শিষ্য এবং তদ্‌ব্যতীত অনেক ভক্ত এই পূজায় ও ভোজে যোগদান করিয়াছিলেন।

.সেবার উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে গঙ্গাসাগর-স্নানের বিশেষ

যোগ! সংক্রান্তির পূর্ব্বদিন বাবাজী শিষ্যগণকে বলিলেন, "তোমরা সকলে কাল সকালে গঙ্গাস্নান করিবে এবং আমার জন্যও কিছু গঙ্গোদক আনিবে।" শিষ্যগণ সকলেই শেষরাত্রে গাত্রোত্থান করিয়া মহোল্লাসে গঙ্গাস্নান করিতে যাত্রা করিলেন। স্নানান্তে গঙ্গোদক লইয়া তাঁহারা আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলে, বাবাজী স্বীয় আসন হইতে নামিয়া আসিয়া বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক ধৌত বস্ত্র-পরিধান করিলেন ও গঙ্গোদক মস্তকে ধারণ করিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি যেন তখন আরো প্রসন্ন ও জ্যোতির্ম্মণ্ডিত দেখা গেল। শিষ্য ও ভক্তগণ আনন্দে ভরপূর হইয়া সেই আনন্দময় মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎপর পৌষপার্ব্বণের উৎসবের আয়োজন হইতে লাগিল। সেই পর্ব্বদিনে আশ্রমে আহারাদির কিরূপ ব্যবস্থা হইবে, বাবাজীকে জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি বাংলা দেশের প্রচলিত নিয়ম জানিতে চাহিলেন। শিষ্যগণ বলিলেন যে বাংলা দেশে পৌষ পার্ব্বণে পিষ্টকাদি প্রস্তুত হইবার নিয়ম। গোরক্ষনাথ মন্দিরে এই মকর সংক্রান্তিতে খিচুরী মেলা। সহস্র সহস্র নরনারী নানা স্থান হইতে এই দিনে শ্রীনাথজীর দর্শন মানসে সমবেত হয় এবং খিচুরী ভোগ নিবেদন করে। যোগিরাজ খিচুরী ও মিষ্টান্ন উভয়েরই ব্যবস্থা দিলেন। শিষ্যগণ মহোল্লাসে আদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আনন্দের তরঙ্গ খেলিতে লাগিল। উৎসব ও প্রসাদ বিতরণ যথাবিধি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইল।

যত ভক্ত বাবাজীকে দর্শন করিতে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সাধুদর্শনের রীতি অনুসারে কিছু ফল বা মিষ্টদ্রব্য প্রভৃতি লইয়া আসিতেন। সেই সব ফল ও মিষ্টাদি সমাগত ভক্তদের মধ্যেই বিতরিত হইত। আশ্রমের রীতি অনুসারে, যত লোক সেখানে আসিতেন, সকলকেই কিছু প্রসাদ দেওয়া হইত। প্রসাদ না পাইয়া কাহারও যাইবার নিয়ম ছিল না। তদ্ভিন্ন দূরাগত কত ভক্ত যে আশ্রমে আহারাদি করিতেন, তাহার কোন হিসাবই ছিল না। কিন্তু বাবাজীর ইঙ্গিতে সকল ব্যাপারই সহজে ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া যাইত। ইহার মধ্যে মাঝে মাঝে কিছু অলৌকিক শক্তিরও প্রকাশ হইয়া পড়িত।

বাবাজীর কলিকাতায় অবস্থিতিকালে তাঁহার জনৈক শিষ্য একটি অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তাহার উল্লেখপূর্ব্বক এই অধ্যায় শেষ করা যাইতেছে। শিষ্যটীর মুখে ব্যাপারটী যেমন শুনিয়াছি, তাহারই মর্ম্ম লিখিতেছি। সেই সময় 'পরদেহপ্রবেশী' উপাধিধারী একজন শক্তিশালী যোগী কলিকাতায় অবস্থান করিতেছিলেন। লোকের নিকট তাঁহার স্বীয় যোগশক্তি প্রখ্যাপন করার অভ্যাস ছিল। অনেক লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। বাবাজীর উক্ত শিষ্যটীও সাধুদর্শনের নিমিত্ত তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন। তিনি দর্শকবৃন্দের নিকট বলিতেন যে, গৃহে বসিয়াও কেহ তাঁহাকে মনে মনে স্মরণ করিয়া আহ্বান করিলে তিনি

তাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হন। উক্ত শিষ্যটিও তাহা শুনিয়াছিলেন। একদিন তিনি একাকী বসিয়া আছেন; কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া, তিনি কিছুক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে পরদেহ-প্রবেশীর চিন্তা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি দেখিতে পাইলেন যে, সেই মহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। মহাপুরুষ তাঁহাকে দীক্ষা প্রদান করিতে চাহিলেন। ভদ্রলোকটী তাহাতে ভীত হইলেন। তিনি এক মহাপুরুষের শিষ্য হইয়া কেন অন্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবেন? কিন্তু এই মহাত্মাকেও বিনা প্রয়োজনে আহ্বান করা অন্যায় হইয়াছে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি বিমূঢ় হইলেন। পরদেহপ্রবেশী তাঁহাকে বুঝিতে দিলেন যে, তাঁহার পূর্ব্বলব্ধ মন্ত্রের শক্তি নষ্ট করিয়া তিনি তাঁহাকে দীক্ষা দান করিবেন। এমন সময়ে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, পশ্চাৎদিক হইতে বাবাজীর জ্যোতিঃপূর্ণ মূর্ত্তি পরদেহপ্রবেশীর দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং সেই দৃষ্টি হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হইয়া পরদেহ প্রবেশীকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে। পরদেহ-প্রবেশী সেই তেজে বিহ্বল হইয়া ভীত চকিত ভাবে নমস্কার করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন; বাবাজীর মূর্ত্তিও অন্তর্হিত হইল। কৃপাসিন্ধু গুরুদেব তাঁহাকে একটি বিশেষ বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন, ভক্তিগদ্‌গদ্‌চিত্তে ইহা চিন্তা করিতে করিতে শিষ্যটী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আত্মহারা হইয়া রহিলেন। তৎপর শিষ্যটী স্বীয় অপরাধের জন্য অনুতপ্ত

চিত্তে বাবাজীর নিকট গমন করিয়া অনেকক্ষণ মনে মনে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, এবং শেষে প্রকাশ্যে করযোড়ে ক্ষমা-ভিক্ষা করিলেন। বাবাজী তাঁহাকে আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করিলেন, কিন্তু উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে কিছুই বলিলেন না।

বাবাজী জানুয়ারী মাসের শেষভাগে কলিকাতা হইতে গোরক্ষপুর ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু হায়! তখন কে জানিত যে তাঁহার বাংলা দেশে আর ফিরিয়া আসা হইবে না! তখন কে বুঝিয়াছিল যে, তিনি বুঝি নশ্বর দেহ ত্যাগ করিবেন বলিয়াই বাংলা দেশে আসিয়া একেবারে কল্পতরু হইয়া বসিয়াছিলেন!!

ষোড়শ অধ্যায়

হরিদ্বার কুম্ভে

কলিকাতা হইতে গোরক্ষপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাবাজী কিছুদিন সেখানে অবস্থান করেন। সেই বৎসরই চৈত্রমাসে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ। বাবাজী কুম্ভমেলায় যোগদান করিবেন বলিয়া পূর্ব্বেই প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার যাত্রার পূর্ব্বে অনেক শিষ্য গোরক্ষপুরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের জন্য যথাসময়ে হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডের অনতিদূরে 'নাথজীর দলিচা'র সন্নিকটে একটি বাড়ী ভাড়া করা হইল। তিনি শুভ দিন ঠিক করিয়া শিষ্যগণ এবং অনেক সাধু-সন্ন্যাসী সঙ্গে লইয়া হরিদ্বারাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কোন কোন গৃহী-শিষ্য সপরিবারেও চলিলেন।

বাবাজীর সন্ন্যাসী-শিষ্য বাবা শান্তিনাথজী তখন তপশ্চর্য্যার জন্য হৃষীকেশে অবস্থান করিতেছিলেন এবং দিবসরজনী অনন্যকর্ম্মা ও অনন্যচিন্ত হইয়া গুরূপদেশানুযায়ী সাধনভজনে নিরত ছিলেন। গুরুমহারাজ কুম্ভমেলায় আসিতেছেন জানিয়া তিনি হরিদ্বারে আসিয়া তাঁহার প্রতীক্ষায় রহিলেন। শেষরাত্রে গাড়ী হরিদ্বার ষ্টেশনে পৌছিলে শান্তিনাথজী গুরুদেবের সহিত মিলিত হইলেন। নাথযোগী সম্প্রদায়ের

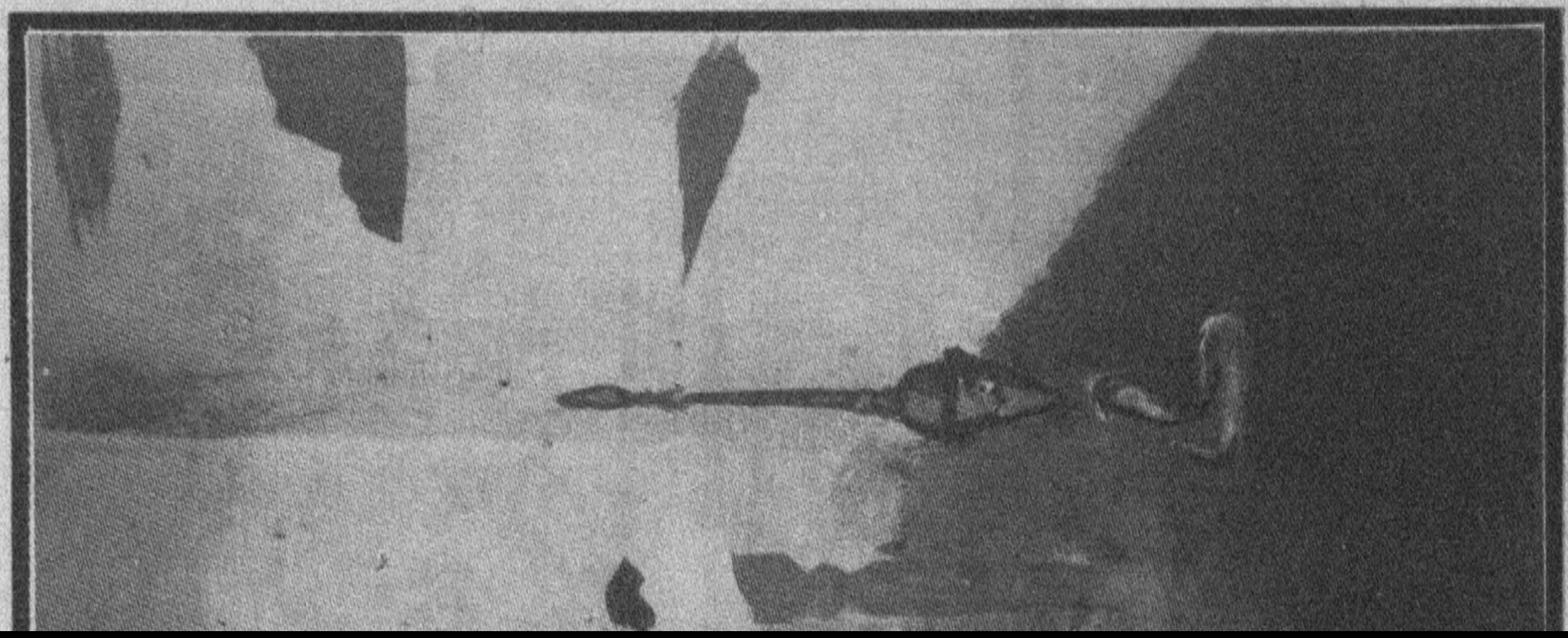

শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষ ভাড়া বাড়ীতে গেলেন না, নাথজীর দলিচায় গমন করিলেন। এই দলিচাই হরিদ্বারে নাথ-সম্প্রদায়ের আশ্রম। এখানে গোরক্ষনাথের মন্দির আছে, সাধুদের জন্য সাধন গুহা আছে, এবং নাথ-সম্প্রদায়ের সাধুমণ্ডলী এখানেই অবস্থান করিয়া থাকেন। দলিচার বিস্তৃত প্রাঙ্গণে নানাস্থান হইতে সমাগত সাম্প্রদায়িক সাধুগণ কম্বল বিছাইয়া ও ধুনী জ্বালাইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। সম্প্রদায়ের মোহান্তগণ অবশ্য এই ভিড়ের মধ্যে থাকিতেন না। তাঁহারা সাধারণতঃ অন্য বাড়ীতে অথবা ধর্ম্মশালায় শিষ্যসেবকসহ আরাম ও আড়ম্বরের সহিত অবস্থান করিতেন, এবং সকালে বিকালে দলিচায় মন্দিরপূজা, সাম্প্রদায়িক 'দরবার' প্রভৃতি উপলক্ষে আসিতেন। বাবা গম্ভীরনাথ বহু শিষ্যসংবেষ্টিত হইয়া উপস্থিত হইলেও নিজে সম্প্রদায়ের ও সাম্প্রদায়িক আশ্রমের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবার জন্য দলিচায় গোলমাল ও অসুবিধা সত্ত্বেও সাধারণ সাধুদের মধ্যেই অবস্থান করিতে সংকল্প করিলেন, তাঁহার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে তিনি গমন করিলেন না। শিষ্যগণ অনেকে সেই বাড়ীতে গেলেন, কতিপয় শিষ্য তাঁহার সেবার জন্য সঙ্গে রহিলেন।

তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া দলিচায় পদার্পণ করা মাত্র, উপস্থিত সাধুমণ্ডলী মন্ত্রচালিতবৎ এক সঙ্গে দণ্ডায়মান হইয়া মহোল্লাস পূর্ব্বক তাঁহাকে এমন ভাবে সম্বর্দ্ধনা করিলেন যে, বহুদিনের বিচ্ছেদের পর তাঁহারা যেন তাঁহাদের স্নেহময়

পিতাকে নিজেদের মধ্যে অপ্রত্যাশিত ভাবে লাভ করিয়াছেন। বাবাজী যে এখানে এই প্রকার গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে অবস্থান করিবেন, শিষ্যগণ সে জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহারা রাস্তার পরপারস্থ ভাড়াটীয়া বাড়ীতে একটী পরিষ্কার কক্ষে বাবাজীর আসন প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে নিতে আসিলেন। তাঁহার নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করা মাত্র সমীপস্থ সাধুগণ অত্যন্ত আবদারের সহিত তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে শিষ্যগণকে লক্ষ্য করিয়া একবাক্যে বলিতে লাগিলেন, —"না, মহারাজ আমাদের মধ্যেই থাকিবেন, ইনি যে আমাদের, ইত্যাদি।" তাঁহাদের বদন মণ্ডল, তাঁহাদের অন্তরের ভাব, এমনই জ্বল জ্বল করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, শিষ্যগণও তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। বাবাজী তৎক্ষণাৎ সহাস্যবদনে তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"হাঁ হাঁ, আমি তোমাদের মধ্যেই থাকিব।" আশ্রমস্থ ইষ্টকনির্ম্মিত কুটীরের এক পার্শ্বে তাঁহার আসন স্থাপিত হইল, এবং সেখানেই তিনি রহিয়া গেলেন। সেখানে সাধারণ সাধুদের জন্য ভাণ্ডারায় যাহা প্রস্তুত হইত, তিনিও তাহাই আহার করিতেন। মাঝে মাঝে শিষ্যগণ কোন কোন দ্রব্য পাক করিয়া ঠাকুরের ভোগের জন্য দিয়া আসিয়া কৃতার্থ হইতেন।

দলিচায় সমাগত সাধুমণ্ডলীর সেবা ও ভাণ্ডারার সমুচিত ব্যবস্থা করিবার জন্য, সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে একজন সাধুর উপর ভার অর্পিত হইয়াছিল। তিনি বাবাজীকে পাইয়া

অত্যন্ত স্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন। বাবাজী সেখানে আসন গ্রহণ করা অবধি সেই ভারপ্রাপ্ত সাধু তাঁহার সকল প্রকার কর্ত্তব্যসম্বন্ধে বাবাজীর উপদেশ ও অনুমতি লইয়া কার্য্য করিতেন। এ সব বৈষয়িক ব্যাপারেও বাবাজীর যে অসাধারণ দক্ষতা ছিল, তাহার সাধুদের অজ্ঞাত ছিল না। তাঁহার এক-জন শিষ্য*—যিনি বহুদিন সেবকরূপে তাঁহার সঙ্গে থাকিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন,—এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে,—"বাবা যদিও চিরকাল গুফায়ই কাটাইয়াছেন, তথাপি খাওয়া দেওয়া ব্যাপারে তিনি জিনিষের যেরূপ হিসাব ধরিয়া দিতেন, তাহাতে একদিনও জিনিষ কম হইত না। তিনি গোরক্ষপুরের কর্ত্তৃত্বভার নেওয়ার পূর্ব্বে কখনও টাকা পয়সা ছুঁইতেন না, এবং কখনও কোন জিনিষ সঞ্চয় করিতেন না। কিন্তু আমাদের কাগজ কলম নিয়াও যে সব হিসাব করা ভয়ানক মুস্কিল হইত, তাহা তিনি মুখে মুখে এমন পট্ পট্ করিয়া হিসাব করিয়া দিতেন যে, আমরা দেখিয়া অবাক হইতাম্।"

বাবাজী নিজেও এই কুম্ভমেলা উপলক্ষে অনেক টাকা খরচ করিয়াছিলেন। এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি আশ্চর্য্য ব্যাপারের উল্লেখ করা যাইতেছে। বাবাজী যখন কলিকাতায় ছিলেন, তখন অনেক ভক্ত তাঁহাকে ফল ও মিষ্ট দ্রব্যাদির সহিত প্রণামী স্বরূপ টাকাও দিতেন। এ সব টাকা কার্য্য-নির্ব্বাহক শিষ্যদের নিকট থাকিত, এবং ইহা হইতে তাৎ-

---

* শ্রীযুত বরদাকান্ত বসু

কালীন ব্যয়ও নির্ব্বাহিত হইত। কিন্তু শিষ্যগণ ইহার পৃথক্ হিসাব রাখিতেন। এ বিষয়ের ভার প্রধানতঃ শ্রীযুত প্রসন্ন কুমার ঘোষ মহাশয়ের উপর ছিল। কলিকাতার আশ্রম উঠাইয়া যখন গোরক্ষপুরে প্রত্যাগমন করা হইল, তখন আয়ব্যয়ের হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, যত টাকা খরচ হইয়াছে, প্রণামী স্বরূপ আয়ও ঠিক ততই হইয়াছে, একআনাও বেশী কি কম হয় নাই। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া শিষ্যগণ বিস্ময়ে মগ্ন হইলেন। এই আয় হইতে যে টাকা খরচ করা হইয়াছিল, উমেশ বাবু তাহা পূর্ণ করিয়া একটি থলিতে পূরিয়া সব টাকা বাবাজীকে অর্পণ করিলেন। বাবাজী বলিলেন যে, —আচ্ছা, উহা রাখিয়া দেও, কুম্ভমেলার সময় খরচ হইবে। কুম্ভমেলায় কতিপয় শিষ্য, ভক্ত ও সাধুর যাতায়াতের ব্যয় ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত টাকা সাধুসেবায় ও দীনদুঃখীদের সেবায় ব্যয়িত হইয়াছিল।

এখানেও তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মৌনভাবে সমাহিত অবস্থায় স্বীয় আসনে অবস্থান করিতেন। তিনি আসন হইতে নড়িতেন না। অসংখ্য গৃহী ও সন্ন্যাসী তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়া কৃতার্থ হইয়া যাইতেন। তিনি শিষ্যদিগকে সাধুদর্শন করিতে উপদেশ দিতেন। সাধুগণ বলিতেন "মহারাজ সমাধি স্বরূপ, তাঁহার চক্ষু সর্ব্বদাই সমাধিগর্ভে নিমগ্ন।" কিন্তু তিনি যখন অর্দ্ধবাহ্যাবস্থায় বসিয়া থাকিতেন, তখন তাঁহার সৌজন্যের কোন ত্রুটী হইত না। নিতান্ত অল্প-

বয়স্ক মোহান্তগণও তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি এমন সম্ভ্রম ও সমাদরের সহিত তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিতেন যে, তাঁহারা লজ্জা ও সঙ্কোচে অবনত হইয়া পড়িতেন। সাধু সন্ন্যাসী আসিলেই তিনি তাঁহাদের প্রতি সম্মান ও আদর দেখাইতেন। গৃহী ভক্তগণও তাঁহার স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ও আদর আপ্যায়নে বিমুগ্ধ হইতেন। অথচ সব সময়েই বোধ হইত যে, তাঁহার চেতনার অতি অল্পাংশই বাহিরের সহিত যুক্ত, অধিকাংশই বিশ্বাতীত চৈতন্যস্বরূপের মধ্যে বিলীন হইয়া আছে। তাঁহার সৌজন্য, আদরাপ্যায়ন, বৈষয়িক উপদেশ, তত্ত্বোপদেশ, সবই যেন তাঁহার চেতনা-সমুদ্রের ঐ ক্ষুদ্রাংশ হইতে বুদ্‌বুদের মত, বিনা চেষ্টায়, বিনা চিন্তায়, বিনা মনঃ-সংযোগে, আপনা আপনি বাহিরে প্রকাশিত হইয়া আসিত। দর্শকগণ ব্রাহ্মীস্থিতির সহিত লৌকিক সৌজন্যের এরূপ অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখিয়া বিস্মিত ও বিমোহিত হইয়া যাইতেন। এ স্থানেও কতিপয় বাঙ্গালী ভক্ত তাঁহার নিকট ব্যাকুলভাবে কৃপাপ্রার্থী হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে যাঁহারা তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীভুক্ত হন, তাঁহাদের মধ্যে একজন যুবক সাধকের কথা একটু বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে করি। এই সাধকটি বাল্যকাল হইতেই বৈরাগ্যবান্ ও অধ্যাত্মনিষ্ঠ ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে তিনি যোগাভ্যাসে রত হন। হঠযোগের অনুশীলন করিয়া তিনি অনেক পরিমাণে

অগ্রসর হইয়াছিলেন। ধৌতি, বস্তি, প্রভৃতি কতকগুলি যোগক্রিয়ায় তিনি প্রায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। দূরদর্শন, ভবিষ্যদ্দর্শন ও সূক্ষ্মদর্শনের শক্তিও কতক পরিমাণে লাভ হইয়াছিল। অধ্যাত্মনিষ্ঠা প্রবল থাকায় এ সব তিনি বহিরঙ্গ লোকের নিকট প্রকাশ করিতেন না। তথাপি তিনি যে স্থানে বাস করিতেন তাহার নিকটবর্ত্তী অনেক লোকে তাঁহাকে একজন শক্তিমান্—'সিদ্ধাই-সম্পন্ন'—পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিত। একদিকে তিনি যেমন যোগ্যাভাসী ছিলেন, অন্য-দিকে তেমনি তিনি সেবাকার্য্যেও অত্যন্ত দক্ষ ও আগ্রহান্বিত ছিলেন। রোগিসেবা, আর্ত্তসেবা, ক্ষুধাতুরকে অন্নদান, বস্ত্র-হীনকে বস্ত্রদান, দরিদ্র বিদ্যার্থীকে বিদ্যালাভে সাহায্য, প্রভৃতি নানাপ্রকার সেবাকার্য্যে তাঁহার উৎসাহ ছিল। তাঁহার তেজ এবং স্বাধীন-চিত্ততাও অসাধারণ ছিল; কাহারও ভয়ে বা খাতিরে তিনি কপট ভাবে কথা বলিতেন না, অথবা নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতেন না।

তিনি প্রথম অবস্থায় নিজ গৃহে থাকিয়াই যোগাভ্যাস ও লোকসেবা করিতেন। অবশেষে নিজের বিষয় সম্পত্তি আত্মীয় স্বজনকে লিখিয়া দিয়া গৃহত্যাগ করেন। তিনি বদরিকাশ্রম, রামেশ্বর প্রভৃতি অনেক তীর্থ পরিভ্রমণ এবং অনেক সাধু ও মহাপুরুষের সঙ্গে কালক্ষেপন করিয়াছিলেন। তখন তিনি বাবা গম্ভীরনাথের নাম ও মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় গমন করিয়া সেখানে

এক নিঃসহায় ব্যক্তিকে পীড়িত দেখেন এবং সেবাপরায়ণ সাধক সেবাশুশ্রূষা দ্বারা কথঞ্চিৎ সুস্থ করিয়া তাহাকে কাশীধামে রাখিতে আসেন। বাবাজী তখনও হরিদ্বার যান নাই। কাশী হইতে গোরক্ষপুর গিয়া তিনি বাবাজীর সঙ্গলাভ করেন; বাবাজীর আরও কয়েকজন শিষ্য ও বাবাজীর সহিত পুনরায় হরিদ্বার গমন করেন এবং সেখানে পৌঁছিয়া বাবাজীর শিষ্যগণের সর্ব্বপ্রকার সেবার ভার গ্রহণ করেন। তিনি নিজে বাজার করিতেন, তরকারী কাটিতেন, পাকের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন, পাচককে পাক শিখাইয়া দিতেন, দেখিয়া শুনিয়া তত্ত্বাবধান করিয়া সকলকে আহার করাইতেন, এবং সকলের আহারান্তে নিজে আহার করিতেন। কাহারও ব্যারাম হইলে তিনি প্রাণপণে সেবাশুশ্রূষা করিতেন তাঁহার সেবা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইতেন।

কুম্ভমেলা হইতে গোরক্ষপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি বাবাজীর সেবায় দেহ-মন-প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। তদবধি তিনি প্রায় কখনও বাবাজীর সঙ্গ ছাড়া হন নাই। বাবাজীর সমাগত শিষ্যগণের সেবাও তিনি অত্যন্ত প্রেমের সহিত করিতেন। বাবাজী স্বয়ং একদিন বলিয়াছিলেন,—"যজ্ঞেশ্বর কৈসা প্রেম্‌সে সেবা কর্‌তা হ্যায়!"

তিনি দীক্ষাপ্রার্থী হইলে, যোগসাধনার প্রতি তাঁহার অনুরাগ দেখিয়া যোগিরাজ প্রথম তাঁহাকে হঠযোগের কতকগুলি প্রক্রিয়া দেখাইলেন, ষট্‌চক্রভেদ প্রভৃতির উপদেশ

দিলেন। তারপর বলিলেন, এমন অনেক ক্রিয়া আছে, যাহাতে হাজার বৎসর বাঁচিয়া থাকাও সম্ভব। কিন্তু তাহাই ত পরমার্থ নয়। পরমার্থের জন্য নিত্য নিরন্তর তত্ত্ববিচার ও ব্রহ্মধ্যান আবশ্যক। ইহাই রাজযোগ। হরদম বিচারে স্থিতিলাভ করিতে পারিলে একজন্মেই মুক্ত হইতে পারিবে। বাবাজীর উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি হঠযোগের ক্রিয়া পরিত্যাগ করিলেন, এবং গুরুসেবা ও তত্ত্ববিচারে আত্মনিয়োগ করিলেন।

বাবাজীর তিরোধানের পর তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার ব্যবহৃত জিনিষপত্র কাশীধামে স্থানান্তরিত করিয়া সেখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলে, এই ত্যাগী ও যোগী সাধকই আশ্রমের সেবা-পূজার ভার গ্রহণ করেন, এবং দেহত্যাগের সময় পর্য্যন্ত এই ভার বহন করেন। সেবাপূজায় তাঁহার উৎসাহ ও দক্ষতা দেখিলে অবাক্ হইতে হইত। শেষরাত্রে ৪টার সময় উঠিয়া সারাদিন ও রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত প্রায় অবিশ্রান্তভাবে তিনি সেবাকার্য্যে ব্রতী থাকিতেন। আশ্রমে অনেক সময় ভৃত্য থাকিত না। তিনি নিজে একাকী স্বহস্তে বাসনপত্র পরিষ্কার করিতেন, মন্দির ও তৎসংলগ্ন গৃহসমূহ ধৌত করিতেন, ধূপধূনা দিয়া আরতি করিতেন, বাজার হইতে পূজার ও ভোগের দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করিয়া আনিতেন, ভোগের জন্য অন্নব্যঞ্জনাদি পাক করিতেন, পূজার্চ্চনা ও ভোগ নিবেদন করিতেন, আশ্রমে অতিথি উপস্থিত থাকিলে তাঁহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক ভোজন

করাইতেন ও তাঁহাদের আরামের ব্যবস্থা করিতেন। এইরূপে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইত। হঠযোগের প্রক্রিয়া হঠাৎ পরিত্যাগ করার দরুণই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, শেষ কয়েক বৎসর তাঁহার শরীরটী ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই ব্যাধিপীড়িত অবস্থাতেও তিনি নিত্যনিরন্তর অদম্য উৎসাহে সেবাকার্য্য পরিচালিত করিতেন। অনেক দিন ভোর ৪টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত খাটিয়া সামান্য এক মুষ্টি খই খাইয়া অথবা দুখানি বাতাসার সহিত কিঞ্চিৎ জল পান করিয়া তিনি শয়ন করিতেন, এবং আবার শেষরাত্রি হইতে সেবায় ব্রতী হইতেন। কখন কখন দেখা গিয়াছে যে, রাত্রে তাঁহার ১০৩ ডিগ্রীর উপর জ্বর হইয়াছে, পরদিন কিভাবে সেবা চলিবে তাহা চিন্তা করিয়া অভ্যাগত গুরুভাইগণ একটু উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ভোরে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া দেখেন যে তাঁহার বাসন মাজা, ঘর ধৌত করা, প্রভৃতি অনেক কাজ এর মধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছে এবং তিনি কৌপীন আটিয়া খালি গায়ে অদম্য তেজে কাজ করিয়া যাইতেছেন।

এসব সময়ে তাঁহাকে নিবিড়ভাবে আসনস্থ হইয়া সাধন করিতে প্রায়ই দেখা যাইত না। কিন্তু তাঁহার সহিত আধ্যাত্মিক বিষয়ে ঘনিষ্টভাবে আলাপ করিলে বুঝা যাইত যে, তাঁহার শাস্ত্রীয় জ্ঞান বেশী না থাকিলেও সাধ্যসাধন সম্বন্ধীয় জ্ঞান যথেষ্ট ছিল, এবং এমন অনেক কথা তাঁহার নিকট শোনা যাইত, যাহা সাধনলব্ধ সূক্ষ্ম অনুভূতি ব্যতীত এরূপ পরিষ্কার

ভাবে কাহারও হৃদয়ে প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। ইনিই চিরকুমার, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, সেবাব্রতী সাধক যজ্ঞেশ্বর বসু। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর তারিখে ৺কাশীধামের আশ্রমে ইনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

বাবাজী শিষ্য ও ভক্তগণকে গঙ্গাস্নান করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি হরিদ্বারে পৌঁছিয়াই ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়া স্নান করিয়াছিলেন। কিন্তু বিষুব সংক্রান্তির দিন অত্যধিক ভিড়ের জন্য তিনি নিজে ঘাটে গিয়া স্নান করিতে পারেন নাই। সে দিন শিষ্যগণ গঙ্গাস্নান করিলেন। বাবাজীর জন্য ঘড়ায় করিয়া গঙ্গা জল লইয়া আসা হইল, তিনি আশ্রমেই ঐ গঙ্গাজল দ্বারা স্নান করিলেন। সেই দিন যোগস্নানের সময় এত ভিড় হইয়াছিল যে, অনেক লোক ঠেলাঠেলিতে ঘাটের উপর মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। তখন হরিদ্বারে কলেরারও প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। বাবাজীর শিষ্যগণ যেখানে ছিলেন, সেখানেও কলেরা আরম্ভ হইল। শ্রীযুত উমেশ বাবু সপরিবারে বাবাজীর সহিত গিয়াছিলেন। তাঁহার মুহুরীর একমাত্র পুত্র তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিল। সেই ছেলেটি রোগাক্রান্ত হইল এবং অবস্থা এত নিরাশাব্যঞ্জক হইল যে, চিকিৎসকগণও তাহার মৃত্যু নিশ্চিত বলিয়া ত্যাগ করিয়া গেলেন। উমেশ বাবু অনন্যোপায় হইয়া অত্যন্ত ব্যাকুল ভাবে বাবাজীর চরণপ্রান্তে পড়িয়া ছেলেটীর জীবন ভিক্ষা করেন। উমেশ বাবু আবদার করিতে লাগিলেন যে, ছেলেটীকে বাঁচাইতেই হইবে। তিনি

বলিয়াছেন যে, তাঁহার তখন মনে এমন ভাব হইতেছিল যে, তাঁহার নিজের স্ত্রী-পুত্রাদির মধ্যে কাহারও জীবনের বিনিময়েও যদি এই দরিদ্রের একমাত্র পুত্রের জীবন রক্ষিত হয়, তাহাতেও তিনি খুসী হইবেন। এই কথা মনে হওয়া মাত্র বাবাজী তাঁহার দিকে একটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং একটি হুঙ্কার করিলেন। উমেশ বাবু বলিয়াছেন যে ইহার অর্থ তখন তাঁহার নিকট এইরূপ মনে হইয়াছিল, 'হুঁ! তুমি এত বড় বীর হইয়াছ যে নিজজনের প্রাণের বিনিময়ে পরের ছেলের প্রাণরক্ষা করিতে প্রস্তুত!' ইহাতে তিনি একটু কম্পিত হইলেন, এবং নিজকে অপরাধী বোধ করিলেন। তারপর অনেক কাতর প্রার্থনার ফলে বাবাজী চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন,—"হাঁ, বাঁচেগা"। উমেশ বাবু নিশ্চিন্ত হইয়া বাসায় গমন করিলেন। বালকটি পরদিনই সুস্থ হইল। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী রোগাক্রান্ত হইলেন। উমেশ বাবু ইহাতে আশঙ্কান্বিত হইলেন, এবং ইহা নিজ বেয়াদবীর শাস্তি বলিয়া তাঁহার মনে ধারণা হইল। যাহা হউক, ঠাকুরের কৃপায় তিনিও ক্রমে সুস্থ হইলেন। দুর্ব্বল অবস্থাতেই তাঁহাকে লইয়া উমেশ বাবু কলিকাতার দিকে রওনা হইলেন।

বাবাজী কয়েক জন শিষ্যকে তাঁহাদের সেবাশুশ্রূষার জন্য রাখিয়া কতিপয় শিষ্য এবং সাধু সন্নাসীদের সহিত গোরক্ষপুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

সপ্তদশ অধ্যায়

ব্যবহারিক জীবনের অবসান

যোগিরাজ গম্ভীরনাথ হরিদ্বার কুম্ভমেলা হইতে গোরক্ষপুরে প্রত্যাগমন করিয়া দুই বৎসর কাল মাত্র স্থূলদেহে বিদ্যমান ছিলেন। এই দুই বৎসর প্রায় অনবরতই সেখানে ধর্ম্মার্থী শিক্ষিত বাঙ্গালী-ভদ্রলোকদিগের যাতায়াত হইত। অনেকে দীক্ষাপ্রার্থী হইতেন, অনেকে কেবলমাত্র দর্শন ও প্রণাম করিবার নিমিত্ত আসিতেন। গৃহস্থ শিষ্যগণ বৎসরের অধিকাংশ সময় অর্থোপার্জ্জনে ও সাংসারিক কর্ত্তব্যসম্পাদনে আবদ্ধ থাকিয়া দৈহিক ভাবে তাঁহার নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের চিত্ত তাঁহার স্নেহ ও প্রেমের আকর্ষণে তাঁহার চরণেই সংলগ্ন থাকিত এবং দর্শন স্পর্শনের জন্য সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত থাকিত। তাঁহারা অনেকে যখনই কর্ম্ম হইতে অবসর প্রাপ্ত হইতেন, তখনই তাঁহার নিকট ছুটিয়া যাইতেন। কেহ কেহ এত ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন যে, কর্ম্মস্থলের নিয়মিত অবকাশের অপেক্ষায় থাকিতে পারিতেন না, কর্ম্মের মধ্যেই মাঝে মাঝে ছুটী লইয়া সেখানে গমন করিতেন। কেহ কেহ স্থায়ীভাবে সেখানে অবস্থানের সুযোগ অন্বেষণ করিতেন। এইরূপে সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়াই গোরক্ষনাথ মন্দিরে শিষ্য ও ভক্তদের গমনাগমন হইতে থাকিত।

শারদীয়া পূজার সময় বাঙ্গালীদের সকল প্রকার অফিস ছুটি থাকে। সেই সময় গোরক্ষনাথ মন্দির প্রায় বাঙ্গালীর আশ্রমেই পরিণত হইত। তখন সেখানে এত ভিড় হইত যে, স্থানের সঙ্কুলান হওয়া কঠিন হইয়া উঠিত। স্ত্রীলোক-দের জন্য মন্দিরসংলগ্ন উদ্যানগৃহ নির্দ্দিষ্ট থাকিত; পুরুষগণ যিনি যেখানে স্থান করিতে পারিতেন, সেখানেই রাত্রিতে কয়েক ঘণ্টার জন্য মাথা গুঁজিয়া থাকিতেন। সারা দিনরাত্রি একটানা নিরাবিল আনন্দের হিল্লোল খেলিতে থাকিত। এই সকল নরনারীর যে এক একটা সংসার আছে ও সাংসারিক দায়িত্ব আছে, তাহা তখন তাঁহারা প্রায় ভুলিয়াই যাইতেন। সমস্ত চিন্তা ভাবনা, জ্বালা যন্ত্রণা, প্রথম প্রণামের সঙ্গে সঙ্গেই শ্রীগুরুর চরণে সমর্পণ করিয়া, তাঁহারা 'রাজার দুলালের' ন্যায় আনন্দস্রোতে ভাসিতে থাকিতেন। তাঁহাদের আহারাদি সমস্ত বিষয়ের ব্যবস্থা গুরুজীই করিতেন। সে সময়ের জন্য তাঁহারা একেবারে নিশ্চিন্ত।

তাৎকালীন অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মনে হইত যে, শিষ্যসন্তাপহারী গুরু গম্ভীরনাথ শিষ্যদিগকে কার্য্যতঃ বুঝাইয়া দিতেছেন যে, নিজেকে সর্ব্বদা গুরুগৃহে গুরু সন্নিধানে অবস্থিত বোধ করিতে পারিলে, সারা জীবনই এইরূপ নিশ্চিন্ত থাকা যায়; জীবনের সকল বিভাগের সমস্ত দায়িত্ব 'শ্রীগুরবে নমঃ' বলিয়া তাঁহার চরণে সমর্পণ করিতে শিখিলে, সারা-জীবনই এইরূপ শিশুর মত আনন্দ হিল্লোলে নাচিতে নাচিতে

সংসারবক্ষে বিচরণ করা যায়। বাস্তবিক ত সদগুরু সর্ব্বদা শিষ্যের নিকটেই থাকেন। তিনি কখন কখন শিষ্যদের বলিতেন,—"হাম্‌তো তুম্হারে সাথ সাথ হি হ্যাঁয়"। স্থূলদেহে প্রত্যক্ষীভূত হওয়া বা না হওয়াতে তাঁহার উপস্থিতির ত কোন তারতম্য হয় না। কিন্তু তবু গুরুজীর দৈহিক সান্নিধ্যে শিষ্যগণ আপনাদিগকে যেরূপ হাল্‌কা বোধ করিতেন, যেরূপ সর্ব্বপ্রকার কুচিন্তা ও দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইতে পারিতেন, তিনি বস্তুতঃ সর্ব্বদা শিষ্যদের সমগ্র জীবনকে অধিকার করিয়া অতি নিকটে বর্ত্তমান থাকিলেও, কেবলমাত্র স্থূলদেহের নৈকট্যের অভাবে তাহা সম্ভব হয় না কেন?

মানবজীবনে অনুভূতির তারতম্যেই সকল প্রকার তারতম্য হয়; সকল প্রকার বৈচিত্র্য ও বৈষম্যের মূলে অনুভূতির বৈচিত্র্য ও বৈষম্য। অনুভূতি দ্বারাই মানবজীবন গঠিত এবং অনুভূতির বৈশিষ্ট্য অনুসারেই মানুষের কর্ম্ম ও ভোগের বৈশিষ্ট্য হয়। বস্তুতঃ একই প্রকার অবস্থা বিদ্যমান থাকিলেও, একপ্রকার অনুভূতির ফলে এক ব্যক্তি তাহাতে সুখ প্রাপ্ত হয়, অন্য প্রকার অনুভূতির ফলে অপর এক ব্যক্তি তাহাতে জ্বালা যন্ত্রণায় জর্জ্জরিত হয়। স্বীয় অনুভূতিকে তত্ত্বানুগত করাই মানুষের প্রধান সাধন। তত্ত্বতঃ যাহা সত্য, অনুভূতি তদ্রূপ হইলেই মঙ্গল ও আনন্দ লাভ হয়, কারণ তত্ত্বতঃ সকলই যে মঙ্গলময় ও আনন্দময়ের সত্তারই অভিব্যক্তি।

তত্ত্বতঃ যাহা সত্য, তাহার প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ অনুভূতি যে পর্য্যন্ত না হয়, যে পর্য্যন্ত জ্ঞানদৃষ্টিতে তাহা দর্শন করা না যায়, সে পর্য্যন্ত বিশ্বাসদৃষ্টি ও বিচারদৃষ্টির সাহায্যে তাহা স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করা আবশ্যক, এবং তদনুসারে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া জ্ঞানদৃষ্টিতে অনুভব করিবার যোগ্যতা লাভের জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। বাবা গম্ভীরনাথ তাঁহার উপদেশের মধ্যে এই দুইটী কথা অনেক সময়ই বলিতেন—'বিশ্বাস রাখ্‌না' এবং 'বিচার কর্‌না'। যে পর্য্যন্ত গুরুর দৈহিক সান্নিধ্যের অভাবেও তাঁহাকে ভিতরে বাহিরে সাক্ষাৎ অনুভব করিবার উপযুক্ত জ্ঞানদৃষ্টি প্রস্ফুরিত না হয়, যে পর্য্যন্ত গুরুর যথার্থ তাত্ত্বিক স্বরূপ হৃদয়ে পূর্ণভাবে প্রকাশিত না হয়, সে পর্য্যন্ত এরূপ বিশ্বাস অনুশীলন করা উচিত যে, গুরু ঐহিক ও পারলৌকিক সকল ভার গ্রহণ করিয়া আছেন, সংসারের সকলই তাঁহার, তিনি আমার জীবনের ও জগতের সকল স্থান ব্যাপিয়া স্বীয় মহিমায় বিরাজ করিতেছেন, আমি তাঁহারই শিশু এবং তাঁহার সহিতই আমার নিত্যসম্বন্ধ। বিশ্বাসের সহিত বিচারের অনুশীলন করিতে করিতে এবিষয়ে নিঃসংশয় হইয়া, অহংকার ও মমতা বর্জ্জন পূর্ব্বক নিজকে সংসারবিমুক্ত ও তাঁহার সহিত নিত্যযুক্ত অনুভব করিবার চেষ্টা করা প্রয়োজন। এই বিশ্বাস ও বিচার যখন স্বভাবে পরিণত হইবে, জীবনের সকল বিভাগ এইরূপ বিশ্বাস ও বিচারের অনুবর্ত্তী হইয়া পরিচালিত হইতে হইতে যখন সকল প্রকার কালিমা হইতে মুক্ত হইবে, তখন

জ্ঞানদৃষ্টি সম্পূর্ণ উন্মীলিত হইবে, তখন গুরুর সহিত নিজের, কেবলমাত্র দূরত্ব নয়, কোনরূপ ভিন্নতাও অনুভূত হইবে না, তখন গুরু ব্রহ্মময় বলিয়া অনুভূত হইবে এবং শিষ্য অহংশূন্য ও গুরুময় হইয়া সৎস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। যোগিরাজ বলিতেন—'বিশ্বাস রাখ্‌না'—'বিচার কর্‌না'—'সব তরফ আচ্ছা হো যায়গা।' যে পর্য্যন্ত জ্ঞানদৃষ্টি উন্মীলিত না হয়, সে পর্য্যন্ত বিশ্বাসদৃষ্টি এবং বিচারদৃষ্টির সাহায্যেও যদি জীবনের সকল বিভাগে গুরুর সান্নিধ্য অনুভব করা যায়, তাহা হইলেও সংসারসমুদ্রে সেই নিশ্চিন্তভাব ও প্রেমের আনন্দতরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে নাচিতে নাচিতে পরপারের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, গুরুজীর দৈহিক সামীপ্যের অভাবেও নিজকে অনাথ মনে হয় না, এবং অভিমানের ও স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া সংসারের কুচিন্তা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে হাবুডুবু খাইতে হয় না।

যাহা হউক, গুরুর প্রতি সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হইয়া ও গুরুভ্রাতাদিগের সহিত প্রেমের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া, গুরুর সংসারে, গুরুর সন্নিধানে, জীবন যাপন করাতে যে কিরূপ আনন্দ, এবং সে আনন্দ যে নিজের (অভিমানের) সংসারের সকল প্রকার ভোগের আনন্দ অপেক্ষা কত উচ্চ, কত প্রসারিত ও কত গভীর, সদ্‌গুরু গম্ভীরনাথ মাঝে মাঝে শিষ্যমণ্ডলীকে আকর্ষণ পূর্ব্বক নিজ সকাশে একত্রিত করিয়া তাহা তাঁহাদিগকে অনুভব করাইয়া দিয়াছেন।

শারদীয় পূজার সময় গোরক্ষপুরে 'নবরাত্র' উৎসব হয়। তদুপলক্ষে রামলীলা প্রভৃতির অভিনয় হয়। অভিনেতৃগণ ও কীর্ত্তনকারিগণ গোরক্ষনাথ মন্দিরে আসিয়া অভিনয় ও কীর্ত্তন করিয়া থাকে। বাবাজী তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থে শিষ্যমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত হইয়া তাহা দর্শন ও শ্রবণ করিতে বসিতেন। এই সব ধর্ম্মবিষয়ক অভিনয় ও সঙ্গীত হিন্দুসমাজে বহুকাল হইতে জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, সমাজসম্বন্ধীয়, নীতিসম্বন্ধীয় জ্ঞান-বিস্তারের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যাত্রাভিনয়, কীর্ত্তন, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদির পাঠ, কথকতা ও গান, প্রভৃতি লোকরঞ্জক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সমুহ শাস্ত্রাধ্যয়নে ও তত্ত্ববিচারে পরাঙ্মুখ ও অসমর্থ জনসাধারণের চিত্তকে আকর্ষণ করে, হৃদয়ে আনন্দ প্রদান করে, এবং তৎসঙ্গে পুস্তকাদি পাঠের সাহায্য ব্যতীতও তাহাদিগকে পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ে শাস্ত্রসঙ্গত নানাপ্রকার শিক্ষাপ্রদান করে। এই ভাবেই শাস্ত্রের অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্ব, অনেক মহাপুরুষের সাধনলব্ধ জ্ঞান, সমাজের নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে; এই সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ফলে হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরে অসংখ্য নিরক্ষর লোক থাকিলেও সম্পূর্ণ অজ্ঞলোকের সংখ্যা অধিক নয়। সাধারণ শিক্ষা বিস্তারের এরূপ সুকর উপায় আর নাই। বাবা গম্ভীরনাথ এই সকল অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া, অনুষ্ঠান-কারীদিগকে উৎসাহ ও পুরস্কার প্রদান করিয়া, সমাজের পক্ষে যে ইহারা কল্যাণকর তাহা শিক্ষা দিতেন।

দশহরার দিবস গোরক্ষমন্দিরের সংলগ্ন বিস্তৃত ময়দানে বিশেষ মেলা বসে। বহুদূরবর্ত্তী স্থান হইতে বহু লোক সেখানে আগমন করিয়া থাকে। সেখানেও রামলীলা প্রভৃতির অভিনয় হয়। বাবা গম্ভীরনাথ হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক সদর রাস্তা দিয়া ঘুরিয়া সেই মেলায় গিয়া উপস্থিত হইতেন। যাইবার পথে তিনি দরিদ্র ভিক্ষুকদের মধ্যে পয়সা বিতরণ করিতে করিতে যাইতেন। সাধুগণ, শিষ্যগণ ও ভক্তগণ আনন্দোৎসব করিতে করিতে পদব্রজে তাঁহার সহিত গমন করিতেন। দীপালির রাত্রিতে মন্দির দীপমালায় সুসজ্জিত হয়; আত্ম-সমাহিতচিত্ত যোগিরাজ মাঝে মাঝে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই দীপসজ্জা দর্শন করিতেন। এইপ্রকার হিন্দুধর্ম্মের সর্ব্ববিধ বহিরঙ্গ অনুষ্ঠানেও শ্রদ্ধাশীল হইতে তিনি শিষ্য ভক্তদিগকে শিক্ষা দিতেন।

এইরূপে শিষ্যগণ গোরক্ষনাথ মন্দিরে গুরুসন্নিধানে আনন্দোৎসবে সমগ্র পূজার ছুটী অতিবাহিত করিতেন। বাবাজী অধিকাংশ সময় নিজের স্বাভাবিক মৌনভাবে সমাহিত অবস্থায় স্বীয় আসনে অবস্থিত থাকিলেও, শিষ্য ও ভক্তগণের কতদূর আদরযত্ন করিতেন, তাঁহাদের আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করিবার দিকে কতদূর দৃষ্টি রাখিতেন, তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পরে প্রদত্ত হইবে।

শিবরাত্রির সময় বাবা গম্ভীরনাথ গোরক্ষপুরের নিকটবর্ত্তী, 'যোগী চোক' নামক স্থানে গমন করিতেন। সেখানে প্রতিষ্ঠিত

শিবলিঙ্গ প্রসিদ্ধ; এবং সেখানে একটি পুষ্করিণী আছে, তাহাতে স্নান করিলে কুষ্ঠাদি মহাব্যাধি হইতে মুক্ত হওয়া যায় বলিয়া প্রবাদ আছে। শিবরাত্রির সময় সেখানে মেলা হয় এবং নানাস্থান হইতে বহুলোক সেখানে গমন করে। তিরোধানের কিছুদিন পূর্ব্বে বাবাজী অসুস্থ অবস্থাতেও সেখানে গমন করিয়াছিলেন। সে সময় তিনি সেখানে তিনজন ভদ্রলোক এবং একজন ভদ্রমহিলাকে দীক্ষা প্রদান করেন এবং সেখানেই তাঁহার দীক্ষাপ্রদান ব্রতের পরিসমাপ্তি হয়।

গ্রীষ্মের দুইমাস বাবাজী গোরক্ষনাথের জমিদারীর অন্তর্গত কোন গ্রামে বাস করিতেন, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি সাধারণতঃ কোন শিষ্যকে সেখানে সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিতেন না। দু' একজন বিশিষ্ট সেবক সঙ্গে থাকিত।

হরিদ্বার হইতে প্রত্যাগমনের পর যে দুই বৎসর মাত্র তিনি স্থূলশরীরে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার মধ্যে উপরোক্ত দুই স্থান ব্যতীত আর কোথাও গমন করেন নাই।

১৩২৩ বঙ্গাব্দের পৌষমাসে হঠাৎ একদিন বাবাজীর কম্প জ্বর হয়। হাঁপানি ও কফের কিছু উপদ্রব পূর্ব্ব হইতেই ছিল, এই সময় তাহারও প্রকোপ বর্দ্ধিত হয়। তদবধিই তাঁহার শরীর দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। বরদাকান্ত বসু ও যজ্ঞেশ্বর বসু কায়মনপ্রাণে তাঁহার সেবা করিতে থাকেন। কালীনাথ ব্রহ্মচারীর পরে এই দুইজন ভক্ত যোগিরাজের কায়িক সেবার বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে তিনি

বহির্জগতের সহিত বাহ্য-সম্বন্ধও কমাইয়া দেন। চেতনার যে এক আনা অংশ দিয়া তিনি লোকসমাজের সহিত যোগ রাখিতেন, তাহাও যেন অন্তর্নিবদ্ধ হইতে লাগিল। চেতনা যেন দেহকেও ক্রমশঃ ছাড়িতে চাহিতেছে। শরীর যখন বাহির হইতে বেশী ক্লিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হইত, তিনি তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, 'সংশান্ত সর্ব্বেন্দ্রিয়' হইয়া অন্তরে ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ করিতেন। বাবা শান্তিনাথজী বলিয়াছেন যে, ক্রমশঃ বাবাজীর অন্তর্মুখীনতা ও বহির্জগতের প্রতি ঔদাসীন্য এত বৃদ্ধি পাইতেছিল যে তিনি শীঘ্রই বহির্জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিবেন বলিয়া তাঁহার চিত্তে আশঙ্কা জন্মিয়াছিল। কেহ তাঁহার শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলে, নিদ্রোত্থিতের ন্যায় তিনি বলিতেন, "আচ্ছা হ্যাঁয়"।

শিবরাত্রির সময় তিন দিনের জন্য বাবাজী 'যোগী চৌক' ঘুরিয়া আসিলেন। তাঁহার শরীর তখনও অত্যন্ত দুর্ব্বল। কিছুদিন পরে হঠাৎ তিনি একদিন বলিলেন যে তিনি শীঘ্রই মফঃস্বল যাইবেন। কিন্তু হায়! শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কাহারও মনে তখন এ প্রশ্ন উদিত হইল না যে, এই মফঃস্বল শব্দের যথার্থ অর্থ কি, কোন্ মফঃস্বলে গমন করিবার জন্য তিনি এ ভাবে স্থূল শরীরের ক্ষয় সাধন করিতেছেন! কাহারও প্রাণে এ আশঙ্কার উদয় হইল না যে, যোগীশ্বর মহাপুরুষ তাঁহার ব্যবহার-ক্ষেত্র-রূপ সদরের লীলা শেষ করিয়া, চিরতরে সর্ব্ব ব্যবহারাতীত ব্রহ্মধামরূপ সম্যক্ প্রশান্ত সমাধি গম্ভীর

পরিপূর্ণানন্দনিলয় মফঃস্বলে আপনাকে বিলীন করিবার জন্যই এই উদ্যোগপর্ব্ব আরম্ভ করিয়াছেন। স্থূল দৃষ্টিতে তাঁহারা ধরিয়া লইলেন যে মঠাধ্যক্ষ গম্ভীরনাথ মঠের সম্পত্তির অন্তর্গত কোন গ্রামে গমন করিবার জন্য প্রস্থাব উত্থাপন করিতেছেন। অসুখের কথা উল্লেখ পূর্ব্বক তাঁহারা আপত্তি উত্থাপন করিলে তিনি বলিলেন যে, গন্তব্য স্থানের নির্জ্জন প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যে ও পবিত্র জলবায়ুতে স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে ভাল হইবার সম্ভাবনা।

তাঁহার শিষ্যগণ আর একবার তাঁহাকে কলিকাতায় আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। অসংখ্য নরনারী তাঁহার চরণাশ্রয় লাভ করিবার জন্য সমুৎকণ্ঠিত ছিলেন। গোরক্ষপুর পর্য্যন্ত যাইবার সামর্থ্য ও সুবিধা অনেকের ছিল না। তিনি কলিকাতায় আসিলে তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইবেন, এই ভরসায় তাঁহারা উদ্‌গ্রীব হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারা মনে মনে তাঁহার কলিকাতা আগমনের জন্য প্রার্থনা এবং তাঁহার শিষ্যদিগকে তদ্বিষয়ে বন্দোবস্ত করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছিলেন। প্রকাশ্যভাবে এই উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহাকে আনয়ন করিবার চেষ্টা করাই অসম্ভব। কিন্তু একটি সুযোগ উপস্থিত হইল। পূর্ব্বে তাঁহার একটি চক্ষুতে অস্ত্র চিকিৎসা হইয়াছিল। অপর চক্ষুটি এখন অস্ত্রোপচারের যোগ্য হইয়াছে। তদুপলক্ষে পুনরায় কলিকাতা গমনের জন্য সাগ্রহ আবেদন করা হইতে লাগিল।

শিষ্যদিগকে শান্ত করিবার জন্য তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তিনি বলিলেন যে, মফঃস্বল হইতে ফিরিয়া আসিলে কলিকাতায় যাওয়া হইতে পারে। মফঃস্বল যাইবার দিন-স্থির করিবার জন্য পঞ্জিকা দেখান হইল। ৮ই চৈত্র ২১শে মার্চ্চ বুধবার বারুণী ত্রয়োদশীতে যাত্রার দিন স্থির হইল। কিন্তু মায়ামুগ্ধ শিষ্য ও সেবকগণের কাহারও বুক এই যাত্রার দিনের কথা শুনিয়া তখন কাঁপিয়া উঠে নাই, কেহই ইহা তাঁহার মহাযাত্রার দিন বলিয়া কল্পনা করিতে পারেন নাই। ধন্য মায়াময়ের মায়া!

৫ই চৈত্র রবিবার তাঁহার হাঁপানি ও কফের উপদ্রব কিছু কিছু বৃদ্ধি পায়। এ অবস্থায় তিনি কিরূপে মফঃস্বলে যাইবেন এইরূপ কাতর জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি কতক্ষণ মৌন অবলম্বন করিয়া থাকিয়া বলিলেন যে, সেখানে ত বিপদের কোন কারণ নাই, সেখানে গেলেই স্বাস্থ্য ভাল হইয়া যাইবে। কিন্তু সে স্থান যে সকল ভাল মন্দের অতীত চিরশান্তিধাম, তাহা স্পষ্টরূপে বলিলেন না।

তাঁহার অসুস্থতার সংবাদ শিষ্যগণকে জ্ঞাপন করিবার জন্য তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি নিষেধ করিতেন। তাঁহার অসুখের সংবাদ শিষ্যগণ যথাসময়ে জানিতে পারিলে গোরক্ষনাথ মন্দিরে তাঁহাদের স্থান সঙ্কুলান হওয়া অসম্ভব হইত, ইহা সহজেই অনুমেয়। যাঁহাকে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত আছেন, যিনি গোরক্ষনাথ মন্দিরে স্বীয় আসনে

আত্মসমাহিত ভাবে অবস্থান করিয়াই তাঁহাদের ঐহিক ও পারত্রিক সর্ব্বপ্রকার কল্যাণসাধন করিতেছেন জানিয়া তাঁহারা সকলরকম বিঘ্ন বিপত্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছেন, সেই নাথজী তাঁহাদিগকে অনাথ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, এ সংবাদ যদি যথাসময়ে তাঁহারা অবগত হইতে পারিতেন, তবে যে শিষ্য যেখানে যে অবস্থায় থাকিতেন, সেখান হইতে সেই অবস্থাতেই ছুটিয়া তাঁহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইতেন। তাঁহারা তাঁহার স্থূলশরীরের সহিতই যে বিশেষভাবে পরিচিত, তাঁহার সর্ব্বগত সচ্চিদানন্দ স্বরূপের সহিত ত তাঁহাদের বিশেষ পরিচয় হয় নাই। তাঁহার স্থূলশরীরের অভাব হইলে যে তাঁহারা আপনাদিগকে অনাথ বোধ করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? বাবাজী তাঁহার অন্তর্দ্ধানের সম্ভাবনা কাহাকে জানিতে দিলেন না। তিনি এমন কতকগুলি ব্যবস্থা করিলেন যে, যাঁহারা তাঁহার চরণপ্রান্তে থাকিয়া তাঁহার শরীরের সেবায় নিযুক্ত তাঁহাদের মনেও কোনরূপ আশঙ্কার উদয় হইল না।

বাবা ব্রহ্মনাথ, ব্রহ্মচারী যজ্ঞেশ্বর ও শ্রীযুত বরদাকান্ত বসু তাঁহার সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। ব্রহ্মচারী যজ্ঞেশ্বরও তখন কিঞ্চিৎ অসুস্থ হইয়া পড়েন। সে সময় সেবার কোনরূপ ত্রুটী না হয়, এইহেতু বাবা শান্তিনাথ ও বাবা নিবৃত্তিনাথকে তার করা হইল, বাবাজী ইহা অনুমোদন করিলেন। তাঁহারা তার পাইয়াই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বরদা বাবু চিঠিপত্রে বাবাজীর শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও অসুস্থতার কথা স্থানে স্থানে

লিখিয়া জানাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে আশঙ্কার কোন কারণ আছে বলিয়া কেহই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই।

অকস্মাৎ ৭ই চৈত্র মঙ্গলবার বরদা বাবুর নিকট হইতে টেলিগ্রাম পাওয়া গেল যে, গুরুদেব অত্যন্ত অসুস্থ। এই টেলিগ্রাম প্রাপ্তি মাত্র, যাঁহারা সুবিধা পাইলেন, তাঁহারা সেই দিনের গাড়ীতেই গোরক্ষপুরাভিমুখে যাত্রা কারলেন, অনেকে পরদিনের গাড়ী ধরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু গাড়ী ধরিবার পূর্ব্বেই আবার টেলিগ্রাম পাওয়া গেল যে, সব শেষ! এইরূপ অকস্মাৎ বজ্রপাতে শিষ্যদের প্রাণে কি অবস্থা হইল, তাহার আভাস দিতে চেষ্টা করাও বাতুলতা মাত্র। ১৩২৩ বঙ্গাব্দের ৮ই চৈত্র (১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ) বুধবার মধুকৃষ্ণা-ত্রয়োদশী তিথিতে মহাবারুণীর দিনে বেলা ১০ ঘটীকা ১৫ মিনিটের সময় যোগিরাজ গম্ভীরনাথের ব্যবহারিক জীবনের অবসান হইল। তাঁহার তিরোধানের অব্যবহিত পরে (২৩শে মার্চ্চ, ১৯১৭ ইং) শ্রীযুত বরদাকান্ত বসু বিভিন্ন স্থানের গুরুভাইদের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইতেছে।

* * * *

"—গত বুধবার ২১শে মার্চ্চ বেলা ১০ ঘটীকা ১৫ মিনিটের সময় আমাদের হৃদয়রাজ পরম দেবতা, আমাদের আশা ও শান্তির রাজ্যে আগুন লাগাইয়া, আমাদিগকে চিরজীবন তপ্ত ভোগ-সাগরে হাবুডুবু খাইতে ফেলিয়া, অনন্তধামে চলিয়া

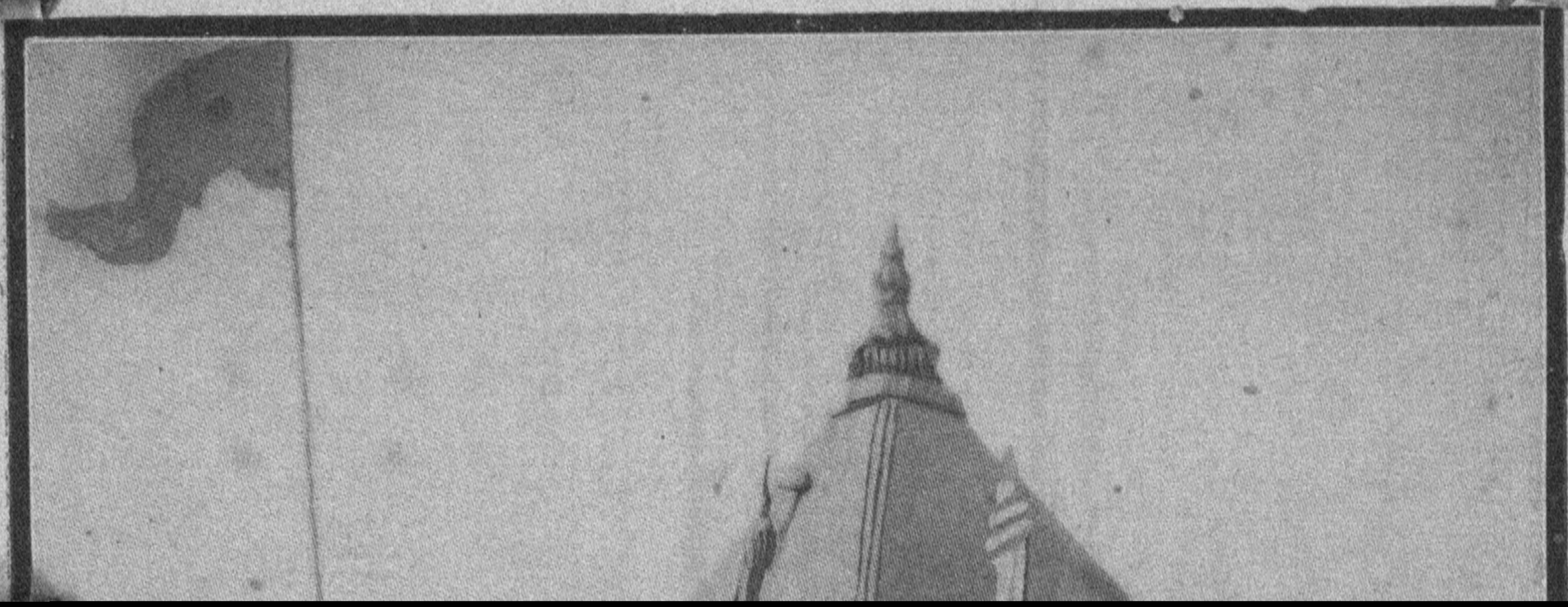

গিয়াছেন। এত হঠাৎ পূর্ব্বে কোন আভাস না দিয়া যে আমাদিগকে অনাথ করিয়া চলিয়া যাইবেন, তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই। এমন কি বিজয়ার (তিরোধানের) পূর্ব্বদিবসও তাঁহার ব্যবহারে ইহার লক্ষণ আমাদিগকে জানিতে দেন নাই। এমন অবসর দিলেন না, যাহাতে সমস্ত ভাইদিগকে তাঁহার চরণপ্রান্তে ডাকিয়া আনিয়া, সমগ্র হৃদয়গুলি তাঁহার চরণতলে এক সঙ্গে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইতে পারিতাম।

* * * *

প্রাতে ৪টার সময় অভ্যাস মত বাবা উঠিয়া বিছানায় বসিয়াছিলেন ; * * * শেষ সময় পর্য্যন্ত তিনি একাসনে ধ্যানস্থ অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন, কোন কথাই বলেন নাই।

তাঁহার পবিত্র দেহ যথাবিধি আশ্রমে প্রবেশ করিবার পথের বাম পার্শ্বে সমাহিত করা হইয়াছে।" * * *

বাবাজীর বাঙালী শিষ্যগণের সমবেত চেষ্টায় এই সমাধি-স্থানের উপর একটি সুরম্য প্রস্তর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। ১৩২৯ বঙ্গাব্দে ১১ই আশ্বিন শ্রীশ্রীমহাষ্টমী তিথিতে শিষ্যগণ সম্মিলিত হইয়া প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া এবং শোকে ও আনন্দে আত্মহারা হইয়া শ্রীমন্দির-প্রতিষ্ঠা-মহোৎসব উদযাপিত করেন। সমাধি-আসনে প্রত্যহ রীতিমত সেবা পূজার ব্যবস্থা হয়। ইহার কয়েক বৎসর পরে অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে সমাধিবেদীর উপরে শ্বেত মর্ম্মরপ্রস্তর নির্ম্মিত একটি পূর্ণাকৃতি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়।

অষ্টাদশ অধ্যায়

ভক্তবাৎসল্য ও জীবপ্রেম

বাবা গম্ভীরনাথের ভক্তবাৎসল্য সম্বন্ধে তাঁহার একজন শিষ্য* লিখিয়াছেন,—"যাহারা তাঁহার নিকট আসিত, তাহারা আসিয়াই অনুভব করিত, যেন গোরক্ষপুর তাহাদের চির-পরিচিত স্থান, এবং বাবাজীর সহিত তাহাদের কতদিনের পরিচয়। প্রবাস-প্রত্যাগত সন্তানকে পিতামাতা যেমন ভাবে আদরযত্ন করেন, চিরপুরাতন আপনার জিনিষকে নূতন করিয়া পাইলে স্বভাবতঃ যেরূপ ব্যবহার লোকে করিয়া থাকে, বাবাজী তাঁহার শিষ্যগণের সহিত সেইরূপ চিরপরিচিত স্নেহ-পরিপূর্ণ সুহৃদের ন্যায় ব্যবহার করিতেন। প্রায়শঃ দেখা যাইত, কোন ভক্ত আসিবার পূর্ব্বেই তাহার আহারাদির ব্যবস্থা হইয়া আছে। এই সব ব্যাপার এমন ভাবে ঘটিত যে বিশেষ অনুসন্ধিৎসুর চক্ষু ব্যতিরেকে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত না! তাঁহার ব্যবহারে জননীর কোমলতা এবং পিতার উদারতা ও সহৃদয়তার একত্র সমাবেশ লক্ষিত হইত। তাঁহার ব্যবহার যে কেমন, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই, তাহার তুলনা নাই। অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ পিতা মাতৃহীন সন্তানের প্রতি যেরূপ ব্যবহার

---

*কুচবিহার কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রলাল ভট্টাচার্য্য

করেন, তাহা কতকটা তাহার অনুরূপ। তাঁহার শান্ত-স্নিগ্ধ সস্নেহ দৃষ্টি, মৃদুমধুর সম্ভাষণ, যে দেখিয়াছে ও শুনিয়াছে, সেই বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার মধ্যে কত স্নেহ, কত করুণা, কত শুভাকাঙ্ক্ষা, কত ক্ষমা, কত সহিষ্ণুতা। পিতামাতার আদর হইতেও তাঁহার আদর কত মধুর, কত উচ্চস্তরের, তাহা যে তাঁহার আদর লাভ করিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে। পিতামাতা আদর যত্ন করেন বটে, তাতে প্রাণের অভাব নাই, মায়ামমতার অভাব নাই, কিন্তু পিতামাতা যে শিশুর মতই অসহায়। আমাদের দৈহিক কিংবা মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে পিতামাতা তাহার উপশমার্থ কি করিতে পারেন? যুক্তকরে ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। কাজেই তাঁহাদের আদর যত্নের ভিতরে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার তীব্র তাপ সর্ব্বদাই লক্ষিত হয়, তাঁহাদের অক্ষমতার পরিচয় প্রতিপদে পাওয়া যায়। কিন্তু বাবাজীর ব্যবহারে কোন উৎকণ্ঠার আভাস কদাপি পাওয়া যাইত না। তিনি সব জানিতেন, সব বুঝিতেন, সব করিতে পারিতেন, কাজেই তাঁহার ব্যবহারের ভিতরে কোন উৎকণ্ঠার চিহ্ন ছিল না, কোনরূপ অমঙ্গলের আশঙ্কা ছিল না। তিনি যে শুভাশুভের পরপারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাই তাঁহার ব্যবহার অচঞ্চল, স্থির, স্নিগ্ধ, মধুর ও করুণ ছিল। তাঁহার মুখে চিরপ্রসন্নতা বিরাজ করিত। কাজেই তাঁহার স্নেহধারা পিতামাতার স্নেহধারা হইতেও অধিকতর প্রীতি-প্রদ ছিল। তাঁহার নিকটে আমরা যখন থাকিতাম,

তখন আমরা নির্ভীক ভাবে বিচরণ করিতাম। তাঁহার সান্নিধ্য আমাদিগকে সকল প্রকার ভয়ভাবনা ভুলাইয়া দিত। তাঁহার স্নেহধারা আমাদিগকে নিরাবিল আনন্দের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিত।"

বাবাজীর এই বাৎসল্যের নিদর্শন স্বরূপ দু'চারটী মাত্র ঘটনা যদি উল্লেখ করা যায়, তাহা কাহাকেও পরিতৃপ্তির আনন্দ দিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার ব্যবহারিক জীবনের কোন ঘটনাই খুব বড় রকমের, জাঁকাল রকমের ঘটনা নয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারের ভিতর দিয়াই তাঁহার লৌকিক জীবনে প্রেমমাখা ভাবসমূহ প্রকাশ পাইত। ঘটনাগুলি বাহিরে যেমন দেখা দিয়াছে, ঠিক তেমনি ভাবে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিলে, মহাপুরুষ-চরিত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বহির্মুখ লোক-দিগের নিকট সেই সব ঘটনার অন্তর্নিহিত রহস্য প্রকাশিত হইবে না। সুতরাং তাহাদের নিকট এই বর্ণনা প্রায় অর্থহীন হইবে। অন্যদিকে, যাঁহারা মহাপুরুষচরিত্র প্রত্যক্ষ ভাবে পরিদর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এই প্রকার সামান্য ঘটনার ভিতর দিয়া অতলস্পর্শী প্রাণ সমুদ্রের যে মধুরিমার পরিচয় স্ব স্ব হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াছেন, ভাষার বর্ণনার মধ্যে তাহা পরিস্ফুট দেখিতে না পাইয়া এই বর্ণনাকে নিতান্ত শুষ্ক বোধ করিয়া ক্ষুণ্ণ হইবেন। বাস্তবিকই, "তাঁহার ব্যবহার যে কেমন, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই।" সাধারণ মনুষ্যের অগভীর হৃদয়ের ভাবসমূহও ভাষায় সম্যক্

রূপে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, যদিও তাহার অধিকাংশই দেহেন্দ্রিয়ের ব্যাপারের মধ্যে অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু যে মানুষটী অসাধারণ, যাঁহার হৃদয়-সমুদ্রের গভীরতা ও বিস্তারের কোন ইয়ত্তা পাওয়া যায় না, যাঁহার চেতনার প্রায় পনর আনা মাত্র লৌকিক জীবনের বাহ্য ব্যবহারে প্রকাশিত, সেই মানুষটীর হৃদয়ের ভাব তাঁহার বাহিরের কার্য্য বর্ণন দ্বারা প্রকাশ করিবার কল্পনাও বাতুলতা।

ভাষা যেখানে বাস্তবকে প্রকাশ করিতে পারে না, অথবা বাস্তব সম্বন্ধে একটা যথার্থ ধারণা উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না, সেখানে ভাষার পক্ষে নীরবতা অবলম্বন করাই সমীচীন, সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন এই মহাপুরুষের জীবন আলোচনা করিবার জন্য এই গ্রন্থ আরম্ভ করা হইয়াছে, তখনই এই সমীচীনতাকে অতিক্রম করা হইয়াছে। এই অপরাধ সম্পূর্ণ-রূপে স্বীকার করিয়া লইয়াই ইহাতে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য মহাযোগীর জীবন বর্ণন করা নয়, তৎসম্বন্ধে সামান্য কিছু ইঙ্গিত দেওয়া মাত্র। যাঁহারা মহাপুরুষ-জীবন দেখিবার ও আলোচনা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা এই জীবনহীন ইঙ্গিত অনুধাবন করিয়া তাহার অন্তরালে যে জীবনটী আছে, তাহা কল্পনা ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সাহায্যে বুঝিয়া লইবেন। এই উদ্দেশ্যেই অন্যান্য ঘটনার ন্যায় শিষ্য ও ভক্তদের প্রতি তাঁহার বাৎসল্যের পরিচায়ক কয়েকটি মাত্র ঘটনা উল্লেখ করা হইতেছে।

সাধারণতঃ কোন ভক্ত আশ্রমে উপস্থিত হইলে, ভক্তবৎসল বাবা গম্ভীরনাথ স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় নেত্র উন্মীলিত করিয়া ও দৃষ্টিটী করুণামণ্ডিত করিয়া স্নেহার্দ্র মৃদু মধুর স্বরে এমন ভাবে তাঁহার সম্বন্ধে দু' একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, যে ভক্তের হৃদয় সেই করুণা-ধারায় যেন স্নাত হইয়া যাইত এবং তাঁহাকে নিতান্ত আপনার জন বলিয়া বরণ করিয়া লইত। তৎপর তিনি তাঁহাকে 'আরাম কর' বলিয়া ক্লান্তি দূর করিবার জন্য ব্রহ্মচারীর ঘরে পাঠাইয়া দিতেন, এবং ব্রহ্মচারীকে তাঁহার সুখ সুবিধা সম্বন্ধে সকল প্রকার ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিতেন। ব্রহ্মচারী বাবাজীর গৃহে আসিলে বাবাজী অর্দ্ধ বাহ্যাবস্থাতেই, ভক্তটীর ভোজন ও আরাম প্রভৃতির কিরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং আর কিছু করণীয় থাকিলে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন। আশ্রম সংলগ্ন উদ্যান বাটীতে কাহারও শয়নের ব্যবস্থা হইলে, বিশেষতঃ তাহাদের মধ্যে স্ত্রীলোক থাকিলে, তিনি আশ্রমের আহারাদির পর হইতে সারারাত্রি পাহারা দিবার জন্য দু একজন প্রহরী নিযুক্ত করিতেন। কাহারও সঙ্গে শিশু সন্তান থাকিলে, তাহার দুগ্ধের বন্দোবস্ত হইয়াছে কিনা অনুসন্ধান করিতেন, এবং কখন কখন আপনার পানীয় দুগ্ধ শিশুর জন্য প্রেরণ করিতেন।

যদিও বাবাজী প্রায় সর্ব্বদাই স্বীয় আসনে আত্মস্থ হইয়া বিরাজমান, তথাপি তাঁহার চাহনি, কথা ও বিধিব্যবস্থার ভিতর দিয়া তাঁহার হৃদয়ের বাৎসল্য ভাবটি এমন ভাবে প্রকটিত হইত,

যে, ভক্তগণ যতদিন সেখানে থাকিতেন, সর্ব্বদাই তাঁহারা অনুভব করিতেন যে বাবাজীর সর্ব্বতোমুখী দৃষ্টি স্নেহ ও করুণায় অত্যন্ত কোমল হইয়া নিরন্তর তাঁহাদের স্বাচ্ছন্দ্য ও সন্তোষ বিধানের জন্য তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেছে। কয়েক জন নবাগত শিষ্য-শিষ্যা হয়ত উদ্যানবাটীতে পাক করিবার সময় কাষ্ঠের অভাব বোধ করিতেছেন বা কাষ্ঠ ভিজা বলিয়া অসুবিধা বোধ করিতেছেন ; হঠাৎ বাবাজীর আদেশে সেবকেরা উপযুক্ত পরিমাণ ভাল কাঠ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করিলেন। কোন শিষ্য-শিষ্যা হয়ত আশ্রম সংলগ্ন 'হাতীশালার' উপরের কোঠায় (অতিথিশালায়) ভাল ঘৃতের অভাব বোধ করিতেছেন, বাবাজীর নিকট হইতে উৎকৃষ্ট ঘৃত তাঁহাদের নিকট গিয়া উপস্থিত হইল। কাহারও হয়ত চা পান করিবার অভ্যাস আছে, অথচ তিনি লজ্জায় বলিতেছেন না, বাবাজীর নিকটে গেলেই তিনি তাহাকে বলিলেন—"জাও, চা পিলেও"। কোন কোন স্ত্রীলোক হয়ত গহনা পত্র লইয়া উদ্যানগৃহে অবস্থান করিতে শঙ্কা অনুভব করিতেছেন, পরদিন বাবাজী তাঁহাদের গহনার বাক্স তাঁহার গৃহে রাখিয়া দিতে বলিলেন। এই প্রকারে আশ্রমে অবস্থান কালে বাবাজী প্রত্যেক ভক্তের অভাব বুঝিয়া আপনা হইতে তাহা পূরণ করিতেন।

একদিন বাবাজীর ঘরে অনেক ভক্ত বসিয়া আছেন। বাবাজী তাঁহার স্বাভাবিক অর্দ্ধ বাহ্যাবস্থায় খাটের উপর উপবিষ্ট। হঠাৎ তিনি একটা ঘৃতের টিনের দিকে অঙ্গুলি

নির্দ্দেশ করিয়া এক ভক্তকে উহা রৌদ্রে রাখিতে আদেশ করিলেন, আদেশ প্রতিপালিত হইল। তিনি আবার স্ব-ভাবে স্থিত হইলেন। সকলেই নীরবে তাঁহার সুপ্রসন্ন নিশ্চল মূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। ঘন্টাখানেক পরে আবার হঠাৎ গৃহের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সুপ্তোত্থিতের ন্যায় তিনি একটি ভক্তকে নিকটে ডাকিয়া ঘৃতের টিনটি আনিতে বলিলেন এবং আর একটি পরিষ্কার পাত্র দেখাইয়া সেই পাত্রে টিন হইতে কতকটা ঘৃত ঢালিতে আদেশ করিলেন। আদেশানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন হইলে তিনি বলিলেন—"উপর লে জাও"। বলিয়া তিনি আবার অন্তর্মুখ হইলেন। ভক্তটী তাঁহার স্ত্রী ও শিশু পুত্র লইয়া আশ্রমের হাতীশালার উপরে দোতালায় অবস্থান করিতেন, এবং একমাস ব্যাপিয়া প্রতিদিন নানাপ্রকার অন্নব্যঞ্জন পাক করিয়া বাবাজীর সেবা করিতেছিলেন। বাবাজী মাঝে মাঝে তাঁহাদিগকে খাদ্যোপকরণ পাঠাইতেন। উৎকৃষ্ট ঘৃত কিনিতে পাওয়া শক্ত। বাবাজীকে কেহ উৎকৃষ্ট ঘৃত উপহার দিয়াছিলেন। উক্ত দম্পতি নানা প্রকার ঘৃতপক্ক জিনিষ তৈয়ার করিতেন। তিনি তাঁহাদিগকে উৎকৃষ্ট ঘৃত পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাদের সেবা গুরুজী কিরূপ আদরের সহিত গ্রহণ করিতেছেন, এবং তাঁহাদের সেবাব্রতে তিনি কিরূপ উৎসাহ ও সাহায্য প্রদান করিতে সমুৎসুক, আত্মস্থ মহাপুরুষের নিকট হইতে তদ্বিষয়ে এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিদর্শন মাঝে মাঝে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা আনন্দে মগ্ন হইতেন।

এবং তাহাই কল্যাণের পথ। নকল নিয়া থাকা অপেক্ষা আসলকে ধরিবার জন্যই প্রযত্ন করা উচিত।

কিন্তু আমাদের জীবনের অধিকাংশ সময় ও শক্তি নকল নিয়াই ব্যাপৃত ; শুধু নকল নয়, নকলের নকল নিয়াই প্রধানতঃ আমরা আছি। কেবলমাত্র এক বিষয়ে নকলকে ছাড়িবার চেষ্টা করিলে কি হইবে ? এই নকলকে বাদ দিলেই কি আসলকে ধরা যাইবে ? বিশেষতঃ যে নকলের মধ্যে আসলের ছাপ কতক কতক লাগিয়া থাকিবার কথা, যে নকলকে অবলম্বন করিয়া আসল সম্বন্ধে অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণেও ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা আছে, সেই নকলকে বাদ দিলে বাস্তবিকই লোকসান। আসল ধরিতে না পারিয়া তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট নকলকেও ত্যাগ করিলে যে তাহাকে ধরিবার সম্ভাবনা আরও সুদূরপরাহত হওয়ার আশঙ্কা। আর যাঁহারা আসলকে ধরিতে পারিয়াছেন, সেই সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ নকলের মধ্যে আসলের বিবিধ বিলাসই দেখিয়া আনন্দসম্ভোগ করিতে পারেন।

এতদ্ভিন্ন, শ্রীশ্রীনাথজীর এমন অনেক শিষ্য আছেন, যাঁহারা একবারের বেশী তাঁহাকে দেখিবারও সৌভাগ্য লাভ করেন নাই, এবং কাজেই তাঁহার জীবনটীকে ধারণার মধ্যে আনিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবার বিশেষ সুবিধাও প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার শিষ্য ব্যতীত আরও অনেক ভক্ত ও ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি—যাঁহারা তাঁহার নাম ও অনন্যসাধারণ

মাহাত্ম্যের কথা অনেক শুনিয়াছেন কিন্তু সঙ্গ করিবার বা তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার সুবিধা পান নাই,—তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত ও উপদেশবাণী শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। এই সব কারণে তাঁহার দেহান্তের কিছুকাল পর হইতেই তাঁহার একখানি জীবনীর আবশ্যকতা অনেকে বোধ করিতে লাগিলেন, এবং অনেকে তজ্জন্য উৎকণ্ঠার সহিত নাথজীউর যোগ্যতর শিষ্যদিগকে অনুরোধ করিতে আরম্ভ করিলেন।

এমতাবস্থায় অনেক গুরুভ্রাতা একমত হইয়া আমাদের বর্ত্তমান গ্রন্থকারের উপর শ্রীশ্রীগুরুদেবের একখানা জীবনী লিখিবার ভার অর্পণ করেন। তিনি গ্রন্থকাররূপে আত্মপ্রকাশ করিতেই অসম্মত ;—তারপর, জ্ঞানে, প্রেমে, শক্তিতে, আত্ম-স্থিতিতে অতুলনীয় এইরূপ একজন পরিপূর্ণ মহাপুরুষের কর্ম্ম-বাহুল্যবিহীন জীবন অবলম্বন করিয়া গ্রন্থ লিখিবার সাহস করা তিনি 'আগুন নিয়া খেলা করার মতই যেন বোধ করিয়া কুণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু ঠাকুর যাহাকে দিয়া যাহা করাইবেন তাহার তাহা না করিয়া উপায় কি? তিনি প্রথমে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও, সম্মানার্হ গুরুভাইদের সম্মান রক্ষার্থে এবং বন্ধুদের আগ্রহাতিশয্যে এই কার্য্যে হাত দিতে রাজী হইলেন। তখন এটী তাঁহার সাধনার অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল। তথাপি চলিতে চলিতে অনেকবার তিনি কুণ্ঠাবশতঃ একার্য্যে বিরত হইয়াছেন, আবার বন্ধুদের তাড়নায় আরম্ভ করিয়াছেন।

আমরা সাধারণতঃ জীবনী বলিতে যাহা বুঝি, এবং সাধারণতঃ জীবনী যেভাবে লিখিত হইয়া থাকে, তাহাতে এই 'প্রসঙ্গ'কে ঠিক ঠিক জীবনী বলা যায় কিনা সন্দেহ। গ্রন্থকার শাস্ত্র, মহাপুরুষের বাণী ও স্বীয় অনুভূতি ও বিচারের সাহায্যে মহাপুরুষের জীবনটীই ধরিতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং মাঝে মাঝেই পাঠকবর্গকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, এসব প্রসঙ্গ মহাপুরুষের লোকোত্তর জীবনটী বুঝিবার জন্য ইঙ্গিত মাত্র, তাহার সম্যক্ পরিচয় নয়। তিনি লিখিয়াছেন, "জীবন দ্বারাই জীবন চিনিতে হয়, বহির্দৃষ্টিপরায়ণ স্থূলবুদ্ধি দ্বারা নয়।" ক্রিয়া-কলাপ ও বাহ্যিক ঘটনাপরম্পরা প্রভৃতি যেসব উপকরণ দ্বারা জীবনী রচিত হয়, বাবা গম্ভীরনাথের ব্যবহারিক জীবনে স্বভাবতঃই সে সকলের অভাব। তৎসত্ত্বেও লেখক যে পরিমাণ উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার অনেকাংশ তিনি অবান্তরবোধে পরিহার করিয়াছেন, এবং মহাপুরুষের আদর্শ জীবনের একটি আলেখ্য অঙ্কিত করিবার জন্য বাহ্যিক ঘটনা ও অবস্থার সাহায্য যতটুকু আবশ্যক, ততটুকুই তিনি স্বেচ্ছায় ও সবিচারে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য জীবনী বর্ণন করা নয়, যথার্থ জীবনটীকে বিচারশীল ও হৃদয়বান্ ধর্ম্মপিপাসুদের নিকট উপস্থিত করা।

গ্রন্থখানি শেষ করিয়াও গ্রন্থকার ইহার মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করিতেছিলেন না। এবিষয়ে তাঁহার উপর যে ভার ছিল, তাহা বহন করিয়া তিনি খালাস,—

তিনি শ্রদ্ধার্হ সতীর্থদের অনুরোধ রক্ষার্থ এবং নিজের চিত্ত-শুদ্ধির নিমিত্তই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহার মুদ্রণ ও প্রকাশ বিষয়ে তাঁহার কোন হাত আছে বা সামর্থ্য আছে কিংবা দায়িত্ব আছে বলিয়া তিনি মনে করেন না।

এইভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ায় এবং অন্য কোন স্থান হইতে কোনরূপ চেষ্টা না হওয়ায়, আমরা আমাদের নিতান্ত ক্ষুদ্র শক্তি লইয়া মফঃস্বলের একটি অতি ক্ষুদ্র সহরে অবস্থিত থাকিয়াও, সাহসপূর্ব্বক এই মুদ্রণ ও প্রকাশের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম। এক্ষেত্রেও তাহাই মনে হইল যে, ঠাকুর যাহাকে দিয়া যাহা করাইবেন, তাহা না করিয়া উপায় কি? এবং তাহা সম্পাদন করিবার শক্তিও তিনিই দিবেন বৈ কি?

'আমরা' বলিতে, সর্ব্বপ্রথমে আমার শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা, ফেণী বরদা প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বরদাপ্রসন্ন দাস মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি গুরুভক্তির প্রেরণায় স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মুদ্রণ কার্য্যের সর্ব্ববিধ দায়িত্ব নিজে বহন করিতে অগ্রসর না হইলে, এই কার্য্য এখানে সম্পাদন করার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। তিনি নানা প্রকার শারীরিক ও পারিবারিক বিপদ্-আপদ্ অগ্রাহ্য করিয়া এবং আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করিয়া গুরুসেবা বুদ্ধিতে এই কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার এইসব বিপদ-আপদ্ না হইলে, সম্ভবতঃ মুদ্রণ কার্য্যে যেসব ভুল-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে, তাহা থাকিত না। যাহা হউক, তিনি ও তাঁহার

যোগিরাজের এক শিষ্য প্রসন্নকুমার ঘোষ (তখন হবিগঞ্জ সরকারী স্কুলের শিক্ষক এবং পরে সহকারী ইন্‌স্পেক্টর) চাকরী হইতে বিদায় লইয়া কয়েকমাস বাবাজীর সঙ্গ ও সেবা করিবার উদ্দেশ্যে গোরক্ষপুরে অবস্থান করেন। তিনি তাঁহার স্মৃতি-লিপিতে লিখিয়াছেন যে, তিনি বাবাজীর যতটুকু সেবা করিতেন, বাবাজী যেন তাঁহার করুণা ও বাৎসল্য দ্বারা তদপেক্ষা তাঁহার অধিক সেবা করিতেন। তাঁহার আহার, শয়ন, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সকল বিষয়ের দিকে বাবাজীর সস্নেহ ও সযত্ন দৃষ্টি ছিল। স্নানান্তে বাবাজীর ঘরে গিয়া বসিলে তিনি তাঁহার অন্তর্মুখীন অবস্থাতেই আস্তে আস্তে খাটের নীচ হইতে লাড্ডু, বাতাসা বা যে কোন মিষ্ট দ্রব্য থাকিত, তাহা লইয়া নিজ হাতে তাঁহাকে প্রদান পূর্ব্বক বলিতেন—"জাও, পানি পিলেও"। আহারের উপযুক্ত সময়ে তাঁহাকে নিকটে দেখিলে জিজ্ঞাসা করিতেন "ভোজন পায়া ?" রাত্রি ৮।৯ টার সময় কাহাকেও বসিয়া থাকিতে দেখিলে তিনি বলিতেন—"জাও, আরাম কর"। এ সব বিষয়ে বিভিন্ন ভক্তের প্রতি বাবাজীর ব্যবহারের মধ্যে অবশ্যই কোন বৈষম্য ছিল না। প্রায় সব ভক্তই এরূপ সুমধুর সস্নেহ ব্যবহার নিজ নিজ জীবনে লাভ করিয়াছেন, এবং অমূল্য সম্পদের ন্যায় তাহার স্মৃতি হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন।

প্রসন্নবাবু গোরক্ষপুরে অবস্থান কালে কিছুদিন সেখানে ছাত্র পড়াইতেন। এক বড়লোকের বাড়ী হইতে তাঁহাকে

গাড়ীতে নিয়া যাওয়া হইত ও গাড়ীতে আশ্রমে পৌছাইয়া দেওয়া হইত। ফিরিয়া আসিতে প্রায়ই তাঁহার রাত্রি হইত। একদিন সন্ধ্যার পর বাবাজী কয়েকজন ভক্ত ও সাধু দ্বারা পরিবৃত হইয়া বসিয়া আছেন। হঠাৎ তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় যেন একটু উৎকণ্ঠার ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাষ্টার বাবু আয়া হৈঁ ?" তখনও তিনি আসেন নাই। কিছুক্ষণ পর আবার বাবাজী জিজ্ঞাসা করিলেন ; পরে তাঁহার সন্ধান করিবার জন্য লণ্ঠন সহ লোক প্রেরিত হইতেছিল, ঠিক সেই সময় প্রসন্ন বাবু আশ্রমে পৌঁছিলেন। সে রাত্রে আসিবার পথে ঘোড়া উত্তেজিত হইয়া গাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলে, কোচ্‌মান ও সহিস অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হয়, প্রসন্নবাবুও অল্প আঘাত পাইয়াছিলেন। পরে একখানা এক্কা করিয়া তিনি আশ্রমে আসেন। বাবাজী দূরবর্ত্তী শিষ্যেরও বিপদে আপদে কখন কখন প্রকাশ্যভাবে এইরূপ খোঁজ খবর করিতেন। সংবাদ তাঁহার নিকট কিভাবে পৌঁছিত, সে প্রশ্ন নিরর্থক।

হরিদ্বার কুম্ভমেলা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের কয়েকদিন পরে এক সময় বাবাজী নিজ গৃহে নিজ ভাবে উপবিষ্ট। কয়েকজন ভক্ত সম্মুখে বসিয়া আছেন। হঠাৎ তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উমেশের কোন সংবাদ পাইয়াছেন কিনা। তাঁহারা কোন সংবাদ পান নাই। বাবাজীর প্রশ্নে তাঁহাদের মনে হইল যে, উমেশ বাবু হয়ত কোন বিপদে পড়িয়াছেন। উমেশ বাবু তখন হরিদ্বারে, সেখানে কলেরার প্রাদুর্ভাব, তাঁহার স্ত্রী কলেরায়

আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হন নাই, নূতন কোন বিপদ হওয়াও আশ্চর্য্য নয়; সুতরাং একজন বলিলেন যে, উমেশ বাবুর নিকট টেলিগ্রাম করিয়া দেওয়া যাউক। তখন রাত্রি হইয়াছে। বাবাজীর অনুমতি চাহিলে, তিনি বলিলেন যে 'আচ্ছা, কাল দেখা যাবে'। পরদিন সকালে আবার বাবাজীকে টেলিগ্রামের কথা জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, প্রয়োজন নাই। এ দিকে সেইদিনই উমেশ বাবু তাঁহার রুগ্না স্ত্রীকে লইয়া হরিদ্বার হইতে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। পথি মধ্যে জলের অভাব হওয়ায়, রুগ্না স্ত্রীর জন্য জল আনিতে উমেশ বাবু এক ষ্টেশনে নামিয়াছেন। জল লইয়া আসিতে আসিতে গাড়ী ষ্টেশন ছাড়িয়া রওনা হইল। উমেশ বাবু দৌড়িয়া আসিয়া পশ্চাদ্দিকের এক গাড়ীর পা-দানীর উপর লাফাইয়া উঠিলেন, গাড়ীতে ঢুকিতে পারিলেন না। এক হাতে জলপূর্ণ ঘটি ও অন্য হাতে গাড়ীর হ্যাণ্ডেল ধরিয়া দ্রুতগামী মেলট্রেণের পাদানীর উপর দাঁড়াইয়া তাঁহাকে এক ষ্টেশন হইতে অপর ষ্টেশনে যাইতে হইল। গাড়ীতে তাঁহার পরিবারবর্গ ব্যতিব্যস্ত হইয়া ঠাকুরকে ডাকিতে লাগিলেন। ঠাকুরও সেই সময়ই তাঁহার সম্বন্ধে খোঁজ খবর করিতেছিলেন। ভক্তগণ পরে উমেশ বাবুর চিঠি পাইয়া ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন এবং দূরস্থ শিষ্যের প্রতিও গুরুদেবের কিরূপ সকরুণ দৃষ্টি ও মাতৃবৎ বাৎসল্যের প্রকাশ, তাহা চিন্তা করিয়া বিমোহিত ও আনন্দিত হইলেন।

অনেক ভক্ত তাঁহার নিকটে গমন করিবার সময়, ভক্তি ও প্রেমের বশে তাঁহার সেবার জন্য নিজেদের কর্ম্মস্থান হইতে বিশেষ বিশেষ খাদ্যদ্রব্যাদি স্বগৃহে প্রস্তুত করিয়া বা বাজার হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেন। সেই সব দ্রব্যসামগ্রী নিতান্ত সামান্য ও মূল্যহীন হইলেও, তাহার সঙ্গে যে ভক্তি ও প্রেমের মসল্লা মাখা থাকিত, তাঁহার মুল্য সামান্য নহে। সেই সব জিনিষ তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইলে, ভক্তদের হৃদয়ে আনন্দবর্দ্ধনের নিমিত্ত, সেই বিষয়বিমুখ, আত্মারাম, আত্মক্রীড় যোগিরাজ অভিনিবেশ সহকারে সেই সব জিনিষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন, কখন কখন সেই সব জিনিষের সম্বন্ধে কৌতুহলব্যঞ্জক দু একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, যাঁহারা সে সকল আনিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি মাঝে মাঝে প্রসন্ন দৃষ্টি স্থাপন করিতেন, তাঁহার জন্য ঐসব জিনিষ কিছু কিছু রাখিয়া দিতে বলিতেন এবং অবশিষ্ট সকলের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে আদেশ করিতেন; কখন কখন ভক্তদের সম্মুখে তিনি নিজে ঐসব জিনিষ কিছু কিছু আহারও করিতেন। ইহাতে ভক্তগণের প্রাণে যে কিরূপ আনন্দের লহরী খেলিত, তাহা ভক্তের প্রাণ যাঁহারা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই নিজ নিজ প্রাণে অনুভব করিতে পারেন।

যোগিরাজ গম্ভীরনাথ দিবারাত্রির প্রায় সব সময়ই স্বীয় আসনে ধ্যানাবিষ্ট অবস্থায় বসিয়া থাকিলেও, আশ্রমের মধ্যে কোথায় কোন্ ভক্ত বা অতিথি কিভাবে অবস্থান করিতেছেন,

কাহার কিরূপ সুবিধা বা অসুবিধা হইতেছে, কাহাকে কোন্ বস্তু দিলে বা কাহার সম্বন্ধে কি প্রকার ব্যবস্থা করিলে তাহার স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হইবে, সে সব বিষয়ের তত্ত্বাবধানে আশ্রমাধ্যক্ষের যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে তাঁহার কোনরূপ ত্রুটি লক্ষিত হইত না। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেও প্রসঙ্গক্রমে দু চারটি ব্যাপার উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্যাপারগুলি সবই ছোটখাট; লৌকিক ব্যাপারের হিসাবে ইহাদের মূল্যও বেশী নয়; কোন সাংসারিক 'বড়লোকের' কর্ম্মময় জীবন আলোচনার কালে এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা সাধারণত উল্লেখযোগ্য বলিয়াই বিবেচিত হয় না; কিন্তু এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপারের মধ্যেই উদাসীন মহাযোগীর প্রাণের পরিচয়টী পাওয়া যায়।

যে সব মহাপুরুষ সংসারের অতীত আধ্যাত্মিক রাজ্যেই নিত্য নিরন্তর বিহার করেন, সাংসারিক কোনরূপ 'বড় কাজের' সহিত যাঁহারা কখনও সংশ্লিষ্ট হন না, সাংসারিক জীবের প্রতি তাঁহাদের প্রাণের ভাবটি যে কি প্রকার, তাহার পরিচয় কোন প্রকার 'বড় কজের' মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়; দু চারটি ছোট খাট কাজের বা কথার মধ্য দিয়া, একটু অর্থপূর্ণ দৃষ্টির ভিতর দিয়া, এই সব মহাপুরুষের স্নেহ ও প্রেমের পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। বিশ্বাসী হৃদয়বান্ তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বিচারশীল ব্যক্তিগণই এই পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যাহারা বহির্মুখ, যাহারা কর্ম্মের বাহ্যিক চেহারার ঔজ্জ্বল্য ও আড়ম্বরকেই বড় মনে করে এবং তাহা দেখিয়াই কর্ম্মের মূল্য নির্দ্ধারণ করে,

তাহারা এসব মহাপুরুষের হৃদয়বত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হয় না। মানুষকে চেনা, মানুষের হৃদয় বুঝা, বড় কাজ অপেক্ষা, যেসব কাজ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, সেই ছোট-খাট আড়ম্বর-বিহীন কাজের ভিতর দিয়াই সহজ ও যথার্থ হয়।

লোকোত্তর মহাপুরুষ বাবা গম্ভীরনাথের লৌকিক জীবনের প্রায় সব ব্যাপারই ছোট-খাট আড়ম্বর-বিহীন ছিল। কিন্তু যাঁহারা দেখিতে জানিতেন, তাঁহারা তাহার ভিতরেই তাঁহার হৃদয়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাইতেন, জীবমাত্রের প্রতি, তন্মধ্যে মানুষের প্রতি, বিশেষতঃ ভক্তদের প্রতি, তাঁহার সহানুভূতি কত গভীর, তাহার নিদর্শন পাইতেন, তাঁহার ভিতরে অনেক দেখিবার, ভাবিবার ও শিখিবার জিনিষ পাইতেন। এসব যাঁহারা বিশেষভাবে দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্ত তাঁহার প্রতি কেবলমাত্র সসম্ভ্রম ভক্তি শ্রদ্ধাতেই নত হইত না, তাঁহাকে নিতান্ত আপনার জন বলিয়া উপলব্ধি করিয়া নিঃসঙ্কোচে প্রাণের ভালবাসা অর্পণ করিত।

বাবাজীর একটী শিষ্য* তাঁহার স্মৃতিলিপিতে প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছেন—"এক্কা রাস্তায় দাঁড়ান ছিল। আমি বাবাকে দেখা যাওয়া পর্য্যন্ত তাঁর দিকে মুখ করিয়া পিছনদিকে সরিতে সরিতে গাড়ীতে গিয়া উঠিলাম। যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ তিনি মায়ের মত স্নেহ সমুদ্র ঢালিয়া আমার চোখের উপরে চোখ রাখিয়া আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন। আহা!

* শ্রীযুত বরদাকান্ত বসু।

অমন প্রাণের জনকে ছাড়িয়া আবার কোন্ দেশে কতকালের জন্য যাইতে হইবে, ভাবিয়া বুকটা ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। সেই কথা মনে হইলে এখনও চোখে জল আসে। যখনই বাবার কাছ থেকে বিদায় নিতে হইয়াছে, তখনই এই অবস্থা। বাবার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া অবধি আবার দিন গণা আরম্ভ হইত, কবে আবার বাবার সঙ্গে দেখা হইবে। সময়টাকে বড়ই নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হইত। ······এইটী আমি সকল সময়েই প্রত্যক্ষ করিয়াছি, যিনিই বাবার আশ্রয় নিয়াছেন, তাঁহারই বাবার প্রতি একটা অসাধারণ টান হইয়াছে। বাবার চোখে কেহ কখনও এক ফোঁটা জল দেখেন নাই, তথাপি তাঁহার চোখে এমনই একটা শান্ত, মধুর, স্নেহসিক্ত ভাব বিরাজ করিত যে, যে কেহ তাঁহার কাছে আসিতেন, তিনিই হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব তৃপ্তি লইয়া যাইতেন। তাঁহার সন্তানদের যে কেহ যখন তাঁহার কাছ থেকে বিদায় নিতেন, তখনই তাঁদের দিকে এমন স্নেহ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিতেন যে তাঁহারা আকুল না হইয়া থাকিতে পারিতেন না; মনে হইত যে স্নেহ বাবার নয়নপথ দিয়া বাহির হইয়া যতদূর দেখা যাইত, ততদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া, তাঁহাদিগের অনুগমন করিয়া, তাঁহাদিগকে প্লাবিত করিয়া দিত। শিষ্যদের মধ্যে যাঁহারাই তাঁহার স্নেহ দৃষ্টিটী বেশ লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই আত্মহারা হইয়াছেন!'

"মহাত্ম রামদাস কাঠিয়া বাবার শিষ্য, স্বনামখ্যাত অধ্যাপক

শ্রীযুত সারদা প্রসন্ন দাস মহাশয়, তাঁহার ছোট দুই ভাই (বরদা ও জ্ঞানদা) ও কন্যাকে বাবার কাছে দীক্ষিত করিবার জন্য গোরক্ষপুর আসিয়াছিলেন। দীক্ষার পরে বিদায় লইবার জন্য বরদাপ্রসন্ন ও জ্ঞানদাপ্রসন্ন বাবার ঘরে গিয়া বাবাকে প্রণাম করিয়া কাঁদিয়া আকুল। বরদা বাষ্পজড়িতকণ্ঠে বাবাকে বলিলেন 'বাবা, আমরা অনেক দূরে থাকি—এই বলিয়া আর বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। বাবাকে তখন দেখিলাম যেন একটু বিচলিত হইতে, তিনিত স্নেহসাগর ছিলেন,—তিনি বরদার মুখের উপর পূর্ণদৃষ্টি নিহিত করিয়া স্নেহকোমল স্বরে বলিলেন 'যখনই যেখানে থাক, চিঠি পত্র দিও, তা চিঠিপত্র না দিলেও সংবাদ জানা যায়।' বরদা বাবার এই ভাব ও উত্তরে আরও আকুল হইয়া পড়িলেন, বাবা বার বার 'হাঁ হাঁ' করিতে লাগিলেন। বাবা নামেও যা, কাজেও তাই ছিলেন, তিনি অতি অল্পভাষী ও মৃদুভাষী ছিলেন, এবং প্রত্যেকটী শব্দের পর যেন ৩।৪টি পূর্ণচ্ছেদ দিয়া কথা বলিতেন। তাই তিনি আশীর্ব্বাদের সময়ও শুধু একটি ছোট্টো গম্ভীর 'হাঁ' করিতেন, তাতেই লোকের মন ভিজিয়া যাইত। যে কেহ বাবাকে দেখিয়াছেন, তিনিই বলিয়াছেন, বাবার মতন অমন শীতল মূর্ত্তি কখনও দেখেন নাই। বাবার সবই শীতল ছিল,—আকৃতি শীতল, প্রকৃতি শীতল, ব্যবহার শীতল, দৃষ্টিতে ত সর্ব্বদাই মধু বর্ষণ হইত। এত বড় জমিদারীর ও আশ্রম সম্বন্ধীয় 'গৃহস্থালী'র কর্ত্তৃত্বভার স্কন্ধে বহন করিলেও, তাঁহাকে

কখনও কাহারও উপর কোনরূপ কটুকথা প্রয়োগ করিতে শোনা যায় নাই।

"বাবা দিবসের অধিকাংশ সময় তাঁর সাদাসিদে উঁচু খাটটীতে বসিয়া থাকিলেও, আশ্রমের শৃঙ্খলা বিষয়ে কোন জায়গায় একটু ত্রুটী থাকিবার উপায় ছিল না। একদিন দুপুরবেলা ভাণ্ডারার সময় সকল সাধুরা গিয়া খাইয়া আসিয়াছেন। বাবা হঠাৎ আমাকে বলিলেন, 'বট গাছের নীচে কয়েকজন উদাসী সাধু আছেন, তাঁদের ভোজন হইয়াছে কিনা, দেখিয়া আইস।' আমার সেদিন স্কুল না থাকায় আমি প্রাতঃকাল হইতেই নিয়ত বাবার কাছেই ছিলাম, এই উদাসী সাধুদিগকে বাবার কাছে আসিতে দেখি নাই, অথবা কেহ বাবার কাছে এই খবরও দেয় নাই। এদিকে উদাসীরা অল্পক্ষণ পূর্ব্বে বেলা ১১টার সময় গোরক্ষনাথে আসিয়াছেন। আমি বাবার আদেশানুসারে বটগাছের নীচে গিয়া দেখি বাস্তবিক কয়েকজন উদাসী সাধু সেখানে আছেন। তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, যথাসময়ে তাঁহারা ভাণ্ডারে গিয়া প্রসাদ পাইয়া আসিয়াছেন।

"পূজ্যপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিষ্য, পরলোকগত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার পুত্র, চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার মুখে শুনিয়াছি যে, তিনি একদা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বাবাকে দর্শন করিবার জন্য গোরক্ষপুরে আসেন। বাবা তাঁহাকে আদরের সহিত গ্রহণ করেন। চিত্ত বাবুর

মাথায় কয়েকদিন তৈল পড়ে নাই, তিনি তৈলের অভাবটা বোধ করিতেছিলেন। আশ্চর্য্য! যথাসময়ে বাবা তাঁর জন্য ফুল তৈল পাঠাইয়া দিলেন। প্রাতে সময় ছিল না বলিয়া বৈকালে তাঁর জন্য মাছের বন্দোবস্ত করিলেন। চিত্ত বাবু বলেন যে, তিনি বাবার স্নেহ ও আদর কখনো ভুলিতে পারিবেন না। বাবা কখন কি দরকার তাহা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে ক্রটী করিতেন না!

"আমার দীক্ষার ২।১ বৎসর পূর্ব্বে আমার ভাগিনেয় শ্রীমান্ কোহিনূর ও তাহায় সমবয়স্ক কয়েকটী ছেলে বাড়ী হইতে পলাইয়া নেপাল প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া গোরক্ষপুরে বাবাকে দর্শন করিবার জন্য আসে। কোহিনূরের তখন ভয়ানক জ্বর হয়। বাবা তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক ডাকাইয়া তাহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন, এবং তাহার সেবার জন্য একটি চাকর নিযুক্ত করিয়া দেন। কোহিনূরের সঙ্গীদের যাওয়ার সময় বাবা কোহিনূরকে জ্বর নিয়া যাইতে দিলেন না। তাহার জ্বর সারিলে তাহার পাথেয় দিয়া তাহাকে ময়মনসিংহে নিজের বাসায় পাঠাইয়া দেন। এই কোহিনূর কিন্তু বাবার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে নাই।

"গোরক্ষপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার শ্রীমান কান্তিচন্দ্র সেন মহাশয় বাবার শিষ্য ছিলেন না, কিন্তু অনুগত ভক্ত ছিলেন। তিনি বাবার চিকিৎসকও ছিলেন। কান্তি বাবুর বাড়ীর কাহারও কখন গুরুতর ব্যারাম হইলে এবং ডাক্তারী ও

আয়ুর্ব্বেদিক চিকিৎসায় নিরাশ হইলে, তিনি বাবার নিকট হইতে বিভূতি অথবা 'আশাপূরী ধূপ' নিয়া যাইতেন ও ব্যবহার মাত্রই রোগের উপশম হইয়া যাইত। একবার কান্তি বাবুর পুত্রবধূ প্রসবকালে তিন দিন অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। ডাক্তার ও ধাত্রীদের চেষ্টায় কোন ফল না হওয়ায় অবশেষে নিরাশ হইয়া কান্তি বাবু বাবার কাছে লোক পাঠান। বাবা একটু বিভূতি দেন। তাহা সেবন করা মাত্রই পুত্রবধূটীর নির্ব্বিঘ্নে সন্তান প্রসব হয় এবং প্রসূতি সম্পূর্ণ ভাল হইয়া উঠেন। আর একবার কান্তি বাবুর ছোট ছেলেটীর সান্নিপাতিক জ্বর হয়, ইহার অনুসঙ্গিক লক্ষণগুলিও সম্পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। অবশেষে যখন জীবনের আর আশা রহিল না, তখন কান্তি বাবু বাবার কাছে লোক পাঠান। সেই লোকের হাতে বাবা আশাপূরী ধূপ দেন। তাঁহার ধোঁয়া কয়েকবার শুঁকিতেই রোগীর জ্বর ত্যাগ হয় এবং তৎপরে কিছুদিনের মধ্যে ছেলেটী সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হয়। কান্তি বাবু বলিয়া থাকেন যে, বাবাই তাঁহার ছেলের প্রাণদাতা। এইরূপ কতবার যে বাবা তাঁহাকে কত বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহার শেষ নাই। উপরোক্ত দু'টী ঘটনাই আমার গোরক্ষনাথে বাবার কাছে অবস্থিতি কালে ঘটিয়াছে। ব্যারাম আরোগ্য হইবে, এরূপ ভরসা দিয়া যে বাবা বিভূতি বা ধূপ দিতেন, তা নয়। তাঁহারা বাবার আশীর্ব্বাদ স্বরূপ ইহা চাহিতেন বলিয়াই বাবা বাৎসল্যের সহিত ইহা দিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাসের বলেই হউক,

রোগীর কর্ম্মানুসারেই হউক, বা যে কারণেই হউক, রোগের নিবৃত্তি দেখা গিয়াছে। রোগ সারাইবার প্রকাশ্য উদ্দেশ্য লইয়া বাবা কখনও এ সব দিতেন না। তিনি বলিতেন যে ব্যারাম হওয়া ও তাহা হইতে আরোগ্য হওয়া নিজ কর্ম্মানু-সারেই হয়। তবে লৌকিক উপায় অবলম্বন করা উচিত।”

বাবাজীর অপর একজন শিষ্য* তাঁহার স্মৃতিলিপিতে বাবাজীর স্নেহ ও দয়ার নিদর্শন স্বরূপ এই প্রকার অনেক ঘটনা তাঁহার নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে বর্ণনা করিতে করিতে প্রসঙ্গক্রমে একটি ঘটনা এইরূপ লিখিয়াছেন,—“রামেশ্বর নামে এক ছোকরা চাকর আশ্রমে ছিল। এক মধ্যাহ্নে ঠাকুর আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছিলেন। আমরা আহার করিয়া আসিবার পর আমার ইচ্ছা হইল, একবার ঠাকুর ঘরে যাই। আমি খুব চুপি চুপি গেলাম, আশা, এই সময় চাকরের হাত হইতে লইয়া পাখার দড়িটী নিজে টানিব। ঘরে সামনের দরজা দিয়া ঢুকিয়া দেখি, ঠাকুর খাটে বসিয়া আছেন, বালক রামেশ্বর তাঁহার খুব নিকটে খাটের সামনে দাঁড়াইয়া আছে, ঠাকুর সকাল বেলার আনীত বেশ বড় বড় ২।১টি আপেল কি বেদানা হাতে লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছেন। আমার আকস্মিক উপস্থিতিতে মনে হইল যেন তাঁহারা একটু চমকিত হইলেন,—তাঁহাদের চমক না হইলেও আমার ভিতরকার প্রকাশই আমি দেখিলাম। আমি আর কালবিলম্ব না করিয়া

* শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী দত্ত গুপ্ত।

চলিয়া আসিলাম। দারিদ্র্য-পীড়িত বালককে স্নেহ করিয়া উৎকৃষ্ট বস্তু খাইতে দেয় এমন কেহ নাই, তাই তিনি সেবক ভৃত্যের সেবা নিজেই করিতেছিলেন।” এসব কাজ তিনি সাধারণতঃ এইরূপ নীরবে ও গোপনেই করিতেন।

বরদা বাবু তাঁহার স্মৃতিলিপিতে লিখিয়াছেন যে “মানুষের আর কথা কি, কোন ইতর প্রাণীও তাঁহার স্নেহ ও সেবা হইতে বঞ্চিত হইত না। আশ্রমের গরুগুলি মাঠে চরিতে যাইবার সময় ও মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় বাবাকে ঘেঁসিয়া একটু আদর না নিয়া কিছুতেই যাইত না। বাবা বাহিরে বসা থাকিলে কুকুরগুলি তাঁহাকে ঘিরিয়া শুইয়া থাকিত। তাহাদের গায়ে ধূলা কাদা থাকিত বলিয়া কেহ যদি তাহাদিগকে বাবার নিকট হইতে তাড়াইতে যাইত, বাবা নিষেধ করিতেন। একদিন শেষ রাত্রে বাবার ঘরে খট্ খট্ শব্দ শুনিয়া দরজা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, বাবা তাঁর খাটের নীচ হইতে রুটি ছিঁড়িয়া ইন্দুর গুলিকে বাঁটিয়া দিতেছেন। আমাকে দেখিয়া যেন লজ্জা পাইয়া তিনি খাটে গিয়া বসিলেন, এবং আমার চিন্তাকে অন্যদিকে ধাবিত করিবার জন্য আমাকে তামাক সাজিতে বলিলেন। বাবার চোখে কেহ কখন এক ফোটা জল দেখে নাই, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণটী যে অত্যন্ত কোমল ছিল, তাঁহার দৃষ্টি ও ব্যবহারে প্রতিপদে ইহার সাক্ষ্য পাইয়াছি। বাবার কার্পাসবস্ত্র ও পশমীবস্ত্র পরিতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু তাঁহার শিষ্যসেবকগণ তাঁহাকে

রেশমীবস্ত্র দেওয়া সত্ত্বেও তিনি তাহা প্রায়ই পরিধান করিতেন না ; কেন পরিতেন না, তাহাও স্পষ্ট বলিতেন না। আমরা মাঝে মাঝে রেশমীবস্ত্র পরিতে অনুরোধ করিলে, তিনি বলিতেন—'আচ্ছা এখন রেখে দে'। একদিন প্রসঙ্গক্রমে বাবা বলিলেন যে,—রেশমের সুতা কাটিয়া যাওয়ার ভয়ে, যারা গুটিপোকা পালে, তারা পোকাসহিত গুটিকা গুলি গরম জলে ফেলিয়া দেয় ; এই রকমে শত সহস্র পোকা মারা যায়। তখন তাঁহার রেশমী কাপড় পরিতে অনিচ্ছার কারণ বুঝিতে পারিলাম। বাবার প্রেমে বনের হিংস্র জন্তুও তাঁর কাছে হিংসা ভুলিয়া যাইত। সাপ বাঘের পর্য্যন্ত তিনি যত্ন ও সেবা করিতেন।

"বাবা দীন দরিদ্র সকলেরই পিতাস্বরূপ ছিলেন। এখনও জমিদারীর প্রজারা এখানে (গোরক্ষনাথ মন্দিরে) আসিলে বাবার সমাধিমন্দিরের নিকট দাঁড়াইয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিয়া থাকে,—"হে বুড়ো মহারাজ! আপনি কোথায় লুকাইয়া রহিয়াছেন ? আমাদের যে প্রতিপালন করিবার আর কেহ নাই। যেখানেই থাকুন আমাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। আমাদের দুঃখের কথা শুনিয়া আমাদের অভাব মোচন করিবার আর যে কেহ নাই। মহারাজ! আপনিই আমাদের একমাত্র ভরসা ও নির্ভর। ধন্য মহারাজ! ধন্য আপনার মহিমা!" ইত্যাদি।

নিতান্ত পাপীও বাবা গম্ভীরনাথের অনুগ্রহ দৃষ্টি হইতে

বঞ্চিত হইত না। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে কেহ কোন অমার্জ্জনীয় অপরাধ করিয়াও ভীত ও অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি এমন স্মিত মুখে ও প্রসন্ননেত্রে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, এমন স্নেহমাখা ভাষায় তাহার সহিত দু' একটি সান্ত্বনা, উৎসাহ ও অভয়ের কথা বলিতেন, এমন মধুর ভাবে তাহার সহিত ব্যবহার করিতেন, যে সে তাহার অপরাধের কথা ভুলিয়া যাইত, তাহার চিত্তের মালিন্য তাঁহার স্নেহ ও করুণার অমৃতধারায় বিধৌত হইয়া যাইত, তাহার প্রাণে অভূতপর্ব্ব শান্তি ও অভয় আসিত, তাহার পাপপ্রবৃত্তির আগুনও সেই অমৃতাভিষেকে চিরকালের জন্য নির্ব্বাপিত হইত। আশ্রমের কোন কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে কোন-রূপে গুরুতর অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তিনি তাহার সংশোধনের জন্য কিছু শাস্তির ব্যবস্থা করিতেন বটে, কিন্তু তাহাকে একপদ হইতে বরখাস্ত করিয়া উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক অন্যপদে আবার নিযুক্ত করিতেন; তাহাতে কেহ আপত্তি করিলে তিনি বলিতেন যে, বেচারী কি না খাইয়া মরিবে না তাহাকে পাপের পথেই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত হইবে?

একবার একটি শিষ্য তাঁহার নিকটে বসিয়া আছেন। একটি সুসজ্জিতা অনবগুণ্ঠিতা নারী গাড়ী হইতে নামিয়া গোরক্ষনাথ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ফল মিষ্টাদির ডালি দিয়া প্রণাম করিলেন, এবং বাবাজীর অনতিদূরে আসিয়া

করযোড়ে তাঁহাকে প্রণিপাত করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শিষ্যটীর মনে হইল যে, তিনি পতিতা নারী, অথচ তিনি মন্দিরে প্রবেশ করাতে তাঁহার এবিষয়ে বিশেষ সন্দেহ উপস্থিত হইল। বাবাজী শিষ্যের দিকে চাহিয়া কারুণ্যপূর্ণ ভাষায় বলিলেন—'রেণ্ডী হৈ মগর হিন্দু হৈ'। বিশ্বব্যাপি হৃদয়, উদার ধর্ম্মমতপোষক, পতিতবন্ধু মহাত্মা গম্ভীরনাথ স্বীয় শিষ্যকে হাবভাবে ও কথায় সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, পাপকর্ম্মে লিপ্ত থাকিলেও যে ব্যক্তি দেবতার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি-সম্পন্ন, দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করিতে তাহার অধিকার আছে, সমাজ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেও দেবতা তাহাকে পরিত্যাগ করেন না। শিষ্যের সংকীর্ণতা দূরীভূত হইল, পাপীর প্রতি বাবাজীর করুণা ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে তাঁহার উদার ভাব দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন।

বাবা গম্ভীরনাথের ভক্তবাৎসল্য ও জীবপ্রেমের দৃষ্টান্তস্থানীয় ঘটনাবলী বিবৃত করিতে থাকিলে গ্রন্থের শেষ হইবার সম্ভাবনা নাই। যে কোন ব্যক্তি এক ঘণ্টার জন্যও তাঁহার সঙ্গ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তিনিই এইরূপ ছোট-খাট ঘটনায় ইহার বিবিধ পরিচয় পাইয়াছেন। ঘটনা সমূহ অবশ্য খুবই সাধারণ রকমের, কিন্তু তিনি যে দুই একটি কথা বলিয়াছেন, যে ভাবে সংসারীদিগকে উপদেশ দিয়াছেন, যে ভাবে যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, তার প্রত্যেকটির মধ্যে তাঁহার ভক্তবাৎসল্য ও জীবপ্রেমের বিকাশ হইয়াছে। জীবের প্রতি

ভালবাসাই যে তাঁহার ব্যবহারিক জীবনের নিয়ামক ছিল, জীবপ্রেমই যে তাঁহাকে সমাধির অতল গর্ভ হইতে টানিয়া কতক পরিমাণে বাহিরে রাখিত। তাঁহার ব্যবহারিক জীবন প্রেম দিয়াই গঠিত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

যে দু' চারটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে এবং এই জাতীয় অন্য যে সব ব্যাপার যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে, তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে সামান্য এক আধটুকু তথাকথিত অলৌকিকত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে, যৎকিঞ্চিৎ অতীন্দ্রিয় দর্শন শক্তি, লোকের মনোগত ভাব বুঝিবার শক্তি, দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য করিবার শক্তি, ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে,—তৎপ্রতিই যাঁহাদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়, তৎসম্বন্ধে চিন্তা করিয়া এবং তাহাই এ সব ব্যাপারের প্রধান অঙ্গ মনে করিয়া যাহারা বিস্ময়াবিষ্ট ও বিমুগ্ধ হন, তাঁহারা আসল তথ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া নকলকেই সম্মান প্রদান করেন। যিনি যোগসিদ্ধ যোগিরাজ, যাঁহার যোগশক্তি অপরিসীম, তাঁহার সম্বন্ধে উক্ত প্রকার শক্তিকে শক্তি বলিয়া মনে করাই বিচারহীনতার পরিচায়ক। নিতান্ত সাধারণ শক্তিবিশিষ্ট যে কোন ব্যক্তি সামান্য অনুশীলন দ্বারাই উক্তরূপ শক্তি লাভ করিতে পারেন; যোগ সাধকগণ তাঁহাদের সাধনার অনেক নিম্ন সোপানেই ঐ সব শক্তি লাভ করিয়া থাকেন, এবং তুচ্ছ বোধে এই প্রকার শক্তি ও বিভূতি অতিক্রম করিয়া যান। যোগ সাধনা ব্যতীত, কোনরূপ বিশেষ শক্তির অনুশীলন

ব্যতীত, কেবল মাত্র ভালবাসা ও তজ্জনিত ইচ্ছাশক্তির বলে সাধারণ লোকেও এরূপ ব্যাপার সম্পাদন করিতে পারে, এ সম্বন্ধেও অনেক সুপরিচিত দৃষ্টান্ত আছে। একবার ইংরেজী সংবাদ পত্রে এক ইংরেজ লিখিয়াছিলেন যে,—একজন হিন্দু সাধু বিনা টিকেটে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে ভ্রমণ করিতেছিলেন দেখিয়া এক ষ্টেশনে টিকেট পরিদর্শক তাঁহাকে বলপূর্ব্বক নামাইয়া দেন। সাধু ষ্টেশনে গাড়ীর ইঞ্জিনের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিহিত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। গাড়ী ছাড়িবার সময় হইলে চালক চেষ্টা করিয়াও গাড়ী চালাইতে পারিল না। গাড়ীর কোন অঙ্গ বিকল হইয়াছে মনে করিয়া মিস্ত্রীরা অনেক পরীক্ষা করিল। কিন্তু কোন বিকলতা দেখা গেল না। তখন সাধুর দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। সাধুকে অনুনয় পূর্ব্বক গাড়ীতে উঠাইয়া দেওয়া হইলে, সহজেই গাড়ী ষ্টেশন ছাড়িল। এই ঘটনাটী লইয়া কেহ কেহ বাবাজীর সম্মুখেও আলোচনা করিয়াছিলেন, এবং মহাযোগশক্তিধর মহাপুরুষ বলিয়া সেই সাধুর প্রশংসা করিতেছিলেন। নিবৃত্তিনাথজী তখন উপস্থিত ছিলেন। বাবাজী তখন কথা প্রসঙ্গে বলিলেন যে, এইরূপ শক্তি দেখিয়াই মহাযোগী বা সিদ্ধ মহাপুরুষ নির্ণয় করা যায় না। যোগীপুরুষ সংকল্পমাত্র দ্বারা পাহাড় পর্ব্বত উড়াইয়া দিতে সমর্থ। কিন্তু এই শক্তি লাভ করা খুব বড় কথা নয়, কোন কোন যোগ বিদ্যা কিছুকাল অনুশীলন করিলেই এই জাতীয় শক্তি লাভ করা যায়। মহাযোগী ও জ্ঞানী মহাপুরুষের কাছে এ সব কিছুই নয়।

গোরক্ষপুর গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক অতুল বিহারী গুপ্ত এম, এ, বি, টি, 'মৃত্যুর পরে ও পুনর্জ্জন্মবাদ' নামক গ্রন্থে যোগিরাজ সম্পর্কে তাঁহার প্রত্যক্ষদৃষ্ট একটি ঘটনার বিবরণ দিয়াছেন, যাহা যোগীরাজের ব্যবহারিক জীবনের সাধারণ নীতির কতকটা ব্যতিক্রম। তিনি লিখিয়াছেন,—"আমি তখন গোরক্ষপুরে। ঐ সহরের গোরক্ষ-নাথ মহাদেব দেশপ্রসিদ্ধ। সে সময়ে দেবতার মন্দির সংলগ্ন একটি ছোট কামরায় বাবা গম্ভীরনাথ নামক একজন সন্ন্যাসী থাকিতেন। লোকের বিশ্বাস তিনি সিদ্ধপুরুষ। বহুদূর হইতে লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত। অঘোর বাবু (উক্ত স্কুলের তৎকালীন প্রসিদ্ধ হেড্‌মাষ্টার রায় সাহেব অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়) ইঁহার বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রায়ই অপরাহ্নে ইঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন। আমি সময় সময় তাঁহার সঙ্গে যাইতাম। বাবা অত্যন্ত স্বল্পভাষী ছিলেন। …অঘোর বাবু প্রায়ই বলিতেন যে, বাবা সিদ্ধ মহাপুরুষ, প্রয়োজন হইলে এমন কাজ করিতে পারেন যাহা লোকে অসম্ভব মনে করে। আমি তাঁহার কথা বিশ্বাস করিতাম না।…

"একদিন বুধবার অপরাহ্নে আমি ও অঘোর বাবু স্কুল compoundএর ভিতর ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময় অকস্মাৎ আমার খেয়াল হইল, একবার বাবার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। অঘোর বাবুকে বলাতে তিনি বিস্মিতভাবে

বলিলেন, 'বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার ত! ঠিক এই ইচ্ছা আমারও হইয়াছে। চল এখনই যাওয়া যাক।' ...আমাদিগকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বাবা বলিলেন, 'তোমাদিগকে এখানে আসিবার জন্য যে আহ্বান পাঠাইয়াছিলাম, তাহা কি পাইয়াছিলে?'......ঠিক সেই সময়ে দুইজন স্ত্রীলোক বাবার নিকট উপস্থিত হইল। উহাদের মধ্যে একজন বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের রমণী মনে হইল, বয়স অনুমান ৬০ বৎসর। অপরা হয়ত তাঁহার দাসী।.. বৃদ্ধা যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম্ম এই,—'তাহার একমাত্র পুত্র ব্যারিষ্টারী পড়িতে বিলাত গিয়াছে। প্রায় ৪ মাস সে পত্র দেওয়া বন্ধ করিয়াছে। তাহার এক বন্ধুকে তার করায়, উত্তর আসিয়াছে, সে বিলাতে নাই, কোথায়, তাহা বন্ধু জানে না।' এই কাহিনী শুনাইয়া বৃদ্ধা হঠাৎ বাবার দুই পা' জড়াইয়া ধরিল এবং বলিল, 'বাবা, আমাকে দয়া করিতেই হইবে, আমাকে শুধু বলিয়া দেন আমার ছেলে বাঁচিয়া আছে কি না।' বাবা বলিলেন,—'আমি দরিদ্র সংসারত্যাগী লোক, বিলাতের সংবাদ কি জানি।' বৃদ্ধা বলিলেন,—'আমি জানি, আপনি ইচ্ছা করিলেই আমার ছেলের সংবাদ আনিতে পারেন। ভগবান্ গোরক্ষনাথের দোহাই, আমাকে দয়া করুন।'

"বাবা এইবার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—আচ্ছা দেখি কি করিতে পারি।... তিনি নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।... প্রায় ৪০ মিনিট পরে বাহিরে

আসিলেন।··· বৃদ্ধাকে বলিলেন,—সামনের সোমবারে তোমার পুত্র খুব সম্ভব, গোরক্ষপুরে উপস্থিত হইবে। এখন সে জাহাজে। বৃদ্ধার দেখিলাম, বাবার উপর অসীম বিশ্বাস। সে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।···

"পরের বুধবার অপরাহ্ন প্রায় ৪ টার সময় অঘোরবাবু আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার বাংলায় উপস্থিত হইলে দেখিলাম, একজন সাহেবী পোষাক পারহিত হিন্দুস্থানী যুবক তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া অঘোর বাবু বাংলা ভাষায় বলিলেন, 'ইনি সেই বৃদ্ধার নিরুদ্দিষ্ট পুত্র, বাবার কথামত পরশু (সোমবার) এখানে আসিয়াছেন। বাবার সহিত ইহার মায়ের সাক্ষাতের কথা ইনি এখনও জানেন না। আমি ইহাকে ও তোমাকে এখনই বাবার নিকট লইয়া যাইব! বাবাকে আমি মহামানব মনে করি।··· আজ তোমার বহুদিনকার একটা কুসংস্কারের মুলোচ্ছেদ হইবে।···

"বাবা একা পূর্ব্বমত কুটীরের সম্মুখে দালানে বসিয়া আছেন। ব্যারিষ্টার সাহেব বাবাকে দেখিয়াই অত্যন্ত বিস্মিত ভাবে বলিলেন,—Halo Baba, you here!' অঘোরবাবু বিরক্তভাবে বলিলেন,—'বাবা ইংরেজী জানেন না'। আমরা সকলে উপবিষ্ট হইলে সাহেব এবার হিন্দীতে বলিলেন,— আপনি এখানে কবে আসিলেন? আমি জাহাজ হইতে নামিয়া Imperial Mail ধরিয়াছিলাম। কিন্তু সে গাড়ীতে আপনি

ছিলেন বলিয়া মনে হয়না।' অঘোরবাবু সাহেবকে বলিলেন,—'তোমার কথায় মনে হইতেছে, তুমি বাবাকে যেন অন্য কোন স্থানে দেখিয়াছ। সত্য কি?' সাহেব—খুব সত্য। আমাদের জাহাজ যখন বোম্বাই হইতে এক দিনের পথ, তখন আমি বাবাকে আমার কেবিনের ঠিক বাহিরে দেখিতে পাই। একজন সাধুকে প্রথম শ্রেণীর নিকট ঘুরিতে দেখিয়া আমি বাহির হইয়া বাবার সহিত প্রায় ৫ মিনিট কথোপকথন করিয়াছিলাম। তাহার পর বাবা অন্য দিকে চলিয়া যান।'

আমি—'আপনার কি মনে পড়ে, কবে কোন সময় আপনি জাহাজে বাবার সহিত কথা কহিয়াছিলেন?

"পাঠক জানেন, ঐ বুধবারে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাবা নিজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রায় ৪০ মিনিট উহার মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন। অথচ সাহেব বলিতেছেন যে, ঐ সময় তিনি বাবাকে জাহাজের উপর দেখিতে পান। এ সমস্যার উত্তর এই যে বাবা সূক্ষ্ম দেহে জাহাজে উপস্থিত হইয়াছিলেন।"

অতুল বিহারী গুপ্ত মহাশয় যোগিরাজের যে যোগৈশ্বর্য্যের বিবরণ দিয়াছেন, সাধারণ ব্যবহারিক নিয়মের ব্যতিক্রম হইলেও, এরূপ ঘটনা নিতান্তই বিরল নহে। একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে যোগিরাজকে ভক্তগণ দেখিতে পাইয়াছেন, ভক্তের বিপৎকালে আকুল প্রার্থনায় যোগিরাজ দর্শনগোচর হইয়া অভয় প্রদান করিয়াছেন, এরূপ অনেক ঘটনার কথা শোনা গিয়াছে। তাঁহার দৈহিক তিরোধানের পরেও

কয়েকজন আকুল কৃপাপ্রার্থীর নিকট আত্মপ্রকট করিয়া তিনি দীক্ষামন্ত্র প্রদান করিয়াছেন এবং তাহাদের প্রাণে শান্তি দিয়াছেন। এমন ব্যাপার তাঁহার তিরোধানের এত দীর্ঘকাল পরেও সংঘটিত হইতেছে। ভক্তানুকম্পা ও দীনবাৎসল্য বশতঃ সাধারণের অলক্ষিতে তাঁহার অনেক যোগবিভূতি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এসব বিভূতিকে তিনি কখনো উচ্চস্থান দেন নাই। তাঁহার দৃষ্টিতে এসব যোগবিভূতি সাধারণ বিদ্যার মধ্যেই পরিগণিত ছিল। তিনি এসব বিভূতি অতিক্রম করিয়া অনেক ঊর্দ্ধে সমাসীন ছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত প্রকার ব্যাপার সমূহের বৈশিষ্ট্য কোনরূপ বিভূতির পরিচয়ে নয়; এই সব ব্যাপারের ভিতর দিয়া প্রেমময় যোগিরাজের সুগভীর হৃদয় প্রস্রবণ হইতে যে প্রেমের ধারা নিঃসৃত হইয়া অনুগৃহীত ব্যক্তিদের প্রাণমন অমৃতে প্লাবিত করিয়া দিত, তাহাতেই ইহাদের বিশিস্টতা। যিনি গুণাতীত পুরুষ, যিনি নিত্যনিরন্তর ব্রহ্মভাবে ভাবিত ও ব্রহ্মানন্দ রসপানে বিভোর, সংসার যাঁহার নিকটে স্বপ্নবৎ মিথ্যা, নিজের দেহেন্দ্রিয় সম্বন্ধেও যিনি সম্পূর্ণ উদাসীন, নিজের সম্পর্কে যাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় কেহ নাই, ইষ্ট বা অনিষ্ট কিছু নাই, যিনি ব্যবহার ক্ষেত্রে জনকোলাহলের মধ্যে অবস্থান করিবার সময়ও সর্ব্বদা অন্তর্দৃষ্টিপরায়ণ, মৌনবান্‌, হর্ষবিষাদরহিত ও স্থিরাসনে আসীন হইয়া আপনাতে আপনি বিরাজিত থাকিতেন, সেই লোকোত্তর মহাপুরুষেরও যে আমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ

স্নেহ ও বাৎসল্য আছে, তিনি যে মুহূর্তের জন্যও আমাদের সম্বন্ধে চিন্তা করেন, আমাদের কল্যাণের নিমিত্ত ও সুখসুবিধা বিধানের নিমিত্ত তিনি যে বিন্দুমাত্রও চেষ্টা করেন, তিনি যে আমাদিগকে আপনার জন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ও আমাদের প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহার ব্রহ্মরসরসিত অমৃতময় হৃদয়ে যে আমাদের জন্যও একটু স্থান আছে, তিনি সকল প্রয়োজনের ঊর্দ্ধে থাকিয়াও আমাদের প্রয়োজন সাধনের জন্য যে এত নিম্নে অবতরণ করেন, উহার পরিচয় প্রাপ্ত হইলে, তাঁহার বাহ্যিক সামান্য ব্যবহারের মধ্যেও ইহার নিদর্শন প্রাপ্ত হইলে, আমাদের হৃদয়ও কি আশায়, আনন্দে ও পবিত্রতায় সিক্ত হয় না, আমাদের শুষ্ক হৃদয়ও কি প্রেমের মহিমা কতকটা উপলব্ধি করিয়া সরস হয় না, আমাদের চিত্তও কি তাঁর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তাঁর ভাবে ভাবিত হইতে ও তাঁর আদর্শানুযায়ী জীবন গঠন করিতে কতক পরিমাণে উৎসাহিত হয় না? অতল সমুদ্রের তলদেশ হইতে উঠিয়া আসিয়া যে বুদ্বুদটী জলরাশির উপরে ভাসিতে থাকে, তার সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিলেই, সে যে অগভীর ডোবার জলের বুদ্বুদ হইতে কত পৃথক, তাহা সহজেই প্রতীয়মান হয়। সে নিজ আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও অতলতলের বার্ত্তা বহন করিয়া আনে, স্মৃতিকে, চিন্তাকে ও অনুভূতিকে অতলতলে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায় এবং অপার জলধির সঙ্গে আমাদের একটী নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া দেয়। মায়াতীত ব্রহ্মভাব-ভাবিত নির্ব্বিকার মহা-

পুরুষের স্নেহ ও বাৎসল্য তাঁহার ব্রহ্মাভিন্ন হৃদয় হইতে নিঃসৃত হইয়া আসিয়া আমাদিগকে সেই নিষ্কল নিষ্ক্রিয় শান্ত শিব অদ্বৈত পরম পুরুষের স্নেহ ও বাৎসল্যের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়, সেই সর্ব্বাতীত সর্ব্বময় বিশ্বগুরু ভগবানের অতল ও অপার প্রাণের সহিত আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণের যোগ সংস্থাপন করিয়া দেয়। তাঁহার অহেতুকী ভালবাসা আপন প্রভাবে আমাদের বহুধাবিভক্ত ভালবাসাকে স্বকীয় রজস্তমোবি-মুক্ত জ্ঞানময় ও প্রেমময় হৃদয়ের দিকে আকর্ষণ করিয়া এককেন্দ্রীভূত ও যোগযুক্ত করে, এবং আমাদের চিত্তকে তন্ময় করিয়া ব্রহ্মভাবে ভাবিত করে।

যোগিরাজ গম্ভীরনাথের বাৎসল্য ও প্রেমের নিদর্শন স্বরূপ এক জাতীয় কয়েকটী সামান্য সামান্য ব্যাপার উল্লেখ করা হইল; তদ্ব্যতীত অন্য এক জাতীয় বহু ঘটনার বিবরণ তাঁহার বহু শিষ্য ও ভক্তের নিকট হইতে গোপনে অবগত হওয়া গিয়াছে। সে জাতীয় ঘটনা তাঁহারা বাবাজীর দেহে অবস্থান কালেই যে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহা নয়, তাঁহার তিরোধানের পর এখনও বিভিন্ন শিষ্য ও ভক্ত বিভিন্ন ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এখনও সেই প্রকার ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া ও তাহার ভিতরে তাঁহার বাৎসল্য ও করুণার নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহারা নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করিতেছেন যে, গুরুদেব লৌকিক ভাবে স্থূলদেহ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যান নাই, পরন্তু তিনি অলক্ষিত

ভাবে তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে বিপজ্জাল হইতে রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদের অন্তরে শুভবুদ্ধির প্রেরণা দিয়া তাঁহাদিগকে পরম কল্যাণের পথে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। শিষ্যবৃন্দের হৃদয়ের দুর্ব্বলতা ও বিশ্বাসের শিথিলতা দূর করিয়া দিয়া তাঁহাদের প্রাণে উৎসাহ তেজ আস্তিক্য ও প্রেম বর্দ্ধিত করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি মাঝে মাঝে অলৌকিক ভাবে তাঁহাদের নিকট আত্মপ্রকাশ করেন, এবং আপনার করুণা ও প্রেমের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন।

এই সব ঘটনার সত্যতায় সন্দেহ করিলে ঐ সকল বিশুদ্ধ স্বভাব সত্যপরায়ণ শিষ্য ও ভক্তদের প্রতি নিতান্ত অবিচাম করা হইবে। তাঁহাদের সত্যনিষ্ঠায় সন্দেহ করা হইবে। মহাপুরুষগণ যে অলক্ষ্য ভাবে থাকিয়া জীবের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন, ইহা শাস্ত্র সম্মত, এবং বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ ইহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়া থাকেন। যাঁহারা কোন সিদ্ধ মহাপুরুষকে গুরুরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই অনুভব করিয়াছেন ও করিতেছেন যে, গুরু তাঁহাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করেন, তাঁহাদের মঙ্গল বিধান করেন ও তাঁহাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করেন। এ বিষয়ে যুক্তিবিরোধীও কিছুই নাই। সুতরাং এ সকল ঘটনা অপ্রাকৃত বলিয়াই ইহাদের যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

কিন্তু তথাপি সে সব ঘটনার বিশেষ উল্লেখ এ গ্রন্থে সমীচীন

বিবেচিত হয় না, যেহেতু সে সব ব্যাপার তাঁহার লৌকিক ও ব্যবহারিক জীবনের অঙ্গীভূত নয়। যিনি অপ্রাকৃত ভাবে নিত্য প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও ধর্ম্মনিষ্ঠ সদ্‌গুণবিশিষ্ট প্রাকৃত ব্যক্তির ন্যায়ই লৌকিক জীবনে যোগৈশ্বর্য্যের কোন পরিচয় প্রদান করেন নাই, যিনি জীবপ্রেমে পরিপূর্ণ হইলেও প্রকাশ্য ভাবে কোনরূপ অলৌকিক শক্তি বিকাশ করিয়া জীবের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করেন নাই, সেই মহাপুরুষের জীবন ধারার আলোচনার মধ্যে ঐ সব গুপ্ত ঘটনার প্রকাশ্য আলোচনা না করাই সঙ্গত ও তাঁহার উপদেশানুযায়ী বোধ হয়। বিশেষতঃ ঐ সকল ঘটনা সর্ব্বসাধারণের জন্য নয়, বিশেষ অধিকার সম্পন্ন ভক্তদের জন্যই উহা অভিপ্রেত। ঐ সকল ঘটনাকে সাধকদের আধ্যাত্মিক জীবনের বিশেষ উপলব্ধি বলিয়া গ্রহণ করাই সমীচীন।

প্রপন্ন শিষ্যের আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে গুরু যে ভাবে আত্মপ্রকাশ করেন, গুরু শিষ্যের পরস্পরের মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে যে প্রকার গুহ্য ভাবের আদান প্রদান হয়, তাহা সজাতীয়, সমভাবসম্পন্ন, অন্তরঙ্গ ধর্ম্মবন্ধু ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট প্রকাশযোগ্য নহে। কোন ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি যখন স্বকীয় সুপ্ত আধ্যাত্মিক শক্তি উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষ মহাপুরুষ-প্রদর্শিত সাধন পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হইবার উদ্দেশ্যে, কোন মহাপুরুষের শরণাপন্ন হন, এবং সেই মহাপুরুষ যখন দীক্ষা প্রদান দ্বারা স্বীয় আধ্যাত্মিক শক্তি সেই ধর্ম্মার্থীর প্রাণে সংক্রামিত করিয়া ও

তাঁহাকে মানব জীবনের চরম কল্যাণের পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক পরিচালিত করিবার ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন, তখন হইতে সেই শিষ্যের নিকট উক্ত মহাপুরুষ অন্যান্য মহাপুরুষদিগের ন্যায় কেবলমাত্র একজন মহাপুরুষ অথবা ধর্ম্মোপদেষ্টা বা লোকশিক্ষক নহেন, এবং সেই মহাপুরুষের নিকটও উক্ত শরণাগত শিষ্য অন্যান্য ধর্ম্মলিপ্সু উপদেশ-প্রার্থীদের মধ্যে একজন নহেন। এই দীক্ষা ব্যাপারের ভিতর দিয়া গুরু ও শিষ্যের মধ্যে যে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা কোনরূপ বাহিরের সম্পর্ক নয়, এবং জগতে ব্যক্তিগত ভাবে কোন দুইজন ব্যক্তির মধ্যে যত প্রকার সম্পর্ক স্থাপিত হইতে পারে, তন্মধ্যে কোনটির সহিতই এই গুরু-শিষ্য সম্বন্ধের তুলনা হইতে পারে না। এই সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে ভিতরের সম্পর্ক। শিষ্য নিজের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে স্বকীয় হৃদয়ে গুরুর শক্তির বিশেষ বিশেষ বিকাশ ও গুরুর বিশেষ বিশেষ লীলা অনুভব করিতে থাকেন; গুরুও অন্তর্য্যামিরূপে আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক শিষ্যের ধীশক্তিকে কল্যাণের পথে প্রবর্ত্তিত করিতে করিতে নব নব রূপে ও নব নব ভাবে শিষ্যের সহিত লীলা করিয়া থাকেন। শিষ্যের চিত্ত ও হৃদয় গুরুর বিশেষ লীলাক্ষেত্র, এবং এখানেই প্রেমপ্রধান মহাপুরুষের প্রেমময় স্বভাবের অসাধারণ প্রকাশ। শিষ্যের নিকটে গুরু করুণাময় মোক্ষদাতা ভগবান্ হইতে অভিন্ন—তাঁহার স্থূলদেহে প্রকটিত মূর্ত্তি।

এই জাতীয় লীলা মহাপুরুষের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্য ব্যতীত অপর কেহ সম্যক্‌রূপে ধারণা করিতে সমর্থ হয় না। সদ্‌গুরুর-শিষ্যদের মধ্যেও একে অপরের অসাধারণ অভিজ্ঞতা অনেক সময় বুঝিতে পারে না। একই মহাপুরুষ অনেক সময় বিভিন্ন স্বভাব বিশিষ্ট শিষ্যদের নিকটে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গুরুশক্তির প্রকাশ করেন। সুতরাং এই সকল বিশেষ বিশেষ ভাবের খেলা, গুরু শক্তির বিচিত্র লীলা—মহাপুরুষের সাধারণ জীবন-ধারার অঙ্গীভূত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। মহাপুরুষের সাধারণ জীবন এক জিনিষ, তাঁহার বিশেষ গুরুভাবময় জীবন সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষ। গুরুর বিশেষ জীবন একমাত্র অধিকারী শিষ্যেরই আলোচ্য, বিচার্য্য ও অনুসরণীয়। সেইহেতু শ্রীশ্রীযোগিরাজ গম্ভীবনাথ প্রসঙ্গ সদ্‌গুরু-গম্ভীরনাথের বিশেষ গুরুভাবের লীলা যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়া সাধারণ ধর্ম্মার্থী ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু লোক সমাজে একটি পরিপূর্ণ মানবের অস্পষ্ট আলেখ্য উপস্থিত করিবার জন্য আত্মপ্রকাশ করিল। প্রার্থনা করি, সদ্‌গুরু প্রপন্ন ভক্তদের হৃদয়ের মালিন্য বিধৌত করিয়া মহাপুরুষ জীবনের জীবন্ত আদর্শ তাঁহাদের নিকট প্রকটিত করুন।

॥ 'হরিঃ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ ॥

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ
সর্ব্বাত্মনা তে চরণাশ্রিতেন।
লব্ধঃ প্রসঙ্গো ভবতঃ প্রসাদাৎ
ত্বৎপাদপদ্মে হি সমর্প্যতেঽয়ম্‌॥

ওঁ স্বস্ত্যস্তু বিশ্বস্য খলঃ প্রসীদতাং
ধ্যায়ন্তু ভূতানি শিবং মিথো ধিয়া।
মনশ্চ ভদ্রং ভজতাদধোক্ষজে
আবেশ্যতাং নো মতিরপ্যহৈতুকী ॥